সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ জিজ্ঞাসার মুখপত্র

চেতনা

২০-শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৯৬

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব ॥ গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ এমনি করেই ॥ পান্নালাল দাশগুপ্ত
॥ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বরূপ ॥ ডরোথি এল. সেয়ার্স
॥ শিশুশিক্ষা অথবা শিশুমেধ ? ॥ প্রবাহন সমাদ্দার
॥ ভিখিরি (রম্য রচনা) ॥ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত
॥ পশ্চাতের কোলাহল হতে (স্মৃতিচারণ) ॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য
॥ অহিংস বিপ্লবের পথে পোল্যাণ্ড ? ॥ শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়
॥ জঁা রাসিন ॥ তীর্থরেণু দাস
॥ ভাষাবিদ ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ আমাদের কথা ॥
॥ এছাড়া গল্প, কবিতা, সমাজচিন্তা ইত্যাদি

সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল

With the Best Compliments of :

M/s. CHHOTARIA UDYOG NIGAM

36, STRAND ROAD
CALCUTTA-1

With Best Compliments of :

M/s. G. N. R. MILL STORES CO.

40D, STRAND ROAD
CALCUTTA-700001

With Best Compliments from :

M/s. JAIN MARBLE UDYOG

8/2 B. B. D. BAG (East)

CALCUTTA-700 001

Dealers of :

All Kinds of Marble Slabs, Tiles, Granite, Sand Stone, Kota & Ceramic Tiles, etc.

With Compliments of :

M/s. Florence Distributors (Pharmaceuticals)

1/1 A VANSITTART ROW

(1st Floor Room No. 2)

CALCUTTA-1

DISTRIBUTORS FOR :

- **Intarmed (Bombay)**
- **Inga Laboratories Pvt. Ltd. (Secunderabad)**
- **The Arvind Mills Ltd. (Indan) (Bombay)**
- **DOPSON Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Bombay)**

STOCKISTS FOR :

- **Nicholas Laboratories India Ltd. (Bombay)**
- **Strassenburg Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Calcutta)**
- **NOEL CHEMICALS (Bombay)**
- **P. C. I. (Bombay)**

Greetings From a Wellwisher of ALEKHYA

With Best Compliments of :

EMC STEELAL

(A Unit of Electrical Mfg. Company Ltd.)

51, Canal East Road

Calcutta-700085

Leaders in Hightension Transmission Line Engineering

With Compliments from :

Century Laminating Co. Ltd.

Head Office : **5, Alexandra Court**

60/1, Chowringhee Road

Calcutta-700 020

Phone : 44-0976 / 44-9291 / 43-1103 / 43-5314

২০শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

আলেখ্য

শ্রাবণ-আশ্বিন
১৩৯৬

॥ সূচীপত্র ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব ॥ গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১
কবিতাগুচ্ছ :
আবার হরিদ্বারে ॥ হরপ্রসাদ মিত্র ॥ ১৪
বাসন্তী পঞ্চমী ॥ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ॥ ১৫
সাজন্ত ॥ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ॥ ১৬
পুতুল খেলা ॥ বিজয়কুমার দত্ত ॥ ১৭
নীলকণ্ঠ এসো ॥ বাজীরাও সেন ॥ ১৮
পর্যটন ॥ সন্তোষকুমার মাজী ॥ ১৯
এমনি করেই ॥ পান্নালাল দাশগুপ্ত ॥ ২০
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বরূপ ॥ ডরোথি এল. সেয়ার্স ॥ ২৮
বিস্ফোরণ (গল্প) ॥ এ. মায়াফ ॥ ৩৮
শিশুশিক্ষা অথবা শিশুমেধ ? ॥ প্রবাহন সমাদ্দার ॥ ৪৪
ভিখিরি (রম্যরচনা) ॥ প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত ॥ ৫১
পশ্চাতের কোলাহল হতে (আত্মস্মৃতি ॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ॥ ৫৮
অহিংস বিপ্লবের পথে গোল্যাণ্ড ॥ শীতাংশু চট্টোপাধ্যায় ॥ ৭২
জঁা রাসিন ॥ তীর্থরেণু দাস ॥ ৮২
ভাষাবিদ্ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৯৩
আমাদের কথা ॥ ৯৭
সমাজচিন্তা ॥ ১১৪

সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল
দপ্তর : ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০৭৫
ফোন : ৭২-১৫৬২

বার্ষিক চাঁদা : ১৫·০০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা—১০০·০০টাকা
বিদেশে বার্ষিক চাঁদা—৫ ডলার

আ লে খ্য
২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯৬

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

১। জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যাসম্পর্কিত মতাবলী

বঙ্কিমের মতে বিশ্বের পরম সত্তা হল ঈশ্বর। তিনিই বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি সর্বভূতে রয়েছেন। সর্বভূতও তাঁর মধ্যে রয়েছে। তিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন। গুনগুলিও প্রত্যেকে অনন্ত। ঈশ্বরের স্বরূপ 'সচ্চিদানন্দ' কথাটিতে বিধৃত। তিনি সৎ, অর্থাৎ সর্বব্যাপী সত্তা। তিনি চিৎরূপে, সতের মধ্যে অধিষ্ঠিত। তার প্রকাশ তাঁর সৃষ্ট বিশ্বের শৃঙ্খলায়। তিনি আনন্দস্বরূপ (উপনিষদের 'রসো বৈ সঃ')। বিশ্বের শৃঙ্খলাধৃত এই হল ঈশ্বরের আনন্দময় রূপ। এগুলিই হল বঙ্কিমের অধিবিদ্যাগত মূল ধারণাগুলি।

ঈশ্বরকে সৎ রূপ জানা যায় প্রত্যক্ষ ও 'জ্ঞাপিকা শক্তির' প্রয়োগের মাধ্যমে। ঈশ্বরের চিৎরূপকে জানা যায় বুদ্ধিবৃত্তির (বিচারিকা বৃত্তির) মাধ্যমে। আর ঈশ্বরের আনন্দস্বরূপকে জানা যায় অনুভূতির মাধ্যমে। কেননা, আনন্দ অনুমানের বিষয় নয়, অনুভবের বিষয়। এর জন্ত প্রয়োজন চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির যোগ্য অনুশীলন। এখন সৎ যে আছে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা তা সত্যই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু চিতের অস্তিত্ব শুধু বিশ্বের শৃঙ্খলার ব্যাপারটি জানা বোঝার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় না। চিত্তের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে একটা বিশেষ রকমের শৃঙ্খলা (উদ্দেশ্য চালিত) প্রমাণিত হওয়া চাই। শুধু নিয়মের সর্বব্যাপী অস্তিত্বের দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। এ বিষয়ে হিউম (David Hume) সর্বজনস্বীকৃত শেষ কথা বলে গেছেন। তিনি ঈশ্বরের পক্ষে উপস্থাপিত 'পরিকল্পনা-নির্ভর যুক্তিকে'

(Argument from Design) ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কোন যুক্তিনির্ভর আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যে যায় না, এ কথা বহুপূর্বেই এদেশে নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ঘোষিত হয়েছে। এই দর্শন পরিষ্কার ভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, ঈশ্বর প্রমাণাভাবে 'অসিদ্ধ'। হিউম এবং আধুনিক নানা দলের যুক্তি-নির্ভর ও অভিজ্ঞতানির্ভর দার্শনিকেরা ঐ একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আর অনুভূতির কথা আলাদা। অনুভূতির দ্বারা কোন কিছুই প্রমাণিত হয় না। অনুভূতি মানুষের অন্তরের অবস্থারই প্রধানতঃ আভাস দেয়। তাই অনুভূতির দুটি রায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে তার সমাধান হয় না। যুক্তির ভাষা ও ভিত্তি সর্বব্যাপী সর্বমন নির্ভর, কিন্তু অনুভূতির ভাষা ও ভিত্তি ব্যক্তিমননির্ভর। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করা যায় না। তাই, বঙ্কিমের ঈশ্বরনির্ভর অনুশীলনতত্ত্ব তার মূলস্তম্ভ হারাল। তবে ঈশ্বরবিহীন সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনতত্ত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত।

আরও একটি কথা। বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটির প্রয়োজন মানব জীবনে আছে যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা গেলেও, সমস্ত বিশ্বই এই বৃত্তিগুলির বিকাশের অনুকূল এবং বিশ্বের সব কিছুই মঙ্গলময় এর সপক্ষেও কোন যুক্তি নেই। মানুষের বাসযোগ্য ও জীবনোপযোগী করবার জন্য এই বিশ্বের অনেক পরিবর্তন দরকার। ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন প্রধানতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধিতও হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বও যেমন, বিশ্বের সর্বব্যাপী মঙ্গলময়তা তেমনই বিশ্বাসনির্ভর, যুক্তিনির্ভর নয়। বিশ্বাস অনুভূতিনির্ভর, তাই তা কোন প্রমাণ নয়।

২। নীতিশাস্ত্রগত তত্ত্বাবলী

বঙ্কিমের নীতিশাস্ত্র ঈশ্বরনির্ভর, তাই দুর্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। সুতরাং সর্বভূতে প্রীতি ও তাদের হিতসাধন ধর্ম। এই হল মূল কথা বঙ্কিমের নীতিশাস্ত্রের। কিন্তু আমরা এই মাত্র দেখলাম যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। তাহলে বিশ্বপ্রীতির উদ্ভব হবে কি করে? আর প্রীতির উদ্ভব না হলে, প্রীতি যখন সমাজের বন্ধন তখন সমাজের কি হবে? সমস্ত ঈশ্বরনির্ভর, নীতিশাস্ত্রের এই দুর্বলতা প্রকট হয়েছে এই যুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভর যুগে। তারপর, যদি স্বাভাবিক প্রীতি বৃত্তির উপর নির্ভর করা হয়, তাহলেও শুধু প্রীতির পথে সিদ্ধি নেই। স্বাভাবিক প্রীতি অন্ধ। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও তজ্জাত জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে

প্রীতি বিশেষ কোন সার্থকতা লাভ করতে পারে না। প্রীতির স্বরূপ, তার সীমা, তার সিদ্ধির উপায় কি, না জানলে শুধু প্রীতির পথে কোন বড় সার্থকতা লাভ করা যাবে না।

৩। সমাজদর্শন সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবলী

নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। নীতিশাস্ত্র ব্যক্তির বিকাশ চায় মুখ্যতঃ, সমাজদর্শন চায় সমাজের বিকাশ। কিন্তু ব্যক্তির বিকাশ সমাজের বিকাশ না হলে হবে না। সমাজেরও বিকাশ ব্যক্তির বিকাশ না হলে হবে না। তাই একের আলোচনায় আরেকটি এসেই যায়। আমাদের উপরের আলোচনাতেও তাই হয়েছে, সমাজদর্শনের কথা আপনিই এসে গেছে। বঙ্কিমের সমাজদর্শনের মূল কথাগুলি হল এই: সমাজের বাইরে সভ্যজীবন সম্ভব নয়। সমাজ তাই পূজ্য, তার রক্ষা পরম ধর্ম। প্রীতিই সমাজের বন্ধন। এই প্রীতি আবার ঈশ্বর-ভক্তিনির্ভর। সমাজের উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনের পূর্ণ বিকাশসাধনের ব্যবস্থা করা। যেখানে সে ব্যবস্থা নেই সে সমাজে স্বাধীনতা নেই। এখন ব্যক্তির বাইরে সমাজের পৃথক কোন সত্তা নেই। ব্যক্তিসকলের সমষ্টি জীবনেরই প্রকাশ সমাজের মধ্যে। ঈশ্বর যখন যুক্তিতে অসিদ্ধ, প্রীতি যখন একা নির্ভরযোগ্য নয়, তখন সমাজকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে ব্যক্তিজীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য সকলের সমস্ত মূলবৃত্তিগুলির যোগ্য সুসমঞ্জস বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের সামনে এই সুমহান্ কর্তব্য রয়েছে।

৪। নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মূল ধারণাবলী

বঙ্কিমের মতে, নন্দনতত্ত্বের মূল কথা হল এইগুলি: মানুষের কতক গুলি বৃত্তি আছে, যেগুলির কাজ হল শুধু আনন্দ উপভোগ করা। শুধু আনন্দের জন্য আনন্দ উপভোগই এই বৃত্তিগুলির কাজ। এই বৃত্তির যোগ্য বিকাশ হলে মানুষ বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য দুই-ই অনুভব করে এবং ঈশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস পায়। ঈশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্যের ধ্যানে যদি তার পরে সে মগ্ন হতে পারে, তাহলে ব্রজবালাদের মত ঈশ্বরে তন্ময়তা লাভ করে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে ভাবতে পারে। শেষে অভেদজ্ঞান দৃঢ় হলে ঈশ্বরে লীন হয়। অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যজ্ঞান সহজেই লাভ করা যায়। কেননা, এই সৌন্দর্য মানুষকে সহজেই আকর্ষণ

করে। এই আকর্ষণের মাধ্যমে বৃত্তিগুলি স্ফূরিত হতে থাকলে ক্রমে অন্তঃ-প্রকৃতির জ্ঞানলাভও সম্ভব হয় এবং ঈশ্বরের সমস্ত সৌন্দর্যের জ্ঞানের আভাসও লাভ করা যায়। মানুষসৃষ্ট চারুশিল্পগুলিও এই বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যানুভবে খুবই সহায়ক। কাব্য আবার চিত্তকে শুদ্ধ ও অন্তঃপ্রকৃতির প্রেমে আসক্ত করার কাজে বিশেষ সাহায্য করে। সেই জন্য কাব্যচর্চা ধর্মানুশীলনে বিশেষ সাহায্যকারী।

এই সৌন্দর্যতত্ত্বের ত্রুটি হল এই যে, এ মতে শুধু সৌন্দর্যানুভূতির উদ্রেক করাই শিল্পসাহিত্যের কাজ। কিন্তু শিল্পসাহিত্য শুধু যে সৌন্দর্য বোধেরই করে তা নয়। উদ্রেক সৌন্দর্যানুভূতির উদ্রেক শিল্প ও সাহিত্য অনেকক্ষেত্রে করলেও তারা বীভৎস, কুৎসিত, অমঙ্গল, ভীতি ইত্যাদি অনুভূতিরও উদ্রেক করে। যেমন, ট্র্যাজেডি উদ্রিক্ত অনুভূতি শুধু সৌন্দর্যের নয়। আরও একটা কথা। অন্তঃসৌন্দর্যের অনুভূতির অর্থ মঙ্গল, পবিত্রতা, শুদ্ধ শক্তি ইত্যাদির অনুভূতি। সুতরাং এখানে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি প্রীতিবৃত্তির সঙ্গে একসঙ্গে মূলতঃ কাজ করে। এই দুই বৃত্তির মিলিত কাজকে এখানে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মঙ্গলের সৌন্দর্যও শিল্প সাহিত্য প্রদর্শন করে। সেইজন্য শিল্পসাহিত্যের বিচারে নিছক সৌন্দর্যবোধ ও নীতিবোধ দুইই একসঙ্গে থাকা উচিত। বঙ্কিমও তাই 'কুকাব্যের' কথা বলেছেন। অন্তঃসৌন্দর্যের অনুভূতি যে মুখ্যতঃ মঙ্গলেরই সৌন্দর্যবোধ, এটা স্পষ্ট করে বলা, মনে হয়, বঙ্কিমের উচিত ছিল।

৫। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক মূল ধারণাগুলি

উপরের সব আলোচনাই বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্গত। তবুও স্পষ্টতার জন্য তাদের পৃথক স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এখন ধর্মতত্ত্বের সংহত রূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব সমস্ত মানুষের ধর্মতত্ত্ব, কোন বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর নয়। সমস্ত প্রচলিত ধর্মের মূলে যা আছে তাকে নিয়েই এই আলোচনা। সমস্ত ধর্মের মূলে আছে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা। সুতরাং বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভেরই আলোচনা। এই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য প্রয়োজন মানুষের প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলির সুসমঞ্জস বিকাশ। এই বৃত্তিগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: শারীরিকী বৃত্তিসমূহ, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসমূহ, কার্যকারিণী বৃত্তিসমূহ (ভক্তি, প্রীতি, দয়া ইত্যাদি) ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসমূহ। সমস্ত

বৃত্তিকেই ঈশ্বর-ভক্তির দ্বারা চালিত করলেই তবেই পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভ সহজে ও সার্থকভাবে সম্ভব। সমস্ত বৃত্তির অনুশীলন ঈশ্বরকে লক্ষ্য রেখেই করতে হবে, কেননা ঈশ্বর প্রাপ্তিই মনুষ্যত্বের চরম সার্থক পরিণতি। আর এই অনুশীলন সর্বদাই নিষ্কামভাবে করতে হবে। সাধারণ কামনাজাত সুখ-দুঃখবোধের উর্ধ্বে উঠতে হবে। তাহলে মানুষ সাধারণ অর্থে সুখ-দুঃখবোধের অতীত হয়ে (পরমশান্তিরূপ) পরমানন্দ লাভ করবে।

এই ধর্মতত্ত্বের লক্ষ্য, পূর্ণ মনুষ্যত্বঅর্জন যা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ ও গ্রহণীয়। প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলির সুসমঞ্জস বিকাশের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের ধারণাও যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়, সেইহেতু সমস্ত বৃত্তির ঈশ্বর ভক্তির দ্বারা চালিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। মনুষ্যে ভক্তি অবশ্য যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণীয়। কিন্তু বৃত্তিগুলির নিষ্কাম অনুশীলন গ্রহণীয় নয়,—যুক্তি-গ্রাহ্য নয় বলে'। কামনার উর্ধ্বে যাওয়ার ধারণাটি গ্রহণীয় নয় বলে তাই। কামনাজাত সুখ-দুঃখের টানা পোড়েনেই এই পার্থিব জীবন বোনা। এই কামনাজাত সুখ-দুঃখই জীবসকল উপভোগ করে। কামনাজাত দুঃখবোধ এড়ান যায় না বলে ও ভাল লাগেনা বলে' কামনাজাত সুখকেও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আর ঐ দুঃখবোধ আছে বলেই সুখবোধের অস্তিত্ব আছে। কামনার উর্ধ্বে জাত যে সুখ তা নিরবচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু তা সাধারণ সুখ মানুষের কাছে খুবই পাতলা ও জলীয় মনে হবে। জীবনের উষ্ণতা তাতে থাকবে না। কামনার জগতের দুঃখকে নিশ্চয়ই কমাতে হবে। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ এড়ান সম্ভব নয় এবং ভালও নয়। তাকে সম্পূর্ণ এড়াতে গেলে সুখ বোধও লুপ্ত হবে। অর্থাৎ স্নানের জলের সঙ্গে শিশুকে ফেলে দিলে চলবে না। আর একটা কথা। কামনার জগতে যদি থাকাই সিদ্ধান্ত হয় (যা আমার মনোমত), তাহলে কামনাজাত সুখ-দুঃখে খুব বেশী বিচলিত হওয়া অবশ্যই উচিত নয়। সুখে আত্মহারা হলে চলবে না, অপরিহার্য দুঃখেও নয়। পরিহার্য দুঃখকে অবশ্য দূর করতে হবে। আর বিজ্ঞানের অবিরাম অগ্রগতির ফলে দুঃখ-জয়ের শক্তিও মানুষের অবিরত বাড়তে থাকবে। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। আরও একটি কথা। কামনার জগতের সুখ যে সবই একভাবে গ্রহণীয় নয়, তাও মনে রাখতে হবে। বৃত্তিগুলির সুসমঞ্জস বিকাশের কথা মনে রাখলেই এ সত্য বোঝা যাবে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বিশ্লেষণ অনবদ্য, যুক্তির গতি অরোধ্য, এবং সিদ্ধান্ত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য।

৬। বঙ্কিমের শিক্ষাতত্ত্ব

বঙ্কিমের শিক্ষাতত্ত্বকে যথাযথভাবেই তাঁর ধর্মতত্ত্বের অন্তর্গত করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থে ধর্মতত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রই হল শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষাতত্ত্ব তার লক্ষ্যকে দর্শন বা ধর্মতত্ত্ব থেকে গ্রহণ করে, কারণ জীবনের লক্ষ্যই শিক্ষার লক্ষ্য। বৃত্তিগুলির অনুশীলন পদ্ধতি এই লক্ষ্যের আলোকেই নির্ণীত হয়েছে। বঙ্কিমের শারীরিক বৃত্তি ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতির আলোচনা প্রায় সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন, অকাট্য যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন অপ্রমাণিত তখন ঈশ্বরভক্তির অনুশীলন স্বতঃই অপ্রয়োজনীয়। প্রীতির অনুশীলনও ঈশ্বর ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে করা উচিত। এবং বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রয়োগজাত জ্ঞানের আলোকেই এই অনুশীলন চলা উচিত। দয়া বৃত্তির অনুশীলনে দানের ভূমিকা ঠিকই নির্ধারিত হয়েছে। তবে ধর্মপুস্তকের নির্দেশ বলেই তা গ্রহণ করা উচিত হবে না। এবং দয়াকে ভগবৎভক্তির সঙ্গে যুক্ত করাও উচিত নয়। দয়া ও প্রীতির ব্যাপারে স্থানকাল-পাত্রের হিসেব নিশ্চয়ই করা উচিত। তবে প্রতিদানের হিসেব নিশ্চয়ই করা উচিত নয়। আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত। দানবিহীন ও ত্যাগবিহীন দয়া সত্যই মূল্যহীন। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি চর্চারও যে রূপরেখা বঙ্কিম দিয়েছেন তাও মুখ্যতঃ ঠিক। বহিঃসৌন্দর্যের উপভোগ থেকে অন্তঃ সৌন্দর্যের উপভোগের সঙ্গে মঙ্গলবোধকেও যুক্ত করা উচিত। বঙ্কিমের মনেও তাই ছিল বোঝা যায় 'কুকাব্য' কথাটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমের শিক্ষাতত্ত্বের কিছুটা আলোচনা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির আলোচনার সময়ে আগেই করেছি : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনাও করেছি। এখানেই শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা শেষ করছি :

॥ ১০ ॥

বঙ্কিমের "ধর্মতত্ত্বের" ভাষা।

বঙ্কিমের বিশ্লেষণ ক্ষমতাও যেমন অনন্যসাধারণ, সংশ্লেষণ ক্ষমতাও তেমনি। ফলে সর্বত্রই তাঁর বক্তব্য স্ফটিকস্বচ্ছ ও বুদ্ধির অসামান্য দ্যুতিতে উজ্জ্বল। চিন্তার মূল তত্ত্বগুলি এবং তার ছোট ছোট উপাদানও অতি সহজে বোধ্য। আর সমস্ত রচনাটির সমস্ত চিন্তা, যুক্তির শিকলে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। এ যেন কোন দক্ষ সৈন্যদলের সুবিন্যস্ত অগ্রগতি, চোখের সামনে ঘটছে। আর ভাষা যে আছে তা সবসময়ে মনেই থাকে না। ভাষার আবরণ কোন সময়ই

চিন্তার প্রকাশে কোনো বাধা হয়নি। মনে হয়, চিন্তাগুলোকেই সরাসরি দেখছি নড়তে, চড়তে, সাবিবদ্ধভাবে এগোতে। অসামান্য সাধনার এ ফল। এই ভাষা দেখে দুটি কথা মনে হয়। প্রথম, এ রকম ভাষায় কোন মৌলিক দর্শনের আলোচনা বাঙলা ভাষায় পূর্বে দেখিনি। অন্যের দর্শনের ব্যাখ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের অসামান্য কৃতিত্ব অবশ্য দেখেছি। ভাষার গাঢ়তা ও প্রকাশকগুণে বঙ্কিমের রচনা অনন্য। দ্বিতীয়, আজকের গদ্যলেখকরা কেন পরিচ্ছন্ন, ঋজু ও স্বচ্ছ ভাষায় লিখতে পারেন না? এই প্রশ্নটি মনে আসে। এর উত্তর খোঁজাও জরুরি। সন্ধানে যে কারণগুলো মনে এল তা এই :

(১) অমার্জিত অহংবোধ, যার প্রকাশ অনাবশ্যক কঠিন শব্দ ব্যবহারে এবং জটিল প্রকাশ ভঙ্গিতে।

(২) চিন্তাকার্যে যোগ্য নিষ্ঠার অভাব। যতটা অধ্যবসায়ের সঙ্গে চিন্তা করলে বক্তব্য বিষয় পূর্ণ আয়ত্তে আসে ও সরল হয়, ততটার অভাব।

(৩) পাঠকদের প্রতি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে অশ্রদ্ধা।

(৪) নির্বুদ্ধিতা—সরল প্রকাশে সম্মানহানিবোধ।

(৫) শিশুসুলভ চাপল্য ও বাইরের চাকচিক্যে আসক্তি

(৬) ভাল আদর্শের অভাব। শরৎচন্দ্রের পর এই অভাব খুবই প্রকট হয়েছে।

(৭) শক্তিশালী কু-আদর্শের প্রভাব।—দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই প্রভাব হল রবীন্দ্রনাথের গদ্যের। রবীন্দ্রপ্রতিভা মূলতঃ কাব্যিক, খুব উচ্চ-স্তরের হলেও সেই কাব্যিক প্রতিভার গদ্যে প্রকাশ ঘটলে গদ্যের বিপর্যয় ঘটা অবশ্যম্ভাবী। এবং তাঁর গদ্যে সেই বিপর্যয়ই ঘটেছে। তবে তা মোহময় কাব্যিক গুণে খানিকটা আচ্ছাদিত হয়েছে। কিন্তু পুরো নয়। এ যুগে তাঁর প্রভাব (নানা কারণে) প্রবলভাবে সঞ্চারিত হওয়ায় সাধারণ লেখকের গদ্যেরও বিপর্যয় ঘটেছে। অস্পষ্টতা, বাচনভঙ্গির আলুথালু ভাব, বাক্‌বাহুল্য প্রভৃতি কষ্টদায়কভাবে প্রকট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গের কাব্যিক গুণের আচ্ছাদন এখানে নেই বলে তা আরও বেশী প্রকট।

এ থেকে মুক্তির উপায়? শুদ্ধ চিন্তা এবং নিষ্ঠাবান সাহিত্যপ্রতিভার আবির্ভাব। সেই আশায় পূর্ব দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকা।

লেখা শেষ করার আগে আরও একটি কথা বলি। কথাটি বলা একান্ত কর্তব্য। কোন কিছু সৃষ্টি করা কঠিন। বড় কিছু সৃষ্টি করা আরও

কঠিন। আর সুমহান কিছু সৃষ্টি করা স্বভাবতঃই অত্যন্ত বেশী কঠিন। বঙ্কিম সেই কঠিন কর্ম করেছেন। সুতরাং তিনি সহস্রবার প্রণম্য। পক্ষান্তরে, সৃষ্টির সমালোচনা করা তুলনায় অনেক সহজ। এই সমালোচনা করার সময়ে আমি প্রতি পদেই খুব কুণ্ঠিত বোধ করেছি। কিন্তু শুদ্ধচিত্তে সমালোচনা করার দায়িত্ব রয়েছে পরবর্তীদের। তাই সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। অপেক্ষা করে রইলাম যোগ্যতর সমালোচকের আবির্ভাবের পথ চেয়ে।

শেষ কথা বলার পরেও আর একটা, আরও শেষ কথা, মনে হওয়ায় আবার কলম ধরলাম। নিছক যুক্তিবাদের দৃষ্টি নিয়ে আমরা বঙ্কিমের নেতিবাচক সমালোচনাগুলো করেছি। কিন্তু জগতের বেশীর ভাগ লোকই ভগবানে বিশ্বাসী। তাদের দিক থেকে দেখলে এই নিষ্কাম কার্যের ব্যাপারে সকলে একমত না হতেও পারেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ভগবৎ ভক্ত লোকের প্রাণখোলা ধন্যবাদ বঙ্কিম তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব-সৃষ্টির জন্য পাবেন। আমার জানা নেই, আর কোন্ দেশে ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে', আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গীকে ও বিজ্ঞানকে স্বীকার করে', এরকম কোন গুরুত্বপূর্ণ বই লেখা হয়েছে। এই বলেই শেষ করলাম।

পরিশিষ্ট (ক)—

ভক্তির সাধন

ভক্তি মুক্তিপ্রদা তাই সাধন। আবার ভক্তি মুক্তিপ্রদা হলেও মুক্তি বা কোন-কিছুই কামনা করে না, এই কারণে, ভক্তিই সাধ্য।

ভক্তি দুই প্রকারের—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য ভক্তির অনেক বাধা আছে, তাই মুখ্যভক্তির জন্য নির্দিষ্ট চতুর্বিধ সাধনায় যারা অক্ষম, যেমন, "অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক প্রভৃতি, তাদের জন্য গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য বলছেন, "যে যে-রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করি।" এবং "যে ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল জল দেয়, তাহা প্রযত্নাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।" কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান "ভক্তিজনকই" শুধু, এদের "ফলান্তর" নেই। এই-সব অনুষ্ঠান ভক্তির "নিকৃষ্ট সাধন"। স্তুতি বন্দনা প্রভৃতির যদি ঈশ্বর চিন্তাই উদ্দেশ্য হয়, তখন সেগুলি হয় মুখ্য ভক্তির লক্ষণ। কিন্তু ঐ সব অনুষ্ঠান অন্তরের সঙ্গেই

সবসময়ে করতে হবে। তা না হলে ভক্তির কোন প্রকারের অনুশীলনই হবে না।

ভক্তির প্রকৃত সাধন হল সর্বকর্ম ঈশ্বরে ন্যস্ত করে ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া, এবং অন্য ভজনারহিত হয়ে ঈশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা করা। অর্থাৎ ঈশ্বরে মনস্থির করা এবং ঈশ্বরে বুদ্ধি নিবিষ্ট করাই হল প্রকৃত (মুখ্য) ভক্তির সাধনা। কিন্তু এই সাধনা খুব কঠিন। তবে যারা প্রথমে এই সাধনায় অক্ষম, তারা পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে ঈশ্বরে চিত্ত স্থির করতে পারবে। এই অভ্যাসও অবশ্য কঠিন বস্তু। তাই যারা কর্মে সক্ষম, তারা ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম সর্বদা করলে মন ঈশ্বরে স্থির হবে। যারা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ও ঈশ্বরানুমোদিত কর্মেও অশক্ত, তারা যদি কর্মকর্তা হয়েও ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, তাহলে অন্য কামনার অভাবে ঈশ্বরই তাদের একমাত্র কাম্য বস্তু হয়ে দাঁড়াবেন। তখন আপনা থেকেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হবে। অর্থাৎ মুখ্য ভক্তির আবির্ভাব ঘটবে। এই "চতুর্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।"

বঙ্কিম-বর্ণিত ভক্তিতত্ত্বের আমরা মোটামুটি বিশদ আলোচনাই করেছি। তাই স্থানের কথা ভেবে ভক্তিসাধনের আলোচনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম যে, বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' মূলত ভক্তি-নির্ভর, তাই তার সম্পর্কিত কোন মৌল আলোচনাই বাদ দেওয়া উচিত নয়। এই চিন্তাই আমাকে, অতি সংক্ষেপে হলেও, ভক্তিসাধনের আলোচনায় এখানে প্রবৃত্ত করেছে।

আমি সারাংশ দেওয়ার সঙ্গে, 'ধর্মতত্ত্ব' পুস্তকটির আলোচনা, এই কারণেই করেছি যে, যাঁদের সময়ের অভাব, বা যাঁদের এ সব বিষয়ে পূর্বজ্ঞান বেশী নেই, তাঁদের এই অমূল্য পুস্তকটির মূল বক্তব্যগুলিকে জানার কোন অসুবিধে না হয়। কতকগুলি প্রশ্নেরও উদ্ভব পাঠকালে হতে পারে, যেগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। সুতরাং তাদের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন। সেই রকম কতকগুলি প্রশ্নের খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি, অবশ্য আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির শক্তি অনুযায়ী।

(১) **পুস্তকটি প্রধানতঃ কাদের জন্য লেখা?**—বঙ্কিম নিজেই পুস্তকটির ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, এটি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা জানা শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য লেখা। তবে যেটা বঙ্কিম আরও পরিষ্কার করে বলেন নি এবং তাঁর সময়ে বলার প্রয়োজনও ছিলনা সেটা হল এই যে, মুখ্যতঃ তাঁর সময়ে হিন্দু শিক্ষিত পুরুষদের জন্যই বইটি লেখা।

(২) **বঙ্কিম কি হিন্দুধর্মের অন্ধ ভক্ত ও স্তাবক ?**—বঙ্কিম পুনঃ পুনঃ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেও তিনি যুক্তি বিসর্জনও দেন নি এবং কুরুচির পরিচয় দেন নি। ধর্মের কোন শ্রেষ্ঠ লক্ষণের আলোচনার সময়ে হিন্দুধর্মে তা উত্তমভাবে দেখিয়েই তবে তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তিনি করেছেন। তিনি এবিষয়ে মোটেই কুরুচিরও পরিচয় দেননি। কারণ তখন হিন্দুধর্ম ছিল সর্বদিক থেকে একটি আক্রান্ত ধর্ম—বাইয়ের দিক থেকেও এবং ভেতরের দিক থেকেও। একদিকে ছিল খৃষ্টান মিশনারীদের চক্রান্তপূর্ণ বিরূপতা, আর অন্যদিকে ছিল ব্রাহ্মদের অত্যুৎসাহী ছিদ্রান্বেষিতা। সাধারণ হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই সাঁড়াশী আক্রমণে হয়ে পড়েছিল বিভ্রান্ত। অথচ তাদের উপরই প্রধানতঃ দেশের অদূর ভবিষ্যৎ ছিল নির্ভরশীল এবং তারা বিভ্রান্ত থাকলে ঐ ভবিষ্যৎ হোত ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এই সুস্পষ্ট ও অতি যুক্তিযুক্ত কারণেই দেশপ্রেমিক প্রাজ্ঞ বঙ্কিম বারে বারেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। অন্য কারোকে আঘাত দেওয়ার জন্য নয়। এবং কুরুচিপূর্ণভাবে নিজ ধর্ম বিষয়ে আস্ফালন করার জন্যও নয়। বঙ্কিমের কাণ্ডজ্ঞান অতটা কম ছিল না। মনে রাখতে হবে যে, এটা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, বঙ্কিম ছিলেন এদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের মধ্যে অগ্রণী।

(৩) **তিনি কি মুসলমান ধর্মের বিদ্বেষী ছিলেন এবং খৃষ্ট ধর্মেরও ?**—এ বিষয়ে প্রথম কথা হল এই যে, তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, সর্ব ধর্মের মধ্যে যে নিত্যবস্তু আছে তার উপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রধান প্রধান ধর্মগুলির নাম করার সময়ে খৃষ্টীয়ান ধর্মের নাম প্রথমে করেছেন এবং মুসলমান ধর্মেরও নাম ধর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'সাম্য' পুস্তকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ তিনটি সাম্যের প্রবক্তার মধ্যে যীশুকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের পূর্বে যে, হিন্দুরা মুসলমানদের সমান বলে ভাবত সে কথা তিনি গৌরব বোধের সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সত্য বলতে ভয় পেতেন না। হিন্দু শাস্ত্রের সমালোচনার প্রয়োজনে আমরা তাঁকে খুব কঠোর হতে দেখেছি এবং ইতি পূর্বে উল্লেখও করেছি। তাই মুসলমানদের যে একটি জায়গায় মানসিক সঙ্কীর্ণতা আছে বলে তাঁর বোধ হয়েছে তার উল্লেখ তিনি নির্ভয়ে ও নির্বিধায় করেছেন। মনুষ্যে প্রীতির আলোচনার সময় তিনি মুসলমানদের ধর্মকে "প্রীতি—বিস্তারের নিরোধক"

বলেছেন। এবং বোধ হয়, ঠিকই বলেছেন। যদিও আমি খুবই সচেতন যে, মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান মোটেই গভীর নয়। এমন কি, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এ জ্ঞান নিতান্ত অগভীরই। তবুও ধর্মপুস্তকে অন্য কথা থাকলেও তাদের অধিকাংশের মনোভাবের যে এটা একটা প্রধান লক্ষণ একথা আমারও মনে হয়। কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিও তা অস্বীকার করবেন না। অবশ্য সত্য যদি অন্যরূপ হয়, তা জানলে আমি অত্যন্ত খুশী হব। কেননা, আমি কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নই। একমাত্র মানুষেই বিশ্বাসী। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কোন বিষয়ে ভাল করে না জেনে বলবেন, তা আমার বিশ্বাস হয় না। যাই হোক্, এটা আমার বিশ্বাস, যুক্তি নয়। তবে পুরোপুরি যুক্তি বহির্ভূতও নয়,—বঙ্কিমের চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উপর নির্ভর করেই উক্তিটি করেছি। যাক্ অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এ বিষয়ে—(এবং আমার আলোচিত সর্ব বিষয়ে) আলোকপাত করলে আমি পরম কৃতজ্ঞ হব। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের গুরুত্ব এবং বঙ্কিম সম্বন্ধে মুসলমানদের প্রচলিত অভিযোগের কথা ভেবেই এই আলোচনা সুরু করেছি এবং এতটা টেনেছি।

(৪) **বঙ্কিম কি নারী বিদ্বেষী ছিলেন ?**—এটা একেবারে ভুল ধারণা যে, বঙ্কিম নারী বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি 'সাম্য' পুস্তকে এমন সব কথা নারীদের সপক্ষে বলেছেন যা এতদিন বাদে ঐ নারী সমর্থকরা বলছেন। অবশ্য বলা হবে যে, "ধর্মতত্ত্ব" পুস্তকে তিনি নারীকে তার প্রাপ্য স্থান দেন নি। একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, নারীর সামাজিক স্থান বিষয়ে তিনি 'সাম্যের' পরে "ধর্মতত্ত্বে" তাঁর মত বদলিয়ে ছিলেন। একটু পিছুও হঠেছিলেন। কিন্তু সেটা তিনি বিদ্বেষশতঃ কখনই করেননি। সমাজে পরিবারের ভূমিকা সম্বন্ধীয় মতের পরিবর্তন ঘটায় তিনি তাঁর পূর্বের মত কিছুটা পরিবর্তিত করেছিলেন। পরিবারের স্থিতিশীলতার চিন্তা তাঁকে 'সাম্যের' পরে বিশেষ চিন্তিত করেছিল এবং তার আমূল পরিবর্তনের চিন্তায় তিনি খানিকটা সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন—এরকম সিদ্ধান্ত অপ্রতিরোধ্য। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, পরিবার সম্বন্ধীয় ভীতিটা এবং তার উপর নির্ভরশীল যুক্তিটা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য ? যুক্তি যে আছে তা মানতেই হবে। কেন না সর্ব বিষয়ে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হলে পরিবারে যে বিপর্যয় আসবে তা যুক্তিতেও অকাট্য এবং বঙ্কিম-পরবর্তীকালের, বিশেষ করে করে বর্তমান কালের, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিপুলভাবে সমর্থিত। কিন্তু পরিবারে বিপর্যয় আসবে বলে কি নারীকে তার পূর্ণ মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত

রাখা উচিত, না যাবে ? সহজ উত্তর—উচিতও নয়,যাবেও না। সমান শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ পেলে নারী কখনও সমাজে নিকৃষ্ট স্থান গ্রহণ করবে না এবং তার গ্রহণ করাও উচিত নয়। সমাজ রক্ষায় নারী পুরুষের সমান দায়িত্ব। সুতরাং সে দায়িত্ব সমানভাবে পুরুষদের পালন করতে হবে। না করলে সমাজের পুরোনো কাঠামো ভেঙ্গে যাবে এবং প্রথম দিকে অনেক ক্ষতিও হবে সবদিক থেকে, বিশেষতঃ সন্তানদের দিক থেকে। কিন্তু উপায় কি ? পুরুষদের যা মতি-গতি তাতে সাধারণ ভাবে তাদের প্রকৃতি বদলান'র আশা ব্যাপকভাবে করা যায় না। জাগ্রতা নারীও পুরুষের অযৌক্তিক আধিপত্য মানবে না। সুতরাং, পুরোনো পরিবার-নির্ভর সমাজ ভাঙ্গবেই এবং ভাঙ্গছেও। নারী পুরুষের নূতন সম্পর্কের উদ্ভব, প্রয়োজনের তাড়নাতেই হচ্ছে। অন্ততঃ কিছুকাল ঐ রকম সম্পর্ক সর্বব্যাপী হবেই বলে মনে হচ্ছে। সে সম্পর্ক হল 'বন্ধনহীন গ্রন্থির' ('Untied Knot') সম্পর্ক। তবে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজকে এ বিষয়ে হাত দিতেই হবে শিশু সন্তানদের দিকে চেয়ে। সুতরাং বঙ্কিমের ভীতি অমূলক ছিল না। তিনি সমাজ, ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কারক ছিলেন। বিপ্লবী ছিলেন না। তাই তাঁর কাছ থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নির্দেশ পাওয়ার চিন্তা নিছক বোকামি।

তবে পরিবারে বিপ্লব না চাইলেও তাকে বাঁচিয়ে রেখে তার ভেতরের মানবীয় সম্পর্ককে যতটা সম্ভব উন্নত করতে তিনি চেয়েছিলেন। যোগ্য নারী পুরুষের শ্রদ্ধার পাত্রী এ কথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন। মানবিক (হৃদয়জাত) অনেক গুণে মেয়েরা (অশিক্ষিতাও) পুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তিনি তা স্বীকার করেছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করেও কৌতেয় নারীর পক্ষে মতের তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন করেছিলেন। এবং মনুষ্যত্বের বিকাশে অর্থাৎ অনুশীলন ও ধর্মচর্চায় নারীর যে সমান অধিকার আছে তাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। তবে সর্বশক্তিবিকশিতা নারী পুরুষকে শুধু স্বামী বলেই যে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে পারে না বা তার ভাবা উচিত নয়, তা তিনি ভয়ার্ত ও কিংকিং বিহ্বল হয়ে দেখতে পান নি। তবে তাঁর পরে আবির্ভূত শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এঁরাও কেউ এ বিষয়ে স্বচ্ছ নির্ভীক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না। এ বিষয়ে পরবর্তী দুই মহারথী বরং, মনে হয়, বঙ্কিমের চেয়েও কিছুটা পশ্চাৎমুখী ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁরা কেউই স্বচ্ছন্দ মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে এগোতে পারেন নি। তাঁরা যথেষ্ট আগুপিছু করেছেন, কিন্তু পরিষ্কার পথ পান নি এবং তাই আমাদের দেখাতেও পারেন নি। নারীকে

সর্বত্র সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব স্বীকার করেন নি, সে রকম চিত্রও আঁকেন নি।

৫। **বঙ্কিম কি জাতিভেদের সমর্থক ছিলেন?**—অতীত কালের বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই জাতিভেদের সমর্থক ছিলেন। কেননা তিনি অতীতের ব্রাহ্মণদের গৌরবময় সমাজগুরুর ভূমিকা সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন এবং তার বেশ একটু উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনাই দিয়েছেন। তবে বর্তমান কালে ব্রাহ্মণদের অতীতের গুণ সাধারণতঃ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে বলে' তারা আর এখন সাধারণভাবে শ্রদ্ধার্হ নয়, এ কথাও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন। যে-ব্রাহ্মণের যোগ্য গুণ আছে কেবল তিনিই সম্মান পাওয়ার অধিকারী এ কথা বঙ্কিম বলেছেন। আরও বলেছেন যে, শুধু গুণী ব্রাহ্মণ নয়, গুণী শূদ্রও সমান শ্রদ্ধার পাত্র। এই উক্তির সমর্থনও শাস্ত্র থেকে দেখিয়েছেন। সুতরাং তিনি জন্মগত জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, অন্ততঃ সজ্ঞান চিন্তায়। বঙ্কিমের প্রগতিশীলতা এখানে বিশেষ লক্ষণীয়, সমাজ-বিপ্লবের ডাক না দিলেও।

এই কয়টি প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিয়ে আমি বঙ্কিমের "ধর্মতত্ত্বের" আলোচনা শেষ করছি। (সমাপ্ত)

আবার হরিদ্বারে

হরপ্রসাদ মিত্র

মনসা-পাহাড় থেকে নেমে হর-কি-পেড়ি ঘাটে
গঙ্গারতি দেখার আবেশ যে জানে, সে জানে।
পাতার ভেলায় ফুল ভেসে যায়, প্রদীপ জ্বলে তাতে,
বিন্দু বিন্দু আলোর চলা দূরের তমিস্রাতে।

এই রকমই ছিল এবং এইরকমই আছে,
অনেক নতুন পথ হয়েছে জলের কিনারাতে।
চিল্লি নামে নতুন শহর নীলধারা-পুল-পারে
হচ্ছে গড়া, বাঁদরগুলো ঢিল ছোঁড়ে সেইখানে।
সেই দিকে ঐ চণ্ডীপাহাড় পেরিয়ে গেলে সাঁকো,
ফিরে যাবার আগে বুকে এই ছবিটাও রাখো।

চাঁদ ছিল কাল সন্ধেবেলায় পুবদিকে বেশ বড়ো,
পূর্ণিমাকে বলেছিলুম, যাবার সময় হোলো।
হৃদযন্ত্র মাঝে মাঝেই হারাচ্ছেই তার তাল,
হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যায় নাম-রূপ-দেশ-কাল.
আমিত্বটার কূলকিনারা মিলছে না তাই আর ;
জ্ঞান ফিরলেই গঙ্গাধারায় দেখি হরিদ্বার।

বাসন্তী পঞ্চমী

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাসন্তী পুজোর পঞ্চমীর ভোরে
আঙিনায় ফুটে উঠলো
দুটি স্থলপদ্মে
মায়ের চরণচিহ্ন।
মনে পড়লো শারদীয়া পুজোর আগে
এমনি করে মা জানিয়েছিলেন
তাঁর আগমন-কথা।
নানা শাখায় ফুটে উঠতো
একের পর এক
চরণচিহ্ন।
মনে করিয়ে দিল,
'মা আসার আর দেরী নেই।
তৈরী হয়ে নাও,
সাজিয়ে রাখো
তোমার বরণডালা—
এনে রাখো
পৃথিবীর প্রাণ-ছোঁয়া মাটি,
আর
দিক-দিগন্তের তীর্থবারি!
সেরে নাও
মায়ের মহাস্নান।
তিনটি দিনের পুজোয়
হৃদয়ের পূর্ণঘট ভরে দিয়ে
মা আবার কৈলাসে ফিরে যাবেন,
ভোলানাথের সংসারে।
মায়ের ছোঁয়ায় সংসারের সব ভালোবাসা,
সব আপন হওয়া,
সব একান্ত হারিয়ে যাওয়া,
অন্তরের অন্তরতম গভীরে
মিলতে থাকবে।
পুজোর শেষে
জলে স্থলে আকাশে
সর্বত্রব্যাপ্ত চৈতন্যরূপিনী মাকে
ফিরে পাবে,
দুই চোখ জুড়ে
সমস্ত প্রাণ ভরে'।
সেই ভোরের রাগিনী
আবার বাজছে—
দুটি স্থলপদ্ম ঘিরে,
বাসন্তীপুজোর
ভোরবেলায়।

সাজন্ত

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

নিজেকে যতটা হয় গোছগাছ করা
অথবা নিজের কাছে নিজেকে মেলায় মেলে ধরা—
ঢাকাঢাকি থাকা নয়, খোলামেলা মন,
অনলস অবলীলা স্বরূপ সন্ধানে পেয়ে কিছু সঙ্গোপন ?

নাট্যমঞ্চে চলচ্চিত্রে সুসজ্জিতা সুদীপ্তির মেয়ে—
গৃহস্থ সমাজ জানে পাঁচপেঁচি সাধারণে নেয়ে,
নিজেকে সুনামী পত্রে নানা ঢঙে ঢাঙে—
রেখেছে প্রচার যন্ত্রী মোড়কের বাহারী নিলয় যেন রাঙে।

আসলে সকলে চায় নিজের জাহির
কাজের কাজির চেয়ে কাজিয়া বাহির
অন্তর্লীন মন পাবে—এমন কজন দেখা যায় ?
বাহ্যিকতা আড়ম্বরে সামাজিক সাজন্ত মানায়।

অভিনয়ে সুস্থ সাজে অসুস্থ নায়ক
আদতে বেকার জন সুস্থ দেহী বিকৃত সায়ক
অর্থাৎ ঘটন্ত হয় যে যা নয় তার—
প্রকৃত নাটক এক এ জগৎ আপন অপার।

আমরা সাজছি শুধু প্রয়োজনে বুঝে
ঢেকে রেখে নিজেদের সদাশিব সুন্দর সবুজে !

পুতুল খেলা

বিজয় কুমার দত্ত

পুতুল সাজিয়ে নিয়ে বসে আছি চড়কমেলায়
পথে কত মানুষের আনাগোনা শিশু ও বালক
কিশোরী তরুণ আর পত্নিপূর্ণ নারী
কেউ কি আমার সামনে দাঁড়াবে হঠাৎ ?

দুপুরের রোদে কাঁপে বিকেলের ছায়া—
আকাশে মন্থর, স্থির মেঘের বিস্তার
এই বুঝি সন্ধ্যে হ'য়ে এল
পুতুল সাজিয়ে, তবু এদিক ওদিক চেয়ে থাকি
কা'র দিকে ? সেকি চেনা ? নাকি জন্ম-জন্মান্তরে
হ'য়ে রইল আজো আধো-চেনা ?
সে আমার পুতুলের মধ্যে আনবে প্রাণের চেতনা।

কোথায় সে চলে যায় ? কোন্ সে রঙীন
মেলার প্রত্যন্তে ছুটে চলে যেতে চায় !
সন্ধ্যে আরো ঘন হ'ল, রাত আসছে দ্রুতপায়ে, ওই
ভৌতিক আঘাতে সব পুতুলেরা ভেঙে চুরে যায়
আঁধারে নিশ্চল থাকে পুতুলের হাড়গোড় সার
আমার হৃদয়ে তার আমরণ নষ্ট অভিমান—
অথবা আমিই নিজে পুতুলের মাটির সমান।

নীলকণ্ঠ এসো

বাজীরাও সেন

চোখের দীপালি জুড়ে
প্রতীক্ষার সুসংবাদ হয় নাকো লেখা,
ছবি আঁকা আয়ত সবুজ এখন কোথাও নেই।
নিরুদ্দেশ নীলাম্বরী মেঘ।
সব কুম্ভ শূন্য রিক্ত—
সুধা নয় শুধু বিষ, তীক্ষ্ণ হলাহল।
প্রখর সংশয় ;
সহোদরে সহোদরে সেতুবন্ধ হয় নাকো বাঁধা।
সংঘাতে বিরোধে মুখোমুখি হয় না হৃদয়।
ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ ব্যক্তিবোধ।
চারিদিকে ভাঙা আর ভাঙাই কেবল।
সুতরাং অন্য কেউ নয়,
নীলকণ্ঠ এসো তুমি। এসো আরবার
ছিন্ন খিন্ন বসুধার সব বিষ কণ্ঠে তুলে নিয়ে
দীক্ষা দাও ত্যাগে, প্রেমে, লোকায়ত নিয়ত কল্যাণে,
অমৃতে আপ্লুত করো জীবনের সমস্যা সঞ্চয়।
পুনরায়—
জল মাটি আকাশ বাতাস সৃষ্টিশীল, শস্যশীল হোক্
ভালোবাসা এবং ক্ষমায়।

পর্যটন

সন্তোষ কুমার মাজী

দিনভর বসে আছি নদীর কিনারে
চোখ জুড়ে তন্দ্রাও আসে না
তমসা-রোদের খেলা প্রজ্ঞার ভিতরে।

পড়ন্ত রোদে আরও একবার ভাবি
নতুন করে খুঁজে পাবো পায়ের কাছে পাথর
স্বস্তিসময়
আশির মধ্যেকার আনিকে বলবো, 'তুই চলে যা'
নদীর জলের আকাশকে বলবো, 'দ্বিতধী হও'

বসন্তের স্পর্শে বুঝি ধ্বনিময় হয়ে উঠবে দিনকাল
শরীরী মুদ্রায় ফিরে পাবো নিজস্ব দর্পন

সূর্যাস্তকে ভেঙে খান্ খান্ করি
শব্দের আঘাতে ভাঙি আয়নার কাচকে
আগুনের মধ্যে দেখি জলহাস, হাওয়ার বুদ্‌বুদ্

দীর্ঘ পর্যটন আর শেষ হয় না, হলুদ পাতায়
জড়িয়ে যায় পা।

বি. দ্র.—আমরা খুবই দুঃখিত যে গত ১৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় "শক্তি" কবিতাটির রচয়িতারূপে সোমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর নাম মুদ্রিত হয়েছিল। কবিতাটি শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক রচিত।

এমনি করেই*

পান্নালাল দাশগুপ্ত

[* স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (১৯শে আগষ্ট, ১৯৮৯) "কম্পাস" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। উক্ত পত্রিকা সম্পাদকের অনুমতিক্রমে আলেখ্যতে পুনর্মুদ্রিত।]

আমি অনেক সময় ভাবি মহান জার্মান জাতি—যাদের অবদান—সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন সর্বক্ষেত্রেই এতো—তারা হিটলারের মত এমন একটা ফ্যাসিবাদী নেতাকে মানলো কী করে? আর এখানে, এই পশ্চিমবঙ্গেই বা কী করে ধীরে ধীরে টোটেলিটারিয়ান একটা ত্রাসের রাজত্ব এলো কী করে, যেখানে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ এতকাল সংস্কৃতি-জগতে বিরাজ করে এসেছিলেন এবং যে রাজ্য একদা একটা স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ও মহান বিপ্লবীদের জন্ম দিয়েছে?

আসলে "এমনি করেই"। অর্থাৎ" ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে"—এই ঐতিহাসিক নীতিতেই।

দলবদ্ধ গুণ্ডামী ও মাস্‌ল্‌-পাওয়ারের এতবড় প্রভাব এলো কী করে? ক্ষুদিরাম, কানাইলালের দেশের যুবক-যুবতীরা আজ এমন ভীতু হয়ে পড়লো কী করে?

এটা, আমার বিচারে, কেবল মারের ভয়েই নয়। কেননা মার দেবার দল আজ দেশে একটাই নেই। সব দলই গুণ্ডা পুষে থাকে, গুণ্ডা না হলে দল রক্ষা হয় না, ভোটে জেতা যায় না। এই সমাজে গুণ্ডার প্রয়োজন আছে—social necessity আছে। তাই পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডা বাহিনী বহাল তবিয়তে আছে। রাজনৈতিক দলগুলির সভ্যরা হয়তো নিজেরা গুণ্ডা নন, গুণ্ডা হবার সাহসও তাদের নেই, নিজেরা গুণ্ডা হবার ঝুঁকিও নেন না। তারা ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো বিলাসী, ভোগবাদের কাঙাল। অতীতে যেমন রাজনৈতিক দলের ছেলেরা নিজেরাই মারামারি করতো, তা এখন তারা নিজেরা আর করে না। ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের মাস্‌ল্‌ পাওয়ার ব্যবহার করে। পুলিসরাও তাই করে। জেলখানার কর্তৃপক্ষও যণ্ডাগুণ্ডা কয়েদীদের দিয়েই নিরীহ কয়েদীদের বাবিয়ে রাখে ও দুর্নীতির ভাগ সংগ্রহ করে।

আর গুণ্ডারাও যে আজকাল ভয়ানক সাহসী বা বেপরোয়া গুণ্ডা হয়েছে, তাও কিন্তু ঠিক নয়। তারাও অন্যান্যদের মতই সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী হয়েছে। তারাও আসলে ভীতু। দলবদ্ধ না হতে পারলে এবং রাজনৈতিক দলগুলির ও পুলিসের সমর্থন না পেলে তারাও গুণ্ডামী করতে সাহস পায় না।

আসলে গোটা জাতটাই ভয়াবহভাবে ভীতু হয়ে পড়েছে। সত্যিকার সাহসী হতে হলে দুঃখকষ্ট ত্যাগ বরণ করে নিতে হয়, এমনকি মরতেও প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু ভোগবাদ ও দেহবাদ আজ সকল মানুষের চরিত্র দুর্বল করে দিয়েছে। বাঘা বাঘা আই-এ-এস, আই-পি-এস অফিসার দেখেছি, কেমন ক'রে মন্ত্রীর হুকুম জো-হুজুর বলে মেনে নেন, একদম অন্যায় ও মিথ্যা জেনেও। কেন নেন, কেন এত ভয়? পাছে তাঁকে কোলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি অথবা দণ্ডকারণ্যের কোরাপুটে বদলি করে দেয়!! এমন সহজ উপভোগ্য নাগরিক জীবন, গাড়ী, টি-ভি, ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইত্যাদি ব্যবস্থা এই মহানগরীগুলিতে আছে যে মফঃস্বলে বদলি হয়ে যাবার ভয়ে নির্লজ্জের মত হরদম "স্যার স্যার" করে জল উঁচু বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

এই রকম মেরুদণ্ডহীন আজ প্রায় সব বুদ্ধিজীবীরাই হয়ে পড়েছেন। Soft life তাদের চরিত্রকে বিগলিত করে দিয়েছে—এমন কি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকদেরও। সল্ট লেকে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যেতে পারে এই আশায় মন্ত্রীদের প্রতি তারা কত সফ্‌ট!

আজকালকার বড় কাগজের সম্পাদকদের মাইনে ও অন্যান্য সুবিধার মোট দাম হয়তো দশ হাজার টাকা বা আরও কিছু বেশি। দশহাজারী সহজ মজার জীবন ভোগ করতে তাঁরা এমন অভ্যস্ত যে, মালিকদের বিন্দুমাত্র কটাক্ষকে তাঁরা যমের মত ভয় করেন। মনে করুন, বাংলাদেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তখনকার খবরের কাগজগুলি ছিল কত তেজস্বী। কেননা তখন সম্পাদকেরা ও সাংবাদিকরাও জেল খাটতে ভয় পেতেন না। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী একটি বিখ্যাত কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাঁর "বন্দেমাতরম্" কাগজের অফিসে আসতেন খড়ম পায়ে, খালি গায়ে পৈতা ঝুলিয়ে। তিনি তো নেমেই ছিলেন, তাঁকে কোন্ কর্তৃপক্ষ ভয় দেখাতে পারে বা নীচে নামাতে পারে? তিনি ছিলেন অকুতোভয়। যেমন অকুতোভয় ছিলেন বিদ্যাসাগর, যেমন অকুতোভয় ছিলেন সর্বত্যাগী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই ত্যাগ-ধর্মই তাঁদের শক্তি দিতো, জনসাধারণের বুকেও বল সৃষ্টি করতো। কিন্তু আজকালকার ভোগবাদী কনজিউমারিস্ট উপর তলার নেতা, বক্তা, মন্ত্রী, সম্পাদকদের নিজেদের জীবনে কোথাও কী এতটুকু ত্যাগের পরিচয় আছে? তাঁরা নিজেরাই সর্বদাই গদী হারাবার ভয়ে ভীত।

কাজেই ত্রাসের রাজত্ব আসছে কেবল দলবাজী গুণ্ডামী ও সন্ত্রাস দিয়েই নয়। আসছে চরিত্রবল নষ্ট করিয়ে দিয়ে। যে চরিত্র বলের অভাবে মাথা তুলে কেউ সত্য কথা বলতে সাহস পচ্ছে না। নরম-জীবন, ভোগবাদী জীবনের হাতছানি আজ দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদেরও নানা প্রলোভন দেখায়। দুর্নীতির পথ ধরতে উৎসাহ দেয়। অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাদেরও লজ্জাবোধ করে না। আগের দিনে, ইংরেজদের আমলে রাজ্যশাসনের নীতি ছিল, divide and rule,—আজকের রাজনীতি হলো corrupt and rule. আর আয়ের চেয়ে ব্যয়ের বহর যদি বাড়াই, তবে দুর্নীতির আশ্রয় ও প্রশ্রয় নিতেও দিতে হবেই। আর আজকাল ভোগবাদী সভ্যতার কে কাঙাল নয়? অবশ্য বেশীর ভাগ লোকেরই ওই উন্নতমানের ভোগ মিলছে না, মিলছে দুর্ভোগ। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! একটা ছাগলের যদি কখনও তিনটি বাচ্চা হয়, দু'টো তো বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খায়, তৃতীয়টা লাফাতে থাকে. এমন দৃশ্যও তো দেখা যায়!

এখন কী করা যায়? অনেকেই তা ভাবেন ও কী করা যায় ভেবে না পেয়ে নিজেকে মানিয়ে চলবার চেষ্টা করেন। পিছনে সরতে থাকেন, নিজের দায়-দায়িত্ব কিছু আছে বলে মনে করেন না। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার শক্তি কই? যারা প্রতিরোধ করবে তাদের সংগঠন কই, পাল্টা দল কই? একা একা কি কিছু করার সাধ্য আছে, এই দলবল সংগঠন সর্বস্ব আর্থসামাজিক রাজনৈতিক বৃহৎ ব্যবস্থাপনার যুগে?—কিন্তু এজাতীয় চেতনা ভুল। পাল্টা কোন দল করতে গেলে, আজকাল দলীয় নিয়মে সেই অর্থবল, বাহুবল ইত্যাদি সবই চাই। অর্থাৎ রোগের প্রতিকারে যে দাওয়াই আনবো সেটাও একটা রোগই। এমনি করেই শুদ্ধ ও শুদ্ধতর দল গড়তে গিয়ে এই দেশে এত দলের জন্ম হয়েছে। দল দিয়ে কখনই অন্য দলের উৎপাত বন্ধ করা যাবে না।

হ্যাঁ, এমনি করেই আমরা পিছু হটতে হটতে বর্তমানে এক ভয়ের রাজত্বে, সন্ত্রাসের রাজত্বে এসে পড়েছি। নানা টোটালিটারিয়ানিজমের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। আমার গায়ে বোধ হয় কোনো আঘাত পড়বে না মনে করে, নিজ নিজ

দায়িত্ব পালনের সুবিধাবাদী পথ নিচ্ছি। ভাবছি, কোন না কোন দলের ক্ষেত্রে আশ্রয় নিতেই হবে বুঝি বা। এদিকে দেখছি, পৃথিবীর সর্বত্র সর্বপ্রকার মতাদর্শ বা ideology-র অবসান ঘটে যাচ্ছে (End of all Ideologies)। এমন কি সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলিও আজ ব্যক্তির ধর্মরক্ষা করছে না। এমন দিনে 'সঙ্ঘ শরণং গচ্ছামি, দলং শরণং গচ্ছামি' নীতি অচল। মানুষকে বর্তমানে তার নিজ নিজ মনুষ্যবোধের নিকটেই আশ্রয় নিতে হবে। ব্যক্তির মনুষ্যত্ব-বোধই আজ রুগ্ন সমাজকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। একলা চলার সাহস অর্জন করতে হবে, নির্ভীকতার সাধনা করতে হবে। মানুষ সামাজিক জীব বটে, কিন্তু যুথবদ্ধ পশুপাল সে নয়।

পথের সন্ধান দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগিতা করো, সত্যাগ্রহ করো। পৃথিবীতে যে যত বড় শক্তিমান রাজা হোক বা রাজত্বই চালাক না কেন, জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন তারা একদিনও তিষ্ঠতে পারেন না। কিন্তু জনসাধারণ তো আমার হাতে নেই, তবে আমি কী করতে পারি? আমিই সুরু করতে পারি। একলাই চলা যায়। একলা চলরে, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। অপর কেউ আমার ডাকে আসুক না আসুক, আমি একলাই চলবো। এই একলা চলার পথে যা কিছু দুঃখকষ্ট আসুক, পারিবারিক অসন্তোষ আর গৃহবিবাদ আসুক, কুছ পরোয়া নেই। যেমন করে একদিন ঋষি টলস্টয় তাঁর নিজের পরিবারের মধ্যেও বিরোধিতার মোকাবিলা করে-ছিলেন, সেই রকমভাবে এই দুর্নীতিপরায়ণ ভোগসর্বস্ব দেহবাদী সভ্যতার সঙ্গে অসহযোগিতা করতে গেলে যদি আমার পরিবারের মধ্যেই বিরোধ লেগে যায়, লাগুক, সেই তো সংগ্রাম। সংগ্রাম কেবল ময়দান থেকে সুরু হবে কেন? বরং ময়দান থেকে এই বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হবেই না, কেন না তেরা মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবেন না। সংগঠন চাই, দল চাই, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, দলং শরণং গচ্ছামি—এ সব কথা আজ ভুয়ো। এসব তথাকথিত বৈজ্ঞানিক কথার আড়ালে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তারই অজুহাত খোঁজা হয়।

১৯৪১ সালে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ সুরু করলেন, প্রথমে বিনোবা ভাবেকে দিয়ে। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী—বিনোবার পরে, নির্ধারিত হলেন ব্রহ্মানন্দ বলে একজন প্রায় অখ্যাত ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি একক সত্যাগ্রহ করে' বলবেন, এই যুদ্ধে এক পাইও নয়, এক ভাইও নয়—তিনি

নির্দিষ্ট হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। নেহেরু যদি এই যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহে নেমে যান, তাহলে তো দেশশুদ্ধ লোক ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এই ভয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে আগেই ধরে ফেলে নানা মামলায় চার বছর জেল দিয়ে রেখে দেয়।

এসময়ে অনেক লোক মহাত্মার নানা কটু সমালোচনা করে। ১৯২০-২১, ১৯৩০-৩১-৩২ সালে যেখানে গান্ধীজী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে জেলে যাবার বা আইন ভাঙার জন্য জমায়েত করতেন, এখন (১৯৪০-৪১) তিনিই কেন এই গণ-আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে এই ধরনের ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ করতে বলছেন? এতে কি কোন কাজ হবে, এটা কি আমাদের এত বড় দেশের কোটি কোটি লোকের প্রতিরোধ শক্তিকে না-জাগাবার মতলব নয়? এটা কি বিপ্লববাদের ভয়ে করা হচ্ছে না? এখানে স্বয়ং গান্ধীজীর একটি উক্তি তুলে দিচ্ছি।—

"I would like to warn you against thinking that there is no fundamental difference between individual civil resistance and mass civil resistance. I think that fundamental difference is implied in your own admission that "it is essentialy an individual affair." The chief distinction between mass civil resistance and individual resistance is that, in the latter every one is a complete independent unit and his fall does not affect the others ; in mass civil resistance, fault of one generally adversely affecte the rest. Again in mass civil resistance leadership is essential, in individual civil resistance, every resister is his own leader. Then again in mass civil resistance, there is a possibility of failure, in individual civil resistance failure is an impossibility. Finally a state may cope with mass civil resistance, but no state has yet been found to cope with individual resistance.

(From a letter to Pandit Jawaharlal Nehru, from Parnakuthi, Pune, sept. 13, 1933.—Tendulkar-Vol—8.)

দেখা যাচ্ছে যে, গান্ধীজীর বিচারে কোন ব্যক্তিই অসহায় নয়, একা

একজন ব্যক্তিই—সংগঠন ছাড়াও—প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে, যদি অবশ্য তার সাহস থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ অবদান কী? সাধারণের মনে 'অভয়' সৃষ্টি করা। গীতার ব্যাখ্যা নিয়ে তিনি যে পুস্তক লিখে গেছেন তাতে তিনি গীতাতে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নানা গুণাবলীর মধ্যে অভয়কেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। গীতাও তাই দিয়েছে। স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তির গুণাবলী কী কী, এ সম্বন্ধে গীতাতে বারবার উল্লেখ আছে। কোথাও ২৪টি গুণ, কোথাও ২৬টি অথবা ২২টি। কিন্তু সব স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির গুণাবলীর শ্লোকে প্রথমেই রয়েছে, 'অভয়ং'। বাস্তবিক কেউ অভয় না হতে পারলে সত্যবাদী হতে পারে না, সদাচারী হতে পারে না, আশ্রিতকে আশ্রয় দিতে পারে না। অভয় যেন অন্যান্য সব গুণাবলীর প্রধান রক্ষক।

মানুষের ভয় আসে কোথা থেকে? অজ্ঞান থেকে। অজ্ঞানই সমস্ত ভয়ের কারণ। দেহই আত্মা, এই মরদেহকেই যদি আত্মা বলে মানি বা পূজা করি তবে এই দেহের জন্য সর্বদাই শঙ্কিত থাকতে হবে। দেহাত্মবাদকে কেবল হিন্দুধর্মই অস্বীকার করে নি, সকল ধর্মই বলে, যে দেহই আত্মা নয়। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মার মৃত্যু নেই—জন্মও নেই। এই মৃত্যুহীন আত্মার পরিচয় পেলেই মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে। দেহই আত্মা এই ভ্রম বা অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ এই অভয় বাণী দিয়েই জাতির বুকে সাহস সৃষ্টি ক'রেছিলেন। আমরা সকলে দেহকেই সব বা সর্বস্ব মনে করে অনবরত ভয়ে ভয়ে বাস করি। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলে গেছেন—

ধনের বোঝা, খ্যাতির বোঝা,
দুর্ভাবনার বোঝা
ধুলোয় ফেলে দিয়ে
নিরুদ্‌বেগ চলেছিল জটিল সংকটে।
ললাট তাদের লক্ষ্য করে
পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল
দুর্জনেরা মলিন হাতে।...
... ...
ভয় কোরোনা, লোভ কোরোনা,
ক্ষোভ কোরোনা,
জাগো আমার মন...

যেখানে ওই কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ে গ্লানিভরে মাথা তোমার না
হয় যেন নত।

লোভ থেকেই তো ভয়ের জন্ম। আর এ লোভ নানা জাতের। ভোগের লোভ, খ্যাতির লোভ, পুণ্যের লোভ—লোভ মাত্রই দুর্বলতার কারণ। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে বলেছেন। তাঁর সব কবিতা ও গান এই নিয়েই।

'দূর হতে ভেবেছিনু মনে—
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তবে লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হ'তে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরু দুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে নাকি—
আছে বাকি
শেষ বজ্রঘাত?'
নামিল আঘাত॥
এই মাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।

যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি,
তোমায় আমার চেয়ে বড়ো বলে
নিয়েছিনু গণি।
তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোট হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।

এই যে মৃত্যুঞ্জয় সত্যের সাধনা, এই নির্ভীকতা আসবে কী ক'রে? গান্ধীজী তাঁর উত্তর দিয়ে গেছেন।—সত্য বা সৎ জীবন যাপনের মাধ্যমে। 'সত্যাগ্রহ স্বচ্ছন্দ-লব্ধ'। সত্যাগ্রহী সংগ্রাম সৎ জীবন যাপনের পথে আপনিই এসে উপস্থিত হয়। এই সত্যের জন্য সংগ্রামে, শত্রু খুঁজে বেড়াতে হবে না নিজের বাইরে। এটা সকলেই পারে, প্রত্যেকেই পারে। নর-নারী, শিশু, কারও পক্ষেই তা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নয়। লোভ থেকে মুক্ত হতে হবে। সবরকমের লোভ থেকে। এখানেই ব্যক্তির মহিমা। দলবল না হলে ঐ সংগ্রাম চলে না, একথা ঠিক নয়, ঠিক নয়। আমরা কেউ অসহায় নই।

—পান্নালাল দাশগুপ্ত

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বরূপ

ডরোথি এল. সেয়ার্স

[ইংরেজ লেখিকা ডরোথি এল সেয়ার্স (১৮৯৩-) ডিটেকটিভ কাহিনী লিখে এক সময় খুব খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বেশ কিছু নাটকও লিখেছেন। দান্তের *Inferno*'র ইংরাজীতে অতি সুন্দর পদ্য অনুবাদ করে' তিনি আপন কবিত্ব শক্তিরও বিশেষ পরিচয় দেন। তাঁর এই প্রবন্ধটি (ইংরেজী শিরোনাম : *How free Is the Press*) ইংরাজি থেকে অনুবাদ করেছেন, প্রীতিবাল্পতি চৌধুরী)]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া যে, কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্থহীন, তা এতই সর্বজনগ্রাহ্য সত্য যে, সেবিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় নিরর্থক। এবং আমরা এই মুহূর্তে, যুদ্ধের কারণে* সংবাদপত্র জগতের উপর আরোপিত বিধি নিষেধ নিয়েও আলোচনা করবো না। এরকম সময়ে আবশ্যিক ভাবেই সর্বপ্রকার স্বাধীনতারই সঙ্কোচ ঘটবে ; তবে স্বাধীন দেশের মানুষের দেখা উচিত যেন যুদ্ধ শেষে আবার তাদের সবগুলি স্বাধীনতাই পূর্ণরূপ ফিরে আসে। ইতিমধ্যে ভালো হয়, যদি আমরা এই স্বাধীনতাগুলির স্বরূপ কী এবং কী মাত্রায় তা সত্যই কাঙ্ক্ষণীয় সে সম্পর্কে ভেবে দেখি। হয়তো দেখা যাবে যে, তথাকথিত এই স্বাধীনতাগুলি কোনো স্বাধীনতাই নয়, অথবা তা জনসাধারণের উপর কারো কারো স্বৈরতন্ত্র চালানোরই স্বাধীনতা। স্বৈরতন্ত্র হোল কোনো একজনের, বা একটি দুর্জন গোষ্ঠীর ইচ্ছা সর্বসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অবাধ স্বাধীনতা।

যখন আমরা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার কথা বলি, তখন আমরা 'স্বাধীনতা' কথাটা সঙ্কীর্ণ ও পারিভাষিক অর্থেই' বুঝে থাকি,—যেমন, সরকারী চালনা বা সরকারের নিষেধ বিধি (সেন্সরশিপ) না থাকার স্বাধীনতা। এদিক থেকে ব্রিটিশ প্রেস অর্থাৎ সংবাদপত্রেরা, সাধারণ পরিস্থিতিতে খুবই স্বাধীন। তারা মন্ত্রীদের শাসননীতি ও রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে সমালোচনা করতে পারে, বিদেশনীতির সূক্ষ্ম ব্যাপারে নাক গলাতে পারে, দেশের সংবিধান ধ্বংস করার ওকালতি করতে পারে, দেশ-বাসীর মনে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ জাগানোর চেষ্টা করতে পারে, দুর্নীতি উন্মোচিত করতে পারে, লোকের মনে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত করতে পারে,

---

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (1939-45) চলা কালীন এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল।

এবং সাধারণতঃ, মনের সুখে সরকারী কর্মচারীদের নাস্তানাবুদ করতে পারে। সময়ে সময়ে এরা সরকারকে, জনগণের ইচ্ছার নামে, তাদের আপন ইচ্ছা নিতেও বাধ্য করতে পারে।

এ সবই নিঃসন্দেহে ভালোই। কিন্তু মাঝে মাঝে এদের এই স্বাধীনতার ফলে সরকারী নীতি ও কাজকর্মে বিপজ্জনক দ্বিধা দুর্বলতা ও অসঙ্গতিও দেখা দিতে পারে; কিম্বা জরুরী কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপকে ব্যাহত করতে পারে। তবু সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, এদের এই স্বাধীনতা, আমাদের গণতন্ত্রের যা মুখ্য নীতি যে, রাষ্ট্র জনগণের প্রভু নয়, শুধু তাকেই সুরক্ষিত করে চলে।

সংবাদপত্রেরা, সামষ্টিকভাবে, এবং এই সঙ্কীর্ণ ও পারিভাষিক অর্থে, শান্তির সময়ের ব্রিটেনে যথেষ্টই স্বাধীনতা ভোগ ক'রে থাকে। এমন কোন রাজনৈতিক মতামত নেই যা এখানে উচ্চারিত হয় না। কিন্তু যদি আমরা অনুমান করি যে, প্রতিটি সংবাদপত্রই জনমতের মুক্ত রঙ্গমঞ্চরূপে সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করে, তা হলে কিন্তু খুব ভুল করা হবে। প্রত্যেক সংবাদপত্রই তাদের আপন আপন অধিকর্তাদের আজ্ঞাধীন; কাজেই যীশু যাদের 'নির্দয় ভৃত্য' বলে, আখ্যাত করেছেন,* তাদের মতোই এরা অধীনস্থ পাঠক সমাজের উপর অনুরূপ কড়া প্রভুত্ব চালিয়ে যায়। বললে ভুল হবে না যে, জনমতের স্বাধীনতার উপরে সরকারী সেন্সরশিপের নিয়ন্ত্রণ ততো জোরালো নয়, যতো প্রবল এই সংবাদপত্রসমূহের বেসরকারী সেন্সরশিপ। এদের কাজ জনমত প্রকাশ করা নয়, জনমত বানানো, উৎপাদন (manufacture) করা।

যে কোনো জনপ্রিয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় দুইটি প্রধান নিয়ামক দ্বারা। এর প্রথমটি হোল, বিজ্ঞাপন-দাতাদের স্বার্থ, যারা পত্রিকাটির বহুল প্রচারের খরচটা যোগায়। কোনো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রই এমন কোন সরকারী নীতির সমর্থন করবে না, করতে সাহস করবে না,—সে নীতি যতোই জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হোক না কেন—যদি তা সেই কাগজের বিজ্ঞাপন-দাতাদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধী হয়। যেমন ধরুন দুর্নামগ্রস্ত কোন সামগ্রীর (যথা ১৯৩৯-এর বৃটেনে মার্গেরিন) বিক্রী-নিয়ন্ত্রণের সরকারী প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করবে—এবং করবে খুব সমুচ্চ স্বাস্থ্য-নীতির দোহাই দিয়েই—সেই সব কাগজ, যারা এই দুর্নামী সামগ্রীর বিজ্ঞাপন

* দ্রঃ সেণ্ট ম্যাথুর সুসমাচার—xviii (23—34).

প্রচার করে থাকে। অপরদিকে কোনো সামগ্রী, তা যদি এই সব বহুল প্রচারিত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের খরচ যোগাতে স্বীকৃত না হয়, তাকে—অনুরূপ সমুচ্চ নৈতিক ও স্বাস্থ্যনৈতিক কারণেই—একেবারে ঘোরতর নিন্দিত ও ধিক্কৃত করে' বাজার থেকে বের করে দেওয়া হবে। যা এই সব বিজ্ঞাপন-চক্র থেকে বিযুক্ত, সেরূপ কোনো সামগ্রী এরা জনগণকে ব্যবহার করতেই দেবে না।

এটা অবশ্য বোঝা কঠিন নয় যে, পত্রিকার ক্ষেত্রে বহুল প্রচার মানেই দেউলে হবার ডাক, যদি তাকে কেবলমাত্র বিক্রীর উপরেই নির্ভর করতে হয়। প্রত্যেক সংবাদপত্রকে সর্বক্ষণ - এক বিপন্ন ভারসাম্য রেখে চলতে হয়—তাকে প্রচারসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হয়, তাদের বিজ্ঞাপনের হারের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য, আবার কাগজের প্রচার বাড়ানোর জন্য বিক্রয়মূল্য যথাসম্ভব কম রাখতে হয়। যদি সে-পত্রিকা বিজ্ঞাপন-প্রাপ্ত আয়ের তুলনায় বেশী সংখ্যায় বিক্রি হতে থাকে, তা হলে তো তাকে চরম আর্থিক সর্বনাশে পড়তে হবে। কাজেই যতো বেশী তার প্রচার ও প্রভাব, সেই পরিমাণে তাকে কায়েমী স্বার্থের বশবর্তী হয়ে চলতে হয়।

এর অর্থ হোল, সস্তা ও সর্বত্রগামী এবং প্রভাবশালী খবরের কাগজগুলো, অপেক্ষাকৃত দামী সাপ্তাহিক মাসিক ইত্যাদি পত্রিকার চেয়ে (যারা তাদের বিক্রী থেকেই তাদের বেশীর ভাগ খরচটা তোলে), অনেক কম স্বাধীন। কাজে কাজেই, স্বাধীন নিরপেক্ষ মতামত পাঠ করা, কেবল অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সাধ্য।

খবরের কাগজের আয়ের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হোল, পত্রিকা-মালিকের—ব্যক্তি বা কোম্পানী সে যেই হোক—বিত্তশালিতা। এবং এই হেতু, সেই মালিকের ব্যক্তিগত রাগ দ্বেষ শত্রুতা বা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পত্রিকাটির নীতি বহুল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক বড় খবরের কাগজের বড় কর্তা যদি সরকারী কোনো উচ্চ পদ বা সম্মানের অধিকারী হয়েও তা পেতে অকৃতার্থ হন, তা হলে এর ফলে তাঁর পরিচালিত ও ক্ষমতাধীন সব কটি কাগজে ঐ সরকারের বিরুদ্ধে হিংস্র জেহাদ ও বিষোদ্গার সুরু হয়ে যাবে। জনসাধারণ, ভিতরকার কারণটি না জানার ফলে, শুধু দেখবে যে, লণ্ডনের ও মফঃস্বলের অনেকগুলি কাগজ হঠাৎ সরকারের বিরুদ্ধে উগ্র আক্রমণ করে চলেছে। এবং যদি সে-পাঠক অসাধারণ বুদ্ধিমান বা সিনিক্যাল (Cynical) না হয়, বা অসাধারণ দৃঢ়চিত্ত স্বাধীনমনা ব্যক্তি না হয়, এরূপ ক্ষেত্রে সে (ও

তার ভোটটি) প্রভাবিত না হয়ে পারে না। কোনো সন্দেহই নেই যে সে-ব্যক্তি কখনো জানতেও পারবেও না যে, কেন, কী জাতীয় চাপ তার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছিল।

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর—যেহেতু সূক্ষ্মতর—হোল সেই নিয়ন্ত্রণ ও সেন্সরশিপ, যা সংবাদপত্র তাদের প্রচারিত সংবাদ ও মতামতের উপর নিজেরাই প্রয়োগ করে থাকে। তাদের এই নিয়ন্ত্রণের পিছনে, পাঠক সমাজ সম্পর্কে তাদের দুইটি ধারণা কাজ করে। এক, তাদের সত্য মিথ্যা চেনার ক্ষমতা বা বুদ্ধি নেই ; আর (দ্বিতীয়তঃ), খবর সত্য কিম্বা মিথ্যা যাই হোক, তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না ; তা শুধু মুখরোচক হলেই হোল। দুটো ধারণাই পাঠকসম্প্রদায় সম্পর্কে কোনো সমীহা প্রকাশ করে না। বলতে কি, ব্রিটিশ পাঠক সমাজ সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের কাছে লর্ড নর্থক্লিফের* উক্তি ; এবং জার্মান পাঠক সমাজ সম্পর্কে হিটলারের প্রকাশ্যে উচ্চারিত অভিমত, অনেকটাই একই প্রকার। উভয়েই একান্ত প্রত্যয়শীল যে, পাঠকদের সবকিছুই গেলানো যায়। ফলে, পুরনোপন্থী আত্মশাসিত সংবাদ-পত্রগুলির রিপোর্টিং-এর যাথাতথ্য নিয়ে যে গর্ব ছিল, এখন তার স্থলে এসেছে এমন রিপোর্টিং, যার খুব ভালো নমুনাও অযত্নবিন্যস্ত,—আর অপকৃষ্ট নমুনা তো একেবারে ডাঁহা উদ্দেশ্যমূলক লেখা।

আমি এখানে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করবো, যা থেকেই দেখা যাবে, কীভাবে তথ্য আর মতামত দুইই খবরের কাগজে যদৃচ্ছ বিকৃত করা হয় এবং ফলে, কাগজের সর্বত্র—রাজনৈতিক ঘটনার রিপোর্ট থেকে গালগল্পের কলম পর্যন্ত—একটা অবাস্তবতার ছাপ এসে পড়ে।

১। চমকপ্রদ শিরোনাম : খবরের মধ্যে মিথ্যা ঝোঁক দেওয়া : এই বছর (১৯৪০) 'ম্যালভার্ন' কনফারেন্সে আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি—তার বিষয় ছিল : চার্চের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ব্যাপৃতির পিছনে যে ধর্মনৈতিক প্রেরণা সচরাচর কাজ করে ; এবং সীজারতন্ত্র ও অতিধার্মিকতার বিপদ এবং এবং খৃষ্টের অবতারবাদের এক্ষেত্রে গুরুত্ব। এই আট হাজার শব্দ সমন্বিত প্রবন্ধে মাত্র আড়াইশোটি শব্দে আলোচিত হয়েছিল, সীজারতন্ত্র এবং অর্থসম্বন্ধীয় নৈতিকতার প্রতিতুলনায়, যৌন নৈতিকতার উপরে অতিরিক্ত

* লর্ড নর্থক্লিফ এককালে অনেকগুলি ব্রিটিশ সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন।

গুরুত্বদানের প্রসঙ্গ। কিন্তু এই অত্যন্ত গৌণ অনুচ্ছেদটির রিপোর্ট সমস্ত কাগজেই বেরোল, এবং তাও খুব চমকপ্রদ সব হেডলাইন সমন্বিত হয়ে! এমনভাবে প্রবন্ধটির রিপোর্ট প্রচারিত হোল, যেন এইটিই গোটা প্রবন্ধের মূল বিষয় বস্তু। আর, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, আমার ঐ আট হাজার শব্দ থেকে, রিপোর্টাররা একটিমাত্র শব্দ বেছে নিয়েছিল—তাদের পাঠকদের পক্ষে পরিচিত মনে করে'—এবং তা হোল 'fornication' (ব্যভিচার)! পাঠককুল নিশ্চয়ই তাদের সম্বন্ধে রিপোর্টারদের এই উচ্চধারণার খুব তারিফ করবেন। তবে আপনাদের সান্ত্বনার জন্য জানাই যে, এটা কিন্তু আপনাদের সব অতিপ্রিয় কাগজের রিপোর্টাররা করেনি। ঐ স্বেচ্ছাবিকৃত রিপোর্টের রচিয়তা হোল একটি সংবাদসংস্থা (News Agency)। পত্রিকা সম্পাদকদের বিরুদ্ধে আমার নালিশ শুধু এই জন্যে যে, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করেই খালাস হলেন। যেকোনো সভার ক্ষেত্রেই কিরূপ রিপোর্ট বেরোতে পারে, তার একটা আভাস এখানে দিলাম।

২। **ইচ্ছামতো ঝাড়াই বাছাই বর্জন ক'রে সংবাদ পরিবেশন :—** সংবাদপত্র থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে যারা আসে তাদেরই বিশেষ কৃতিত্ব এটা। আমার শেষতম নাটকের প্রযোজনাকালে আমাকে প্রশ্ন করা হয় —আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? তাতে আমি বলি যে, আমি আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা করিনা, তবে নভেল লেখার চেয়ে নাটক লিখতেই বেশী ভালবাসি। তবে যদি লেখার কোনো সুযোগ আসে—যেমন ক্যাণ্টারবেরী উৎসবের জন্য নাটক লেখার বরাত (Commission)—তখন আমি নিশ্চয়ই লিখব। আমার এই উত্তর সংবাদপত্রে যথাকালে বেরোলো। তবে এই রূপ গ্রহণ ক'রে—মিস সেয়ার্স বলেছেন, তিনি আর নাটক লিখবেন না, কোনো বরাত (Commission) না পেলে।

এধরণের নিরীহ বিকৃতিসাধন এবং তৎসহ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নিজের মন্তব্য সাক্ষাৎকার দাতার উপরে স্বাচ্ছন্দে চাপানোর অভ্যাস, সাক্ষাৎকার মাত্রেরই প্রতিবেদনের সত্যতা সন্দেহজনক করে তোলে। অবশ্য রিপোর্টারের সজীব কল্পনাকে কিছুটা স্বীকৃতি দিতে হবেই। আমার মনে আছে, কী একটা বলবার সময় আমার চোখ নাকি 'চশমার পেছনে ঝকঝক করছিল'—এটা খুব কৌতূহল নিয়ে পড়েছিলাম। যেহেতু সেই সাক্ষাৎকারটি যখন টেলিফোন মারফতই হয়েছিল, তখন রিপোর্টারের নিজের চোখ নিশ্চয়ই (পিকউটক পেপারের) Sam Weller এর ভাষায়, 'double magnifying

gas microscopes of extra power' হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রেস সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে চরম কথা বলেছেন 'Q' (স্যার আর্থার কুইলারকুচ) তাঁর From A Cornish Window গ্রন্থে। যারা খ্যাতিমানদের সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় তাঁদের উক্তি বলে যা কিছু বেরোয় সবই সত্যি বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা অতি অবশ্যই এই বইটি পড়বেন এবং সাবধান হবেন।

৩। **যাথাতথ্যহীন বিবরণ প্রকাশ :**

কিছুদিন আগে একটি কাগজে খবর বেরোয়, যে আমার ফ্ল্যাটে তার আগের দিন দরজা ভেঙ্গে চোর ঢুকেছিল এবং আমি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে তাদের দেখতে পাই এবং তারা পালিয়ে যায়। এ খবরটা মোটের উপর সত্য হলেও আগাগোড়া এর অনুপুঙ্খগুলি সবই ভুল। ঘটনার তারিখ কাগজে প্রকাশিত তারিখের তিনদিন আগের। আমি অক্সফোর্ডে যাইনি, গিয়েছিলাম King's Garden Party-তে এবং আমার ফ্ল্যাটে অনুপ্রবিষ্টদের কাজে ব্যাঘাত জন্মায়—আমি নই, সম্ভবতঃ খবরের কাগজ বিলি করা ছোকরাটি। এইসব ভুল বিবরণী দানের পেছনে সম্ভাব্য কারণগুলি কৌতূহলজনক। ঘটনার তারিখটা বদলাতে হোল, নইলে তিনদিনের বাসি খবর দিতে হয়। কাগজ বিলি করা ছোকরার বদলে আমাকে টেনে আনা হোল, খুব সম্ভবতঃ আমার 'স্নব-ভ্যালু' (Snob-value) বেশী হবার কারণে। তারিখটা বদলানো কিন্তু তাদের পক্ষে খুব ভুল হয়েছিল, কারণ, বাকিংহাম প্রাসাদের উল্লেখ থাকলে আরও জমাটি হতে পারতো।

৪। **ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিপরীত রূপে দেখানো :**

একবার ডাকনা না দিয়ে ঘরের আলো জ্বালানোর জন্যে (তখন যুদ্ধের ব্ল্যাক-আউট চলছে) কোর্ট থেকে আমার সমন হয়। কোর্টে আমার একটি চিঠি পঠিত হয়, যাতে আমি জানাই যে, আমার ভৃত্য ঠিক নিয়ম মতোই জানালার পর্দা টেনে দিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে দেখা যায় যে পর্দাগুলোতেই ত্রুটি ছিল। —স্থানীয় সংবাদপত্রে এর বিবরণ বেরোলো—'মিস সেয়ার্স বলেছেন যে তাঁর এক ভৃত্য পর্দা টেনে দিতেই ভুলে গিয়েছিল।' এটা আমার ভৃত্যের মনে খুব কষ্টের কারণ হয়। কিন্তু কার কী আসে যায় তাতে!

৫। **যদৃচ্ছ মিথ্যা বিবরণ :**

একবার আমায় কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করেই একটা ছোট গালগল্পের কাগজ (a gossip paper) সম্প্রতি তার পাঠকদের কাছে পরিবেশন করে

যে, আমার নাকি দুটি প্রিয় 'হবি' (hobby) আছে : বাগান করা আর বিড়াল পোষা। —আমি তো বুঝি না, আমার হবি কী, তা কেন কেউ জানতে চাইবে। কিন্তু যদি চায়ই, তবে যা যথার্থ সত্য, তা-ই লিখুক। এক্ষেত্রে ওদের আন্দাজি টিল একেবারেই উল্টো হয়েছিল। যদি আমি কোনো কিছু অপছন্দ করি তা বাগানের কাজ ; এবং যদিও একটা বিড়াল আমার বাসায় সব সময়েই থাকে, তবে তা থাকে রান্নাঘরে, ইঁদুর ধরার জন্যে। এক্ষেত্রে আমাকে কিছুই করতে হয় না, কেবল মাঝে মাঝে ওকে আর ওর লোমটোম চেয়ারের গদি থেকে সরিয়ে দিই। আর মাঝে মাঝে ওর জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দরজা খুলে দিই।

৬। মনগড়া অলৌকিকত্ব রটনা :

সম্প্রতি স্থানীয় কিছু কাগজে বেরোয় যে, একটা সভায় আমি নাকি সওয়া ঘণ্টার মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার শব্দের একটি ভাষণ পাঠ করি। —বাস্তবে এটা একটা অসম্ভব কাণ্ড। কোনো মতেই সম্ভবপর নয়। আসলে কিন্তু ঐ রিপোর্টার আমার ঐ ভাষণটির একটি কপিও পেয়েছিল এবং নিশ্চয়ই দেখেছিল যে তার শব্দসংখ্যা ছিল আট হাজার-এর মতো। কাজেই তার ইচ্ছাকৃত এই অতিরঞ্জন ছিল শতকরা দেড়শ' মাপের। এই শতকরা হিসেবটা ওদের 'সত্যভাষণে'র নিরিখ রূপে মনে রাখলে কাজ হবে।

৭। একেবারে সম্পূর্ণত চেপে যাওয়া :

আপনি এসব বিকৃতির প্রতিবাদ করে সম্পাদককে চিঠি দিলেন। সে চিঠি (ক) হয় তারা অগ্রাহ্য করবে। (খ) কিংবা সম্পূর্ণত বা অংশত ছাপবে, কিন্তু সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ, যে,—উনি যেরূপ বলছেন সেরূপই বলা হয়েছিল। কিন্তু লেখক কী করে আশা করতে পারেন যে, পত্রিকার সবটুকু মূল্যবান স্থান তিনি একাই দখল করবেন? (গ) কিংবা সম্পাদক পত্র-লেখককে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে ত্রুটি স্বীকার করতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হোল, তার অপনোদন হবে কী করে?

কেবল মফঃস্বলের ২।১টি কাগজেই ক্ষমা প্রার্থনা ও পূর্ণ সংশোধনী প্রকাশ করা হয়। এখানে সম্মানিত উল্লেখ করবো একটি চিঠির—'আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ, এটি আমরা আমাদের কর্তব্যজ্ঞানেই পত্রিকায় মুদ্রিত করলাম।...আমরা আমাদের সন্তুলিত (balanced) সংবাদ পরিবেশনার খ্যাতি বজায় রাখতে চেষ্টা করি।' এখানে তিনটি সেকেলে শব্দ ব্যবহৃত

হয়েছে : কর্তব্য, সন্তুলন, খ্যাতি। একথাগুলি আমাদের বড় কাগজগুলি থেকে কোনো পাঠক কি এখনো প্রত্যাশা বা দাবি করতে পারেন ?

বিভ্রান্তি উৎপাদক মন্তব্যের সংশোধন করানো মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, অনেক চিঠি লেখালেখি তো আছেই :—কারণ হয়তো ঐ 'মিথ্যাটি' রাতারাতি সারা পৃথিবীময় সিণ্ডিকেটেড (syndicated) হয়ে প্রচারিত হয়ে, হয়তো, কয়েক শ' কাগজেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া, কেউ বেশী হৈ-চৈ করলে, বা খবরের কাগজের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা' প্রচারের অভিযোগ তুললে, তার চোখের সামনে সুমস্থণ একটি ব্ল্যাক-মেইলের ছায়া দোলানো হবে। যে কোনো সাধারণ্যে পরিচিত ব্যক্তিকে—লেখক, বক্তা, অভিনেতা, রাজনীতিক—খুব সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সংবাদপত্রকে চটিয়ে দিলে তার ফল কিন্তু তাদের ভুগতে হবে।

খোলাখুলি ভাবে কোনো ভয় দেখানো হবে না ; তবে তার বই কিম্বা নাটকের হয়তো নিন্দা করা হবে, কিম্বা একেবারেই উল্লেখ করা হবে না। গালগল্পের পাতায় তাঁর সম্পর্কে বহু তাচ্ছিল্যকর উল্লেখ হয়তো মাঝে মাঝেই ঘটবে, এবং হাজার রকম ইঙ্গিত দেওয়া হবে যে, সংবাদপত্রেরা ইচ্ছে করলেই খ্যাতিমানদের খ্যাতি হরণ করতে পারে, আবার খ্যাতি তৈরীও করতে পারে। কাজে কাজেই, সংবাদপত্র জগতের সমালোচনাপূর্ণ দুঃসাহসিক গ্রন্থাদি খুব কমই বেরিয়ে থাকে। এবং একটিও সততাসম্পন্ন কাগজ সহজে পাবেন না, যাতে এ বিষয়ে কিছু লেখাও যায়।

অবশ্য বক্তৃতা দেওয়া যায় এবিষয়ে,—কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজের কাছে তা পৌছবেই না ; কারণ কোনো সংবাদপত্রই তা পুরোপুরি ছাপবে না। হয়তো এক আধটা কাগজে বেরোবে, এইরকম শিরোনাম দিয়ে : 'অমুক বিশপ সংবাদপত্রের মুখে লাগাম পরাতে চান' ; কিম্বা 'পার্লামেন্টের সদস্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে।' কোনো সন্দেহ নেই যে, এদের এইসব দায়িত্বহীন আবোল-তাবোল আর মিথ্যা-প্রকাশের সামান্য বিরোধিতা করলেই একেবারে সমস্বরে চীৎকার উঠবে : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন !! একটুও অবাক হবার কারণ নেই যে, সম্প্রতি তিন দিনের মধ্যে, ইয়র্কের আর্চবিশপ ও ও একজন সরকারী মন্ত্রী একইপ্রকার হতাশ-করুণ বিলাপ করলেন, সাংবাদিক অনৃতভাষণ ও দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে, যে, সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

আমার নিজের ক্ষেত্রে যেসব ঘটনার দৃষ্টান্ত আমি দিলাম, আপনারা হয়তো বলবেন যে, ওগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তা আমি অস্বীকার করবো না; কিন্তু সে কারণেই তো তাদের ঐ বিশেষ লক্ষণগুলির উদ্বেগজনকতা সুস্পষ্ট। এখানে প্রত্যক্ষত কোনো উদ্দেশ্যমূলকভাবে তথ্যের বিকৃতিসাধন যে করা হয়েছিল তা নয়। সেরকম চেষ্টা পাঠককে অনেক সময় সজাগ করে দেয়, পাঠক মিথ্যার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করে। এগুলি থেকে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হোল,—এক অতি ব্যাপক সত্যনিষ্ঠার অভাব, যা কাগজের প্রতি কলমে, প্রতি তুচ্ছ খবরের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়ে, তথ্য ও কল্পনার মধ্যেকার সীমারেখাকে অবলুপ্ত করে দিচ্ছে; এবং ফলে সর্বত্র মূল্যহীনতা ও অবিশ্বাসের জন্ম হচ্ছে।

যে ছোটখাটো ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ নয়, সে বড় ব্যাপারেও তদ্রূপ হবে। যদি একটি সাধারণ কোর্ট-কেসের বিবরণ সঠিক পরিবেশিত না হয়, তবে বৃহৎ জগতের বড় খবরের সত্যতায়ই বা কী ক'রে নির্ভর করবো? যদি একজন সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারী সাংবাদিক একজন বহুলপরিচিত ঔপন্যাসিককে অযথাবৎ উপস্থাপিত করে,—তা হলে যে-না-দেখা বিদেশী কূটনীতিককে আমরা জানি না, শুনিনা, তার ক্ষেত্রে সে যে কী করে, কে বলবে? যদি মিথ্যা ঝোঁক দেওয়া, ঘটনার ইচ্ছে মতো ঝাড়াই বাছাই সাজানো, যাথাতথ্যহীনতা, ঘটনার উলটো বিবরণ দান, মনগড়া মিথ্যা রচনা, পুরোপুরি সত্যকে চেপে যাওয়া প্রভৃতি অন্যায়, খবরেরকাগজরা এমন সব ক্ষেত্রেও করে বলে' সাব্যস্ত হয়, যেক্ষেত্রে কারো স্বার্থই জড়িত নেই—তা হলে যেখানে কায়েমী স্বার্থ খুব নিবিড়ভাবে জড়িত, সেখানে তারা যে কী করে তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। এবং সর্বোপরি তাদের ঐ যে প্রত্যয় যে, পাঠকসমাজ এতই নির্বোধ আর লঘুচিত্ত যে এই সব বিকৃতিসাধনে কেউ তারা ক্ষুণ্ন হয় না—এর তাৎপর্যটা ভাববার মতো নয় কি?

যাঁরা ভদ্র সাংবাদিক তাঁরা কিন্তু বর্তমানের এই অবস্থাটা মোটেই পছন্দ করেন না। অপেক্ষাকৃত দায়িত্বশীল সম্পাদকরাও করেন না। কিন্তু যেসব সম্পাদক ও সাংবাদিক, কর্তব্যবোধ, সন্তুলিত (balanced) সংবাদ, সুনাম ও সাংবাদিকতার উচ্চমান বজায় রাখতে চেষ্টা করেন, তাঁদের সংখ্যা প্রতিদিন এই চাপের মুখে ক্রমেই কমে আসছে। আজকের কোনো সংবাদপত্র যদি আজকের দিনে, অনুত্তেজিত চিত্তে, শুধু সত্য সংবাদ পরিবেশনে ব্রতী হয়, তা হলে তার প্রচার সংখ্যা ঠিক রাখা কঠিন হবে। মনে হয় এটাই সত্যি যে, সব দেশই তার যোগ্যতামাফিক সংবাদপত্রই পেয়ে থাকে।

কিন্তু মনে করুন, যদি এমন পাঠক থাকে যে সংবাদের যাথাতথ্যকে যথোচিত মূল্য দেয় এবং তার বুদ্ধির প্রতি সাংবাদিকদের অবজ্ঞায় সে ক্রুদ্ধ হয়, যা ঘটেছে ও যা উক্ত হয়েছে তাই সে সঠিক জানতে চায়—তা হলে সে কী করবে? সে কী ভাবে ও কোথায় সেই সত্য তথ্য আবিষ্কার করবে, যা তাকে দেওয়া হচ্ছে না? বা যাকে এই পর্বতপ্রমাণ বিকৃতির ও অবাস্তব রচনার তলায় চাপা দিয়ে থেঁতলে মারা হয়েছে? কী ভাবে সে তার দৃঢ় ইচ্ছাকে ব্যক্ত করবে, প্রভাবশীল করবে? সে কি ক্রুদ্ধ চিঠিপত্র লিখে চলবে, কিম্বা এ কাগজ না কিনে ও কাগজ কিনবে? কেউ কি তার সেরূপ করার তোয়াক্কা করবে? করবে, যদি সে যথেষ্ট বেশী কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সেই প্রতিবাদ উচ্চারিত করতে পারে। কিন্তু তার একলার দেওয়া কাগজের দামটার কতটুকু মূল্য ঐসব কায়েমী স্বার্থের কাছে? ঐসব বিরাট বিরাট সংবাদপত্র গোষ্ঠীর কাছে? স্বাধীনতা শুধু সংবাদপত্ররাই ভোগ ক'রে থাকে। পাঠকদের কোনো স্বাধীনতা নেই।

অবশ্য সাধারণ, মানুষের, পার্লামেণ্টের নির্বাচনে একটা ভোট আছে। পার্লামেণ্টে তার একজন প্রতিভূও আছে, যাকে সে উত্যক্ত করতে পারে, প্রশ্নবাণে জর্জর করতে পারে, এবং যে-ব্যক্তির পার্লামেণ্টে থাকা না থাকা তার ইচ্ছার উপরেই নির্ভরশীল। যদি সে গণতান্ত্রিক পন্থার ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়, তবে সে পার্লামেণ্টে কিছু প্রশ্নও উত্থাপিত করতে পারে। শেষ-মেশ এও না হয় মেনে নেওয়া গেল যে, সে এক সরকার পালটিয়ে অন্যদলীয় সরকারও গঠন করালো। কিন্তু যে প্রক্রিয়া দ্বারা জনমত রচনা করা যায়, গঠন করা যায়, সেই organ গুলি তো সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তার ক্ষমতার সীমা তো ঐ একটি কাগজের দাম দেওয়া বা না-দেওয়া, এবং তার নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেক ইচ্ছাশক্তি পর্যন্তই। রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের সময় খবরের কাগজই সকলের আগে চেঁচায়—জনগণকে সব তথ্য জানতে দাও! জানিনা—তথ্য হয়তো এমন এক দেবতা, যাকে লোকে কেবল সঙ্কটকালেই ডাকে, যখন অন্য সব সুপ্ত দেবতারা অদৃশ্য হয়ে যান।

বিস্ফোরণ

এ মাস্লাক

চায়ের টেবিলে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটায় সন্তু। বয়স আট। তৃতীয়শ্রেণীর ছাত্র। বুদ্ধিমান। বরাবর মূল্যায়নের তালিকায় 'ক' এর মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট থেকে দুধের কাপ সরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, তুমি মাইনে পাও কত ?

বয়সের তুলনায় প্রশ্ন বড় ভারী, বিজ্ঞের মত আমার মুখ পানে চেয়ে থাকে সে। আমার বুকের ভিতর ক্ষণিকের ভূমিকম্প ঘটে যায়। এমন প্রশ্ন সন্তুর পক্ষে বেমানান। আমি বুঝতে পারি না—সন্তুর এটা নিছক কৌতূহল, না অন্য কিছু···।

আমি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি, মাইনে ১৩৬০।৭০ পয়সা। সব কেটে কুটে হাতে আসে ১২শ ১৭ টাকা ৫০ পয়সা।

জবাবে বাধা নেই, কিন্তু আকস্মিক প্রশ্নবাণে আমার কিন্তু তীরবিদ্ধ পাখীর মতই অবস্থা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে, চায়ের কাপ ঠোঁটে ঠেকাতে ভুলে যাই।

সন্তুর মা যেন বিপদের কাণ্ডারী। রক্ষা করল আমাকে।—হঠাৎ তোর বাবার মাইনের কথা জানতে চাইছিস্ কেন ? আমরা কি তোর কোনো অভাব রেখেছি ?

দুধের তলানিটুকু সড়াক করে টেনে নিয়ে হাল্কা হাসি হেসে উঠে সন্তু—অভাব ! সে আবার কি মা ? তুমি যে বলটা কিনে দিয়েছ, সেটা সবার সেরা। পল্টু সুবীর, চপল সবাই আমার বল পছন্দ করে।

সন্তুর মায়ের চোখে মুখে গর্বের হাসি ;

কিন্তু আমি ভীত হয়ে পড়ছি কেন ?

পুনঃরায় সন্তু কণ্ঠে উল্লাস ঝরায়—আমাদের টি-ভিতে এত ভাল ছবি আসে না ? আমার বন্ধুদের টি-ভিতে যেন মেঘ লেগেই আছে, স্পষ্ট ছবিই আসে না !

খেইহারা অর্থহীন স্রোতের মত বলে গেল, অজস্র কথা। সবই দুর্বোধ্য মুখের মত। শুনতে খারাপ লাগেনি। কখনো কখনো সন্তুর মা-জবাব দিয়েছে ২।১টি প্রশ্নের। —আমাদের টি-ভি অরিজিন্যাল সোনি। বুকটা স্ফীত হয়ে উঠেছে অহঙ্কারে।

কিন্তু আমি চুপসে যাচ্ছি। গুটিয়ে নিচ্ছি নিজেকে। আমি জানি, সন্তু বরাবর কৌতূহলী, শেষ পর্যন্ত সে যদি অনিসক্কিৎসু হয়ে উঠে, তাহলেই সর্বনাশ।

ছেলেমেয়েরা প্রথম পর্যায়ে বাবা মায়ের অনুকরণ প্রিয় হয়। কোন পথে পা দিয়েছি আমি? এ পথে সুখ নেই, শান্তি নেই, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ শুরু করলে, সামনে বিশাল খাদ। মৃত্যু অনিবার্য্য। ভাবনায় আমার কপালে কুঞ্চনরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সন্তুর মা কণা উচ্ছ্বাস ছড়ায় কণ্ঠে,—তোর বাবা না বাজারেও সেরা জিনিষটিই কিনবে!

সন্তু আমাদের একমাত্র ছেলে। অতি আদরের প্রলেপ ওর সর্বাঙ্গে। সে বলল—জানো বাবা! আমাদের গুরুপদ স্যার, কথায় কথায় বললেন, আমাদের দেশটা উচ্ছন্নে গেছে।

—কেন? কণার ভ্রূ কুঁচকে উঠে।

সন্তু আবার মাকে ছেড়ে আমাকে ধরে—বলোনা বাবা, তোমার মাইনে কত?

আমার ভিতরটা ঝটপটিয়ে উঠল, কাটা মুরগীর মত। আতঙ্কে গলা বুজে আসে। কণা সামাল দেয় ব্যাপারটা,—বাবার মাইনে জেনে কি করবি?

সব শিশুর, সব কিছু জানার নয়। বিশেষ করে' শিশুদের বড়দের ব্যাপারে মাথা গলানোর আমি তীব্র বিরোধী। সন্তুর গোয়েন্দার মতো কথাবার্তা খারাপ লাগছে। তবু আমি নীরব।

কণা নিশ্চয় বুঝতে পারছে আমার মনের অবস্থা।

সন্তু আপন খেয়ালে পা ফেলছে। কোন কিছুতেই গ্রাহ্য নেই। সে সহজ কণ্ঠে বলল—গুরুপদ স্যার বলেন, অনেকের মাইনে ১২।১৩ শোও নয়; এ টাকাতে সংসার চালানোই মুশকিল, দুবেলা দুমুটো ভাতেরই টানাটানি হওয়ার কথা, তাদের তিনতলা বাড়ী, টি-ভি, ফ্রীজ, আলমারি হয় কি করে? সব ঘুষ, ঘুষের টাকা বুঝলি, এরাই তো দেশটাকে শুষছে···

—তোদের স্কুলের গুরুপদ স্যার খুব ভাল মানুষ। খুব ভাল কথা বলেছেন। সব দিক সামাল দেয় কণা, চুল পড়া বৃদ্ধ মাষ্টার তো? প্রশ্ন করে' হেসে ওঠে কণা।

—হ্যাঁ, তিনি আরও বলেন···

গুরুপদ স্যার আর কি বলেছেন, শুনবার সাহস নেই কণার, এবং আবার

কণা তাড়া দেয়—সন্তু, এবার ওঠো, স্যার আসবেন। এক প্রকার ঠেলেই পাঠিয়ে দেয় সন্তুকে পড়ার ঘরে।

আমি বসেই থাকি। কারণ আমি এখনও দুশ্চিন্তামুক্ত নই। সন্তুকে গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছে? সন্তু কি আমার-ই ডিমে তা-দেওয়া···মানে আমারই স্নেহে লালিত পালিত—একটা ইস্পাতের ফলা।

আমার অস্বস্তিকর যন্ত্রণার পুরোটা কি কণা বুঝতে পারছে?

পুলিশ কোর্টের ম্যাজিক খেলার কসরত নিয়ে কণা কোনদিন প্রশ্ন তোলেনি। মার্ডার কেসের ১৭ জন আসামীর ভিতর থেকে একজনের নাম উড়িয়ে দেবার মূল্য ১০,০০০ হাজার টাকা, সে টাকা দেখেও কণা চমকায়নি। আসলে কণা বড় ভাল মেয়ে। তাছাড়া স্বামীর উপর তার গভীর বিশ্বাস। সব উপরি রোজগারের উপর আমার ন্যায্য অধিকারের ষ্ট্যাম্প আছে বলে' তার বিশ্বাস। পুলিশ কোর্টের কেরানির তো এসব উপরি পাওনা থাকবেই। তাছাড়া স্বামীপুত্র ঘরসংসার, ধনদৌলৎ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তো সব মেয়েরই কাম্য।

অফিস থেকে ঘরে ফিরে টাকাগুলো তুলে দিয়েছি—কণার হাতে। কণার বিশ্বাস, যারা যোগ্য মানুষ, তাদের হাতে এরকম টাকা আসবেই। তাই টাকা নিয়ে তার কোন কৌতূহল নেই, অনুসন্ধিৎসাও নেই।

কণার বাবা ফুডে চাকরি করতেন। খালি হাতে ঘরে ফেরার জন্যে মায়ের সঙ্গে নিত্যকলহ স্বকর্ণে শুনেছে সে। বাবা সৎ মানুষ ছিলেন। মা পীড়া দিয়েছে বাবাকে,—তোমার সঙ্গীসাথীরা ঘরবাড়ী করে নিল, আর তুমি ভাড়ার ঘরেই পড়ে রইলে!

—ওরা কি করে ঘরবাড়ী করছে, তাতো তুমি জানো। ওরা চোর।

—কণার মা চীৎকার করে উঠতো—আর তুমি সাধু! নিজের রোজগারের মুরোদ নেই, অপরকে গালাগালি দাও কেন?

কণা খুব আত্মতুষ্ট; ওর বাবার মত আমি অপদার্থ নয়।

কণা ঘরের কাজকর্ম ফেলে বাজার করার জন্যে তাড়া দিতে এসে অবাক,—আমি বিমর্ষ হয়ে তখনও বসে আছি। চায়ের কাপে মাছি সাঁতার কাটছে!

কিগো, তুমি এখনও বসে আছ! বাজার-হাট যাবে না? তারপর চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বলল, মাছি পড়ে গেছে যে! একটু অপেক্ষা করো, এখুনি আবার চা আনছি···। কণা বেরিয়ে গেল। সেইসঙ্গে তাড়াও দিয়ে গেল—ঠোঁটগুলো থেও কিন্তু।

আমি আত্মসমর্পণের আশ্রয় খুঁজতে শুরু করি। আজকাল কোন্ শালা, অন্যায় করে না! কত বামুনঠাকুর, পাদ্রী নামাজীকে দেখলাম,—সবটাই বাইরের পোশাক, ভিতরে ভিতরে সবাই সমান, লোভের ঘেরাটোপে—সকলেরই বসতি।

বুকের ভিতরে চেপে বসে থাকা বদরক্ত টেনে বের করে' বুকটা হাল্কা করি। টোষ্টের প্লেটে হাত দিতেই, একটা অসহায় মানুষের ম্লান মুখ ভেসে উঠে, তার ওপর। একটা দরিদ্র পরিবারের চিত্র—দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও একটা বাড়তি পরনের কাপড় জোটাতে পারেনি।

আমরা পাঁচ ভাইবোন। শুধু আমার সন্ধানেই চারবোনের আগমন, সর্বকনিষ্ঠ আমি। বাবা ছিলেন খেটে খাওয়া মানুষ। গোটা পরিবারটাই ছিল—অর্ধাহার আর অনাহারের এক করুণ চিত্র।

মাধ্যমিক পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বিদায় নিলেন, গোটা পরিবারের দায়িত্বভার আমার কাঁধে তুলে দিয়ে। বড়কাকার উপর কিছুটা ভরসা ছিল। ছোট সংসার। রোজগারও মন্দ করতেন না। তিনিও পৃথক করে দিলেন আমাদের—এই সঙ্কট মুহূর্তে।

আমার চাকরিটা জুটেছিল চোরাপথে। বাবা দুই দিদির বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারাই গা থেকে দু'টি গহনা খুলে, ভাইবোনদের বাঁচার রাস্তা তৈরি করে দিল। মোট কথা, চাকরিটা ক্রয় করতে হল। সে টাকা আমি পরিশোধ করেছি। বাকি দিদিদের ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি। বাড়ীটা দোতলা করেছি। আমার হাতে এখন টাকার স্রোত……

গরম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কণা ফিরে এসে পাশে বসল বেশ ঘন হয়ে। এবার আড়ালের পর্দা উত্তোলন করল ধীরে ধীরে। হ্যাঁ গো, ছেলেটার কথায়, তুমি এত আনমনা হয়ে যাচ্ছ কেন? ম্লান হাসি বিচ্ছুরিত হল কণার ঠোঁটে। ও ছেলেমানুষ! ও কি এত ভেবে চিন্তে কথা বলছে মনে কর?

জানি, খেলনার টিল মাথায় লেগেছে, ব্যাপারটাতো ঠিক তাই…… নীট ১৩শ টাকা মাইনে যার, এক লাখ টাকা মূল্যের বাড়ী তৈরি তার পক্ষে সম্ভব নয়। কথাটা খুব আস্তে আস্তে বলল কণা, যেন দেওয়ালের ঐ পাশে শত্রু-পক্ষের চর আড়ি পেতে বসে আছে!

রীতিমত সন্তুর সামনে আসতে ভয় হচ্ছে আমার, নিজেকে আড়ালে রাখি। রাতের খাবার এক সঙ্গে খাই আমরা। কণা খাবার জন্যে ডাক দিতেই ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করি—সন্তুর খাওয়া হয়েছে?

আমার কথায় ক্ষিপ্ত হয় কণা। সে কিগো! তোমরা তো এক সঙ্গে খাবে। অহেতুক কাজের চাপ দেখিয়ে বলি—সন্তুকে খাইয়ে দাও আগে।

—তার মানে?

—একটু দেরী হবে।

—কি হচ্ছে কি? ছেলেটা ভাতের থালার সামনে বসে আছে, তুমি না এলে ও খাবে না।

—সন্তুকে বলবে, আমি কাজে ব্যস্ত আছি।

—আঃ! ওঠো তো! রীতিমতো ধমক লাগায়—কণা।

—আমি খেতে বসে সহজ হবার চেষ্টা করেও পারিনে।

কণা সহজ হবার চেষ্টা করে। ছোট ছোট প্রশ্ন করে' বিব্রত রাখতে চায় ছেলেকে—সন্তু আজ স্কুলে সব পড়া পেরেছিলিস তো?

—ভাত খাওয়া বন্ধ করে, পরম উৎসাহে সন্তু শুরু করে,—জানো মা, আজ গুরুপদ স্যার বললেন, বড় হতে হলে শুধু বই পড়লেই হয় না। পৃথিবীর সব কিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

কথাটা বলে,' সন্তু আমার মুখের প্রতি চাইল, চেয়েই রইল কয়েক সেকেণ্ড। দৃষ্টিটা অকারণেই ভয়ঙ্কর মনে হল, বুকের ভিতর একটা সন্ত্রাসের শিহড় গজিয়ে উঠল। ভাতের মাঝে হাতটা যেন পোঁতা হয়ে গেছে, সে আর যেন মুখের কাছে উঠে আসতে চায় না। সন্তু বলল—বাবা, চুপটি করে বসে আছো কেন? ভাত খাও! আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করি। ভাত নিয়ে নাড়া চাড়া করতে থাকি। সন্তুকে নতুন দৃষ্টিতে দেখি, কে বলে গোবরে পদ্মফুল ফোটে না? আমার ছেলেকে আমিই চিনতে পারিনি—এতদিন। আমার রক্তে যার জন্ম, তার সঙ্গে আমার কত পার্থক্য, চিন্তা ভাবনা রুচিতে! যাকে বলে দুই মেরুতে দুই জনের বাস।

ভাত খেতে শুরু করি।

একটা অহেতুক ভয়, মনের ভিতরে খোঁচা মারে।

কিসের ভয়?

নিজেকেই প্রশ্ন করি।

নিজের বিবেকের কাছে মানুষ কতক্ষণ নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে? অপরাধবোধের কাঁটা বুকের ভিতর খচ খচ করে বিঁধতেই থাকে। রাতে সন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে যখন, কণাকে ফিস্ ফিস্ করে বললাম, আচ্ছা কণা, একটা কাজ করলে হয় না?

—কি কাজ !

—সন্তুকে হষ্টেলে যদি রেখে দি ?

—সে কি গো। শূন্য ঘরে আমি থাকবো কি করে ?

—ওকে আমার ভয় করে।

—ভয়ের কাজ না করলেই পারো ! একটাই তো ছেলে, কি দরকার এত লোভের।

মনকে শক্ত করলাম। সকালেই খোস মেজাজে চায়ের টেবিলে বসে গল্প করলাম।

সন্তু বলল—গুরুপদবাবু বলেন, পরিশ্রমের বিকল্প নেই। ঘরে বসে থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না, ঘুমালেও চলবে না, মানুষকে সৎ হতে হবে।

—নিশ্চয়ই সৎ হতে হবে বৈকি বাবা, তুমি অনেক বড় হবে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে সন্তু—আচ্ছা, আমাদের বাড়ীটা তৈরি করতে কত খরচ হয়েছিল ?

—এসব জেনে তোর কি লাভ ?

—গুরুপদ স্যার জিজ্ঞাসা করছিলেন।

—গুরুপদবাবু খুব ভাল মানুষ। আমি নিজে গিয়ে দেখা করে সব বলে আসবো। তুমি এবার পড়তে বসবে। ওঠো।

—সন্তু উঠে গেল চায়ের টেবিল থেকে।

কিন্তু এক রাশ রক্ত দোল খেতে লাগল, বুকের ভিতর—বাড়ী তৈরির খরচ কত ? এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। সব টাকাই হু নম্বরী।

—কণা বলল, তুতি এত কী ভাবছ বলতো ?

—গুরুপদ স্যারের কথা।

—তুমি বরং ওর স্কুলটা বদলে দাও !

—না। সন্তু ঐ স্কুলেই পড়বে।

—তাহলে তোমার ভাবনা ঘুচবে না কোনো দিন।

—আমি এবার ভাবনা থেকেই মুক্ত হতে চাই,…তাই নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি।

—ভাবছি সন্তুকে গুরুপদবাবুর হাতেই পুরোটা ছেড়ে দেবো ! স-উল্লাসে, কণা আমাকে জড়িয়ে ধরল। কণা যে ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা নিয়ে এতখানি ঘেমে উঠেছিল তা ভাবতে পারিনি।

শিশু-শিক্ষা অথবা শিশুমেধ ?

প্রবাহন সমাদ্দার

আজকাল কলকাতা শহরে একটা জিনিষ খুব চোখে পড়ে। মায়েরা শিশুপুত্র বা কন্যাকে প্রভাতী বিদ্যালয় শেষে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের হাতে ছেলেমেয়েদের বই খাতার বাক্সো, জলের বোতল। বাসে উঠে তাঁরা শিশু পুত্রকন্যাদের সঙ্গে তাদের পড়াশুনার বিষয়েই আলাপ করে চলেছেন। কোন্-প্রশ্নের কী উত্তর তারা দিয়েছে, ভুল উত্তর কেন দিল, কেন তারা সঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ ভুলে গেল, কেন তারা কম নম্বর পেল, কেন কেন··· ? এমনি নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্নবাণে সেই কোরকগুলিকে জর্জরিত, বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন করে' নিজেদের চিত্তের সন্তাপ তাদের সুকুমার চিত্তে সঞ্চারিত করে', অহর্নিশ পড়াশুনায় অতিপ্রাগ্রসর ও সর্বাগ্রগণ্য থাকার অভীপ্সায় তাদের তাড়িত করে', এই সব শুভাকাঙ্ক্ষিণী তাঁদের শিশু সন্তানদের যথার্থ হিত কিম্বা অহিত করছেন, তা খতিয়ে দেখেন না। গতানুগতিক ভাবে তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবেন যে, শিশু পুত্রকন্যাগণ শৈশবেই যাতে বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়ে ওঠে তা দেখাই তো তাঁদের কর্তব্য। কারণ পয়লা নম্বর না হতে পারলে, এই ঘোর কম্পিটিশনের বাজারে, পরে তাদের ভালো মাইনের চাকরি বাকরি হবে কী করে ? সন্তানদের ভবিষ্যৎ সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্যই তাঁদের এই নিরন্তর উদ্বেগ ও ব্যাকুল ছটফটানি।

আজকালকার মায়েদের এই অতিসংব্যাকুল শিক্ষামনস্কতার ভাবটি কিন্তু নতুন। আমাদের বাল্যকালে এটা দেখিনি। ছেলে মেয়েদের হাতে-খড়ি ও পাততাড়ি বগলে তাদের পাঠশালায় যাওয়া আসা পর্যন্ত মায়েরা যদিবা কিছুটা মনোযোগ দিতেন, তাদের পরবর্তী স্কুলের পড়াশুনায় তদারকি ছিল বাড়ীর পুরুষ মহলের। কিন্তু কেউ এইভাবে, আধুনিক মায়েদের মতো, দিবা-রাত্রি খিট্ খিট্ করে' চলা, পাঠ্য বিষয়কেই শিশুদের একমাত্র অধ্যেয় বলে' শেখানো এবং তারই মধ্যে তাদের সমগ্র চিত্তকে নিবদ্ধ রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা,—এটা কেউই করতো বলে মনে পড়ে না। ফলে আমদের কাছে শৈশব-কালের স্মৃতি বেশ মধুর হয়েই আছে। সুপ্রচুর খেলাধূলা, ঠাকুমা দিদিমার আদর আর গল্পশোনা, আর সেই সঙ্গে একটু আধটু পাততাড়িতে মনোনিবেশ, এই ছিল আমাদের শৈশবের পরিমণ্ডল। লেখাপড়াটা আর

সব কিছুকে ছাপিয়ে, শিশুমনের সকল সহজ সরল আনন্দ হরণ করে' একেবারে সর্বত্রাস স্বৈরশাশক হয়ে উঠেছে, এ দুঃস্বপ্নের অপচ্ছায়া আমাদের শৈশবের ত্রিসীমানায় কোথাও ছিল না। কারো ক্ষেত্রেও যে ছিল, এও শুনিনি। কিন্তু এখন এটাই প্রায় নিয়ম হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে', নামী দামী স্কুলের ভাগ্যবান (?) ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে,—যাদের পিতা-মাতাকে অনেক অর্থব্যয়ে, অনেক দুশ্চিন্তা ও অনেক তপস্যায় ছেলেমেয়েদের জন্যে এইসব শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান সংগ্রহ করতে হয়েছে—তাদের ক্ষেত্রে—মায়েদের সেই সুতীক্ষ্ণ অধ্যবসায়ের চেতনা সন্তানদের এক মুহূর্তও ভুলতে দেয়না যে, তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হোল, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সকলের উপর টেক্কা দেওয়া। বাপমায়েরা তাঁদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের মূল্য স্বরূপে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সাফল্য দাবী করেন। শুধু দাবী করেন নয়, তা আদায়ের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা পেছনে লেগে থাকেন। পিতামাতা তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিশু সন্তানদের উপর আরোপ করে' সেই লক্ষ্য অনুযায়ী ছেলে-মেয়েদের পঠনপাঠন, ও বুদ্ধিবৃত্তি, এমন কি গোটা জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত করতে চান। এরই অতি আগ্রহে তাঁরা ওদেরকে একটু স্থির থাকতে দেন না, একটু স্বাভাবিক খেলাধুলায় মেতে উঠতে দেন না,—নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাদের লেখাপড়া নিয়ে কেবলই তাদের খোঁচাতে থাকেন, আর যথাসাধ্য বই খাতার মধ্যেই তাদের বন্দী করে রাখতে চেষ্টা করেন।

এই খোঁচানোর আতিশয্য, লেখাপড়ার ঘোড়দৌড়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাবার জন্য তাদের তাড়না করা, ছেলেমেয়েদের পক্ষে কখনোই কল্যাণের হতে পারেনা। একটি চারা গাছের কতোটা বৃদ্ধি হোল তা দেখবার অতি আগ্রহে কেউ যদি তার শেকড়গুলি কেবলি খোঁচায়, আর শাখা পত্র পল্লবের বৃদ্ধির কেবলই পরিমাপ করে চলে, কিম্বা কেবলই গোড়ায় জল ঢালে, তাতে কি চারাগাছের স্বাস্থ্যের খুব বেশী উন্নতি হবে বা বৃদ্ধির বেশী সম্ভাবনা ঘটবে ? গাছটিকে বেড়ে উঠবার জন্য কোনো তাড়না না করলেই সে উদ্দেশ্য বরং অধিকতর সুসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। চারাটিকে মাটি জল আলোর সহজ পরিবেশে আপন স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে উঠতে দিলেই সকলের পক্ষে কল্যাণ। সে আপন স্বভাবনিহিত শক্তিতেই বেড়ে উঠবে, কারণ বেড়ে ওঠাই, একটি সুপরিণত বৃক্ষ হয়ে ওঠাই তার ধর্ম। বেশী সার প্রয়োগের অতি-উত্তেজনা জোগালে তার বৃদ্ধিতে সামঞ্জস্য থাকবে না : একদিকে হয়তো অতিবৃদ্ধি ঘটবে, আর একদিক দুর্বল থেকে যাবে। শিশুদের ক্ষেত্রেও অতি তাড়না,

এবং মস্তিষ্কের অতি চালনা, তাদের সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। গাছের বৃদ্ধি যেমন কেবল তার দৈর্ঘ্যের মাপের অঙ্কে নয় ; তার সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস পরিণতিতে এবং ফুলে ফলে ভরে ওঠার সার্থকতায় ; তেমনি একটি শিশুও কেবল মস্তিষ্ক মাত্র নয়, সে তার দেহ মনের নানা প্রবৃত্তি ও প্রবণতা এবং স্নেহপ্রীতি প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিও বটে, এবং কল্পনাশক্তি, ভালোমন্দবোধ ও ইচ্ছাশক্তিও বটে। পরিণামে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর, সৃষ্টিশীল, আনন্দময় ও কল্যাণময় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তার মধ্যে নিহিত হয়ে আছে। একদিকে অতিচালনা ও অতি তাড়নার ফলে, তার বিকাশ একপেশে হয়ে উঠতে পারে। ওঠাই সম্ভব। দেহ মন আত্মার সুষম বিকাশই আকাঙ্ক্ষিত। পরিপূর্ণ মানব বলতে সেইরূপ সর্বাঙ্গ বিকশিত ব্যক্তিত্বই বোঝায়। এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি পরিপূর্ণ মানবতার বিকাশ সাধন হয়—এবং এ ছাড়া অন্য কিছু শিক্ষার উদ্দিষ্ট হওয়া উচিতও নয়—তা হলে একপেশে ব্যক্তিত্ব যে শিক্ষার ব্যর্থতাই সূচিত করে, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিশুর বিকাশের অনুষঙ্গে চারাগাছের বৃদ্ধির উপমা ও দৃষ্টান্তটি আমি ভেবে চিন্তেই ব্যবহার করেছি। এ উপমাটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্, শিক্ষাভাবুক ও শিক্ষাদার্শনিকদের। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো থেকে সুরু করে আধুনিককালের সকল শিক্ষাভাবুকই বীজ থেকে বৃক্ষের বিকাশের সঙ্গেই শিক্ষার দ্বারা মানব শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির অনিবার্য্য স্ফুরণের তুলনা করেছেন। শিক্ষকের কাজ মালির কাজ : কেবলমাত্র বিকাশের ক্ষেত্র ও পরিবেশটি রচনা করা ও পরিচর্যা করা। চারা থেকে গাছ কোন্ নিয়মে কীভাবে পরিণত বৃক্ষে রূপ নেবে, তা শেখানো নয়। বীজের মধ্যেই সে শক্তি ও সম্ভাবনা প্রসুপ্ত হয়ে আছে, উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে বৃক্ষ তার নির্দ্দিষ্ট পরিণতিতে ও সার্থকতায় গিয়ে পৌঁছবে। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। সব শিশুই শেখবার প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। তাকে ধীরে ধীরে পূর্ণ মনুষ্যত্বে বিকশিত হতে হবে, তার জন্য সে নিজেকে নানা দিকে নানাভাবে চালনা করতে চায়, নিজের শক্তি আয়ত্ত করতে চায় ; দেহ মন বুদ্ধি হৃদয় আত্মা, তার সত্তার, সম্যক অভিবৃদ্ধি ও সম্যক পরিণতির জন্য প্রেরণা, তার মধ্যে সর্বদাই কাজ করছে। বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যেই শিক্ষকের কাজ নিহিত—যে পরিবেশ হবে সহজ, স্নেহ দ্বারা সুরক্ষিত, শিশুর পক্ষে বাধাহীন ও আনন্দময়। শিক্ষক শিশুকে জোর করে কিছু শেখাতে চেষ্টা করবেন না, কারণ সে শিক্ষা কার্যকরী হবে না।

শিশু নিজেই নিজের দেহমনের বৃত্তিগুলি চালনা করে' তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধনে সর্বদা সচেষ্ট। শিক্ষক তার পাশে থেকে ও মাঝে মাঝে উপকরণ যুগিয়ে এবং তার সঙ্গে কাজ করে' ও খেলা করে' তাকে তার অভীষ্ট বিকাশ ও সার্থকতা লাভে সাহায্য করবেন। যারা মনে করে যে শিক্ষা হোল এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে জ্ঞান ও বিদ্যা ঢেলে ভরতি করা—শিক্ষকের আপন আয়ত্তীকৃত জ্ঞান ও বিদ্যাকে শিশুর শূন্য মস্তিষ্কে জোর করে প্রবিষ্ট করানো—তারা নিতান্তই ভুল করে। শিশুর মস্তিষ্ক বা মন কোনো শূন্য পাত্র নয়, তা অসংখ্য শক্তির বিকাশোন্মুখ বীজক্ষেত্র। শিশুর দেহমনের বিকাশের সমতালে সেই সব শক্তির ক্রমিক বিকাশ, স্বভাবের নিয়মেই ঘটবে। অধৈর্য হয়ে কিছু কিছু শক্তির অতিত্বরিত ও অত্যধিক বিকাশে আগ্রহী হলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ সুষম বিকাশকেই ব্যাহত করা হবে। হয়তো বুদ্ধিবৃত্তির বা স্মৃতিশক্তির অধিক বিকাশ হলে'ও তার হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ যথোচিত ঘটলো না, আত্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশও অপরিণত থেকে গেল, দায়িত্ববোধ ও ভালোমন্দের বিচারশক্তিও হয়তো খোঁড়া হয়ে রইলো। এরূপ অসমবিকশিত মানুষ নিজের কাছে ও দশের কাছে সমস্যা হয়েই থাকবে, নিজেকে নিয়েও সুখী হবে না, সমাজের পক্ষেও কল্যাণের হবে না।

ভালো ভালো যেসব শিশুবিদ্যাবীথি বা নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে এ শহরে, সেখানে শিশুশিক্ষার কোন্ দিকটার উপর বেশী জোর দেওয়া হয় ? আমার মনে হয় অক্ষর পরিচয়, সংখ্যা গণনা ও ছড়া-আবৃত্তি (ইংরাজী বাংলা দুরকমই)—এইসব দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয়। আর দেওয়া হয়, ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতার উপরে। ছোট ছোট শিশুদের ক্লাসের বেঞ্চি-ডেস্কে সারিসারি বসিয়ে তাদের নানা ছবির বইয়ের মাধ্যমে অক্ষর চেনানো হয়। এক-দুই-তিন আবৃত্তি করে' গুনতে শিখতে হয়, খাতায় লিখতে শিখতে হয়। ক্লাশে শৃঙ্খলা রেখে ওঠা বসাও শেখানো হয়, ছড়া আবৃত্তি করে' উচ্চারণ ও ছন্দের মাধুর্য শেখানো হয়।

এ সব উদ্দেশ্যই ভালো ; কিন্তু এসবের প্রতি শিশুদের যদি আগ্রহ আর অনুরাগ সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাদের পক্ষে এশিক্ষা কটু ওষুধ গেলার মতো হবে। শিশু যখন খেলতে চায় তখন তাকে ক্লাসের খাঁচায় বন্দী করে' রেখে "বলো পাখী রাধাকৃষ্ণ বলো" শেখানোর মতো করে বুলি শেখানো কি তার প্রতি অত্যাচার নয় ? প্রকৃতি যে সকল শিশুর মধ্যেই চুটাছুটি ও খেলার একটা অদম্য প্রবৃত্তি দিয়েছে, সে কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই ?

আচার্য্য সি. ভি. রামন, এমনি বহু বৈজ্ঞানিকের নাম মনে পড়ছে। এমন কি নোবেল প্রাইজবিজয়ী চন্দ্রশেখর ও খুরানাও সেই আগের আমলের। এখনকার মতো শিশুশিক্ষার জাঁতাকল তখনো সৃষ্টি হয়নি এদেশে। ছেলেরা পাঁচবছর বয়েস পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়াতো, প্রকৃতির হাত ধরে বস্তুবিশ্বের সত্য পরখ করতো। এখনকার মতো আড়াই তিন বছর থেকেই বইয়ের বোঝা পিঠে বেঁধে ক্লাস ঘরে বন্দী হয়ে, কেতাবীজ্ঞান অর্জন করতে হোত না তাদের। তাদের ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি হোত—দেহ মনের সকল বৃত্তির; চিৎ শক্তির, মনন শক্তির; প্রীতি বৃত্তির, কল্পনাবৃত্তির; আত্মশাসন শক্তির ও আত্মবিশ্বাসের। বাপ মা ও ইস্কুল মিলে তাদের মনের সব সহজ আনন্দ বই খাতার চাপে এমন করে দলে পিষে নিষ্পিষ্ট করতো না তখন, এমন যান্ত্রিক পুতুলে পর্যবসিত করতো না তাদের। তাই তাদের দৃষ্টি-মন-চিত্ত সত্যকে আয়ত্ত করতে অধিকতর উন্মুখ ও পারঙ্গম ছিল।

এখনকার এই অতিশিক্ষণ প্রাপ্ত শিশু সমাজকে দেখে আমার মন বেদনায় ভরে যায়। এদের জীবনকে যে নানাদিকে পঙ্গু করে রাখা হচ্ছে, তা এরা জানে না। পরবর্তী জীবনে শুধু মুখস্থ বিদ্যার জোরে ভালো চাকুরি পাবে বটে কিন্তু এদের চিত্তে আনন্দ থাকবে না। এরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতেও পারবেনা সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত এরা উপভোগ করতে পারবে না, বস্তুজগৎ ও অধ্যাত্ম জগতের কোনো সত্যকে জানার জন্য তদ্‌গত ও তন্ময়, আত্মস্থিত ও আত্মোৎসর্গ পরায়ণ হবে না, কোনো মহৎ আদর্শের প্রেরণাও অনুভব করবে না। এরা আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব, দাম্ভিক ও উদ্ধত হবে; সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে কারু পক্ষেই কল্যাণকৃৎ হবে না। এরা আধখানা মানুষ হয়ে থাকবে। কিন্তু এদের এইভাবে আধখানা করে রাখার দায়িত্ব এদের পিতামাতার—যারা এদের সহজ বিকাশের পথ রুদ্ধ করে' একটা দিকের উপরেই সমস্ত জোর দিচ্ছে। যেন শেখানো বুলি কপ্‌চানো আর পরীক্ষা পাশ আর চাকরি যোগাড় করাই মানুষের একমাত্র পরমার্থ।

কিন্তু এই একপেশে-বিকাশধর্মী শিক্ষা পদ্ধতি পাশ্চাত্য থেকে আমদানি মনে করলে মস্ত ভুল করা হবে। ওদেশে এই চাপানো শিক্ষার কল থেকে শিশুমনকে মুক্তি দেবার সাধনা চলেছে, যাতে তার স্বাভাবিক কৌতূহল ও আত্মবিকাশের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাই তাদের অভিষ্ট। রুশো থেকে মাদাম মন্তেসরী পর্যন্ত প্রায় দুশো বছরে ধরে এই প্রয়াস অব্যাহত আছে। শুধু আমাদের দেশেই, ইংরেজ চলে যাওয়ার পর থেকেই, ছেলেমেয়েদের নকল

সাহেব মেম বানানোর ক্যাপামি পেয়ে বসেছে উচ্চবিত্ত সমাজকে ও তাদের অনুকারীদের। এবং সেই ক্যাপামির ভূতের তাড়নাতেই তারা ছেলেমেয়েদের বিলিতি বুলি-আওড়ানো পুতুলে পরিণত করতে লেগেছে। আবার এদেরই প্রবর্তনায় এটাই হয়েছে চাকুরিলোক প্রাপ্তির রাজপথ : তাই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা চলেছে নিখুঁত বুলিসর্বস্ব পুতুল তৈরীর ছাঁচ নির্মাণে কারা পয়লা নম্বরের শিরোপা পাবে ; শিরোপা অর্থাৎ অভিবাবকদের বিপুলতম সমর্থন। মাঝখান থেকে শিশুশিক্ষার নামে শিশুমেধ চলেছে। এই শিশুরা বড় হয়ে অর্দ্ধেক কাঁচা আর অর্দ্ধেকপোড়া ডিমের মতো এবং দরকচামারা আমের মতো কারো ভোগেই লাগবে না। নিজেরা ভোগসর্বস্ব হবে কিন্তু কোনো আনন্দ ও কল্যাণ লাভ করবে না। এদের বিসঙ্গত ও কবন্ধপ্রায় ব্যক্তিত্ব সবাইকে প্রতিহত করবে এবং নিজেকেই প্রদক্ষিণ করার বন্ধ্যা আবেশে এরা জীবনের সর্ববিধ মহত্তর সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে।

ভিখিরি

প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত

গরীবের দেশ আমাদের—অভাবের অন্ত নেই। গ্রামে গঞ্জে, পথে-ঘাটে, শহরে-স্টেশনে সর্বত্রই তাই ভিখিরির ভীড়। তবে তার মধ্যেও আছে নানা বৈচিত্র। জীবনের দীর্ঘ পথে যেতে যেতে সেই বৈচিত্র যা চোখে পড়েছে তারই কিছু কিছু টুকরো ছবি এখানে দিচ্ছি।

* * * * *

ছোটবেলায় আমাদের ঢাকার বাড়ীতে দেখেছি প্রতি রবিবার ভোরে বাবার অফিস ঘরের রাস্তার দিকের বারান্দায় দু'টো বড় বড় ধামায় চাল ভর্তি করে রাখা হত। তখনকার দিনে একটাকায় প্রায় পনেরো ষোল সের মোটা চাল পাওয়া যেত। সকালবেলা থেকেই ভিখিরিরা দলে দলে পরপর আসত। দু'মুঠো করে চাল ওদের প্রত্যেকের বাটিতে বা ডালাতে দেওয়া হত। অনেক বাড়ীতেই এরকম মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার রীতি ছিল। দু'মুঠো চাল নিয়েই ওরা সন্তুষ্ট চিত্তে চলে যেত। ভিক্ষা নিয়ে আবার কেউ কেউ বলত, "বেঁচে থাক,

মঙ্গল হোক।" আবার কেউ বলত, "জয় রাধেশ্যাম।" একজন পাকা দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান ভিখারী প্রায় আসত, তার কথা মনে আছে। সে বলত, "আল্লা রসুল মেহেরবান"। তখন এ কথার অর্থ জানতুম না। কিন্তু কথাটি সুন্দর শোনাত। আমরা অনেকদিন বিকেলে মাঠে খেলতে গিয়ে এই কথাটি বলতুম। দেরীতে এসে যদি কোন ভিখিরি দেখত চাল নিঃশেষ হয়ে গেছে তবে নিঃশব্দেই অন্যত্র চলে যেত। বর্ষার দিনে ভিক্ষুকের সংখ্যা খুব বেড়ে যেত। পূর্ববঙ্গ খাল-বিল নদী-নালার দেশ, বর্ষাকালে অধিকাংশ জমি ক্ষেত জলের নীচে চলে যায়। অনেক গ্রামে বাড়ীর উঠোনেও জল থাকে। ভূমিহীন চাষী মজুরদের কোন কাজ থাকে না, আয়ের উপায় নেই। তখন দীন দরিদ্র পরিবারের সবাই দলে দলে শহরে চলে আসে—ভিক্ষাই তখন তাদের পেটের জ্বালা মেটানোর একমাত্র ভরসা।

পুণ্যের লোভে বা বাহবা পাওয়ার জন্য যে ভিক্ষা দেওয়া হত, তা নয়। প্রায় সবাই, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেরা সাধ্যমত দুঃস্থকে সাহায্য করা একটা সামাজিক কর্তব্য মনে করত। যারা গ্রহণ করত তারাও বিনীত শ্রদ্ধার সঙ্গেই নিত। দাবী বা জুলুমের জোরে নয়।

* * * * *

আর একটু বড় হয়ে যখন স্কুলের উপরের ক্লাসে উঠেছি তখন আমাদেরও ভিক্ষায় বের হতে হত। সে সময় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বাড়ীতে বাড়ীতে একটা বড় মাটির ঘট রেখে যেত। ঘটগুলোর আকৃতি ছিল একটা বিশেষ ধরণের। দেখলেই চেনা যেত ওগুলো মিশনের মুষ্টিভিক্ষার ঘট। বাড়ীর মায়েদের কাছে মিশনের অনুরোধ ছিল যে প্রতিদিনের রান্নার জন্য চাল নেবার সময় এক মুঠো চাল যেন ওই ঘটে রাখা হয়, দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য। এভাবে সপ্তাহে যে চাল জমত, আমরা অর্থাৎ পাড়ার ছেলেরা বাড়ী বাড়ী থেকে সেইসব ঘটের চাল একটা বস্তায় সংগ্রহ করে নিতাম। ঘট বাড়ীতেই থাকত—আবার পরের সপ্তাহের সংগ্রহের জন্য। আমাদের বাড়ীতে দেখেছি, চাল যতটুকুই জমা হোক না কেন, রবিবারে ঘটটিকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিয়ে দেওয়া হত। সব পাড়া থেকেই এভাবে চাল সংগ্রহ করে নিয়ে স্বামীবাগে মিশনের আশ্রমে পৌঁছে দেওয়া হত। এটা প্রতি রবিবারের একটা দায়িত্ব ছিল। আনন্দের সঙ্গে আমরা একাজ করতুম। পাড়ায় পাড়ায় কে কত বেশী চাল সংগ্রহ করতে পারল তা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতার ভাব ছিল। রামকৃষ্ণ মিশন অসংখ্য দুঃস্থ এবং দুর্গতদের নিরন্তর সেবা করে। ঐ সংগৃহীত ভিক্ষার

চাল থেকে সেই সেবার কাজে অনেকটা সাহায্য হত। আজকাল কেন এই প্রথাটি উঠে গেছে জানি না।

* * * * *

এর অনেকদিন পরে কলকাতায় চাকুরী করতে এলাম। তখনকার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার বন্ধু ডক্টর পুলিন সরকার তখন বালিগঞ্জের ওদিকে থাকতেন। ছুটির দিন ছাড়া অন্য অনেকদিন কলেজের কাজের পর মেসে না গিয়ে ওর ওখানে যেতাম। সন্ধ্যাবেলা ফেরার সময় দেশপ্রিয় পার্কে ট্রাম-স্টপ থেকে ট্রামে উঠতাম। সেই ট্রাম-স্টপে প্রত্যেকদিনই দেখতাম একটি বয়স্ক লোক সবার কাছে এসে হাত পেতে সাহায্য চাইছে। লোকটির বয়েস ষাটের উপরে হবে। বেঁটে কালো, ছোট ছোট চুল অধিকাংশই সাদা, পরনে ময়লা একটি জীর্ণ ধুতি আর একটি পুরাতন ছিটের সার্ট। পায়ে তালি দেওয়া ব্রাউন রঙের ক্যানভাসের জুতো। আমাদের কাছে এসে অতি বিনীতভাবে মাথা নীচু করে বলত ; 'বাবু, যদি দয়া করে ক'টা পয়সা সাহায্য করেন, তবে গরীবের খুব উপকার হয়……।'

কোন কোন দিন দু'-চার আনা পয়সা তাকে দিয়েছি। একদিন ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ আমার এক সতীর্থের সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা। ওর সঙ্গে কথা বলছি, সেই লোকটি দেখি আমার দিকে আসছে। কাছে আসতেই তাকে দেখে আমার বন্ধুটি বলে উঠ্‌ল : "আরে আপনি এখনও চালাচ্ছেন ……" !

লোকটি আমাদের দু'জনের মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই খুব তাড়াতাড়ি ট্রাম-লাইন পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। আশ্চর্য হয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি, তুমি ওকে চেন নাকি ?"

—বিলক্ষণ চিনি। এর এক মজার ইতিহাস আছে। লোকটি একসময়ে আমাদের কোম্পানির একটা অফিসে ছোটখাট কাজ করত। ওর কালীঘাটে একটা বাড়ীও আছে। সেটার একতলায় ও থাকে আর বাকী অংশটুকু ভাড়া দেয়। উপরের তলায় থাকে ওর দুই ছেলে তাদের বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে। ছেলেরাও চাকুরী করে—ও ছেলেদের সংসারেই আছে। ছেলেদের বাধা-নিষেধ, তিরস্কার রাগ-অভিমান কিছু শোনে না ; রোজ এই বেশে এসে ভিক্ষে করবেই। যদি বলা হয় তুমি এরকম কর কেন ? কি প্রয়োজন তোমার ? উত্তর দেয় : "যদি দু'টো পয়সা আমার আসে, তবে বাবু আপনারা বাধা দেন কেন ? আপনাদের ত কোন ক্ষেতি হচ্ছে না ……।"

বললুম, "তাহলে এ ভিক্ষাজীবী নয়। একজন সত্যিকার ভিক্ষা-ব্যবসায়ী।"

সত্য মিথ্যা জানি না, কলকাতা সহরে নাকি এরকম বিত্তবান ভিখারী আরও অনেক আছে।

* * * * *

মহাযুদ্ধের সময়, ১৯৪২-৪৩-এ ভিক্ষুকের যে মর্মন্তুদ চেহারা দেখেছিলাম সেটা আর কোনদিন ভুলতে পারব না। অস্থিসার অর্ধনগ্ন মানুষের দল—ছেলেমেয়ে, শিশু, জোয়ান বুড়ো—বাড়ী বাড়ী, দোরে দোরে, সব চীৎকার করছে :

"ফ্যান দে মা, একটু ফ্যান দে! না খেয়ে মরে গেলাম! ভাত চাই না, মা একটু ফ্যান দে....."

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। অসহায় ক্ষুধার্তদের সেই আর্ত চীৎকার আজও কানে বাজে। সে সময় দেখেছি অনেকদিন আমার মার খাওয়া হত না। সব কাজ সেরে ভর দুপুরে মা খেতে বসবেন, এমন সময় সদর দরজা থেকে ভেসে এল : "মা একটু ফ্যান দে না মা....."

মা তাড়াতাড়ি থালাসুদ্ধ ভাত-তরকারি নিয়ে ওদের টিনের থালা বা সান্‌কীতে ঢেলে দিয়ে আসতেন। তারপর মা আর প্রায়ই খেতেন না, অথবা একটু মুড়ি খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন। চালের দাম তখন চার টাকা মণ থেকে একশ' টাকায় গিয়ে উঠেছে। অনেকেরই ভাত দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। নিজেদেরই টানাটানি সব বাড়ীতেই তখন। ভাতের ফেন রেখে দেওয়া হত, তার সঙ্গে একটু ভাত আর নুন মিশিয়ে ভিক্ষুকদের দেওয়া হত।

সে সময় আমি ক'দিন নারায়ণগঞ্জে ছিলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি চাষাড়া গ্রাম থেকে সহরের দিকে যাচ্ছি, দেখি একটা পুকুরের ধারে একটি মাঝ বয়েসী লোক গাছের তলায় পড়ে আছে। খালি গা, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে—বুকের হাড়গুলো উঁচু হয়ে রয়েছে। উপরের আকাশের দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে আছে। হাপরের মত বুকটি ওঠা-নামা করছে। ৭।৮ বছরের একটি খুব রোগা ছেলে কলাই করা বাটিতে একমুঠো ভাত নিয়ে বারবার বলছে, "চাচা, একটু ভাত আন্‌ছি। খাবা না.....?"

অনেকক্ষণ পরে লোকটি বিড়বিড় করে কি বলল। ছেলেটা উত্তর দিল; "চাচা আমি খাইচি, তোমার লেইগা একটু রাখ্‌চি। তুমি খাও না! অনেকদিন ত তুমি কিছু খাইলা না....."

লোকটি যেন বেশ কষ্ট করে একটু জোরে বলল : "না রে রামু, তুই যা, বাইচা থাক্ ·····।

আর শোনা গেল না, নিস্তেজ হয়ে লোকটি চুপ করল। আমার পাশে আরও দু'তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম : কোথায় ভাত পেলি ?

—"উই তো দু'তালা বাড়ীটা। ঐ বাড়ী থিকা দিছে। আমি অনেক খাইছি, অল্প কইরা একটু রাখছি। চাচারে দিমু। চাচা ত অনেকদিন হইল কিছু খায় নাই।"

—তোর নাম কি ?

—রামু পাল।

—এই লোকটা তোর কে হয় ?

—ও ত মামুদ-চাচা, আমাগো বাড়ীতে কাজ করে। কতদিন থিকা ও-ই ত আমারে ফ্যান আইনা খাওয়াইছে। আইজ সকাল থিকা চাচা আর ওঠে নাই। ঐ বাড়ীর মা আমারে ভাইকা নিয়া ভাত দিল। কতদিন পরে আজ ভাত খাইছি। চাচা খায় নাই, চাচার লেইগা আনলাম·····।

—তোর বাবা মা কোথায় ?

—কুনখানে গেছে জানি না। আমারে লইয়া চাচা ত কত জায়গায় খুজলো, কোনখানে নাই।

কয়েকটি ছেলে মিলে দুঃস্থদের সাহায্য করার জন্য একটি সমিতি খুলেছিল। তাদের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বললাম। ওরা বলল, "দেখি কি করতে পারি, এরকম আরও কত যে খবর আসছে···"

উৎকণ্ঠায় ছিলাম, বেশী রাতে আবার ওদের কাছে খবর জানতে গেলাম। শুনলাম, ওরা যখন গিয়েছে তখন লোকটি মারা গেছে। ছেলেটিকে ওরা সরকারী ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আজও সেই দৃশ্য মনে পড়লে বুকে কি রকম একটা যন্ত্রণা অনুভব করি। দিনের পর দিন ভিক্ষা জোটে নি, না খেতে পেয়ে তিল তিল করে জোয়ান মানুষ দুঃসহ কষ্ট নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। তবু তারা অপরেরটা কেড়ে নেয় নি, লুট করে নি। নিঃশব্দে মরেছে।

এসব নিয়ে সাহিত্যিকেরা পরে বহু কাহিনী রচনা করেছেন, তার কিছু সিনেমার পর্দায়ও উঠেছে। আজকের লোক পাখার তলায় আরাম-কেদারায় বসে সেই বই পড়ে আর ছবি দেখে। কিন্তু আমরা যারা সেই ভয়ঙ্কর

দুর্দিনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তারা কিন্তু ওসব বই পড়তেও পারি না, ওসব ছবিও দেখতে পারি না।

অথচ সেই হাজার হাজার বুভুক্ষু যেভাবে তখন মৃত্যু বরণ করেছিল, সে শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সীমাহীন অর্থ-লোলুপতার জন্য। এই আমাদের দেশ!

* • *

সেদিন লোক্যাল ট্রেনে কল্যাণী যাচ্ছিলাম। শিয়ালদহ ছাড়তেই একটি বাবরী-চুল দাড়িওয়ালা লোক "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে..." গাইতে গাইতে গাড়ীতে ঢুকল। তারপর শুরু করল কৃষ্ণের শতনাম। কেউ কেউ ওকে কিছু পয়সা দিল। সোদপুরে সে নেমে যেতেই গলায় হারমনিয়াম ঝোলানো একটি লোক ১০/১২ বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে ঢুকল। গাড়ী ছাড়তেই সে তারস্বরে রাসভনিন্দিত কণ্ঠে গাইতে শুরু করল: "জেনে শুনে বিষ করেছি পান ··।" কবিগুরু শুনতে পেলে নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা যেতেন, আর ভাগ্যিস সাগর সেন প্রয়াত, না হলে তাঁকেও আত্মহত্যা করতে হত।

এরা সব প্রায়ই ধর্মের ভেক নিয়ে ভিক্ষা করে। এরকম বকধার্মিক ভিক্ষাজীবীদের প্রায়ই দেখা যায় গলায় কোন দেবদেবীর পট ঝোলান আছে। অথবা শিব, রাধাকৃষ্ণ, শীতলা প্রভৃতির কোন ছোট্ট মূর্তি একটা ছোট্ট সিংহাসনে রেখে তেল-সিন্দুর ফুল, মালা দিয়ে সাজিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ধর্মের দোহাই থাকলে অনেক লোকই সহজে বেশী দান করে। মেয়ে মহলে এদের পশার খুব বেশী। এ রকম একটি ধর্ম-ভিখারীকে দেখেছিলাম, জন্মাষ্টমীর সময় সে গলায় কৃষ্ণের মূর্তি ঝোলাত আর চৈত্রমাসে গলায় থাকত শীতলা ঠাকুর। এদের আর এক সংস্করণ, হল মুস্কিল-আসান। বিরাট পিতলের পিলসুজে একটা মস্তবড় তেলের প্রদীপে মশালের মত শিখা জ্বালিয়ে নিয়ে আলখাল্লা-পরা ফকির রাত্রিবেলা এসে হাঁক দিত। দাড়িওয়ালা ফকিরের এক হাতে থাকত মশাল, অপর হাতে একটি বল্লম, চোখ দুটো রক্তজবার মত লাল—দেখে ছোটবেলায় খুব ভয় পেতাম। আমরা প্রত্যেকে একটা পয়সা পিলসুজে ফেলে দিতাম। একটা কাজলের টিপ কপালে দিয়ে ফকির চলে যেত। কোন রকমে ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলে ভিক্ষাপ্রাপ্তির অনেক সুবিধে হয়।

"ভিক্ষে করা" হেয় কাজ এরকম আমরা সাধারণতঃ মনে করি, আর ভিখিরিদের জন্যে মনে একটা অনুকম্পা বোধ থাকে। শিখধর্মে ভিক্ষা গ্রহণ

এক গর্হিত কাজ। খাঁটি মারাঠিরাও কখনও দয়ার দান গ্রহণ করে না। কিন্তু যে দেশে স্বয়ং শিব স্বয়ম্ভু বিশ্বেশ্বর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে অন্নপূর্ণার দুয়ারে হাজির, সেখানে ত ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে কোন অমর্যাদা থাকার কথা নয়। আজও অনেক সাধুসন্ত, শ্রমণ, ফকীর দেখতে পাই, যাঁরা কোন সঞ্চয় করেন না, ভিক্ষা করে দিনান্তে যেটুকু তণ্ডুল জোটে তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। দুয়ারে দুয়ারে মাধুকরী করেই ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে দেখি অনেক পুণ্যার্থীকে। মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে এসে বাইরে ভিখারীকে কিছু দান না করলে তীর্থদর্শনের পুণ্য সম্পূর্ণ হয় না, এ ধারণা অনেকের। তাই সব মন্দির দুয়ারে সর্বত্র ভিখিরির ভীড়। এটা শুধু হিন্দুদের বেলা নয়। মুসলমানদেরও দেখেছি কোন পুণ্যদিনে বা রোজার সময় দুঃস্থ ও দরিদ্রদের মধ্যে অন্ন ও অর্থ বিতরণ করতে। সেটা তারা পুণ্য কাজ বলে মনে করে। আবার ভগবান তথাগতের জন্য অনাথপিণ্ডদের "প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি" একথা ত সবাই জানেন। সেই ধুয়ো ধরেই আজকের দিনেও ধর্মের নাম করে ভিক্ষা-সংগ্রহের ব্যবসা চলছে।

ভিক্ষাগ্রহণ এদেশে অসম্মানের কথা নয়। কুবেরসন্তান হলেও ব্রাহ্মণের ছেলেকে উপনয়নের সময় ভিক্ষাগ্রহণ করতেই হয়; ভিক্ষা তাই মহিমান্বিতও।

শুধু অন্নের জন্য নয়, অন্য ব্যাপারেও ভিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। বিশ্বভারতীর জন্য এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্য বৃদ্ধ বয়সেও স্বয়ং কবিগুরু ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন।

সেই যে টাঙ্গাইলের বাঙ্গাল ভদ্রলোক, বড় সরকারী অফিসার তারাপদ রায়, হাস্যরসসৃষ্টি যাঁর প্রধান উপজীব্য, তিনি স্বয়ং কবুল করেছেন যে, তাঁর নিজেরও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে। "এর গল্প থেকে কিছু, ওর বই থেকে কিছু, বন্ধুদের আড্ডা থেকে কিছু" নিয়ে এসে "কষ্টেসৃষ্টে" নাকি তাঁর রসসৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হয়।

• • •

এবার এক বৃদ্ধা ভিখিরিনীর কথা বলি। অনেকদিন আগে—বোধ হয় ১৯৫৬ সন হবে—আমার বৃদ্ধ মামা ও মামীমাকে নিয়ে পুরী গিয়েছিলাম। মন্দিরের বাইরের খোলা চত্বরে নানারকম শিল্প সামগ্রীর প্রচুর দোকান আছে। মামীমার ছিল জিনিষ কেনার প্রচণ্ড বাতিক। তিনি প্রায়ই ওই বাজারে যেতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা সেখানে গিয়েছি, মামীমা একটি

দোকানে ঢুকলেন জিনিষ পছন্দ করতে, আমি বাইরের মাঠে অপেক্ষা করছি। মন্দিরের আশেপাশে বহু ভিখারী থাকেই, আমাকে দেখতে পেয়ে একটি বৃদ্ধা ভিখিরিনী কাছে এগিয়ে এল। পরনে একটা অতি ময়লা ছেঁড়া কাপড়, গায়ে কিছু নেই। শীর্ণকায়া, গলার হাড়, গালের হাড় উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। একহাতে একটা গাছের ডালের সরু লাঠি, অন্য হাতে একটা পুরানো অ্যালুমিনিয়ামের বাটি। অতি দীন-দরিদ্র।

—বাবু, রাজা আমার, দু'টো পয়সা দাও।

পকেটে হাত দিয়ে দেখি খুচরো পয়সা নেই, একটা টাকা হাতে উঠে এল। সাধারণতঃ আমি দু'টো চারটে পয়সাই দিই, সেদিন কি মনে হল, হয়তঃ ওর চরম অবস্থা দেখে কষ্ট হয়েছিল, ঐ টাকাটাই বাটিতে ফেলে দিলাম। ঠং করে একটা শব্দ হল।

ভিখারিনী অবাক হয়ে একবার বাটির টাকাটার দিকে তাকাল আবার আমার মুখের দিকে তাকাল। কোটরের ভিতরে ওর চোখদুটো চকচক করে উঠল। মনে হল, ওর চোখ যেন জলে ভরে এসেছে। হঠাৎ বুড়ী বলে উঠল :

"What ! a rupee ? It is mine ? One rupee ? Oh ! my son ! God bless you ! God bless you, my son !"

একটু থেমেই আবার সুন্দর উচ্চারণে বলল ;

"Son ! I had also my days ! I had seen London and Paris. How nice those days, what a life ! Lovely sea-shores, brilliant theatres, dances…"

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। এই দরিদ্র ভিখারিণীর মুখে এই সুন্দর ইংরেজী উচ্চারণ - কোন কনভেন্টে বা বিলাতের স্কুলে না পড়লে হতে পারে না। ঠিক এমন সময় দোকানের ভিতর থেকে মামীমা বারবার ডাকছিলেন, তাই দোকানের ভিতর যেতে হল। তিনচার মিনিট পরে ফিরে এসে দেখি ভিখারিনী চলে গেছে। এদিক-ওদিক অনেক খুঁজলাম, তাকে আর দেখতে পেলাম না। তারপর আরও ২৩ দিন ওখানে ছিলাম রোজই বিকেলে গিয়ে ওই ভিখারিণীর খোঁজ করতাম, দেখা পেতাম না। তার জীবনের ইতিহাস আমার আর জানার সুযোগ হল না, আর কোনদিন হবেও না।

অনেকদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ঐ বুড়ীর কথা মনে হত। কত

কথাই যে মনে আসত। ঐ লেখাপড়া-জানা মেয়েটির আজ এই দুরবস্থা কেন? যৌবনে হয়ত পদস্খলন হয়েছিল, বিপথে গিয়ে দুর্বৃত্তের পাল্লায় পড়ে সবকিছু খুইয়ে আজ এই অবস্থা। অথবা মনে হত, হয়ত স্বামীপুত্র নিয়ে ভাগ্য-অন্বেষণে কোন সুদূর নির্বান্ধব দেশে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েছিল, স্বামী-পুত্র সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে জীবনের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে দেশে চলে এসেছে। কিংবা হয়ত নেশার শিকার হয়ে কোন দুরাচার লম্পটদের দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তারা এর সর্বস্ব শুষে নিয়ে ছিবড়ের মতো একে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। কে বলবে কি হয়েছিল? কালের বুকে সব মুছে গেছে।

পরে যখনই পুরীতে গিয়েছি, সূর্যাস্তের সময় বেলাভূমিতে বসে থাকতে থাকতে বারবার সেই ভিখারিণীর কথা মনে হয়েছে।

পশ্চাতের কোলাহল হতে

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

॥ ৫ ॥

মানুষের জীবনে ভুল ঘটে যায়। এইবার ভুল ঘটে যাওয়ার অধ্যায়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। এই অধ্যায় ইস্কুলজীবন থেকেই শুরু হ'য়েছিল। মৈমনসিং থেকে ঢাকায় গিয়েছিলাম আমার দিদির বাড়ীতে। সে সময়টা বর্ষাকাল। ঢাকার ঝুলন পর্ব এবং জন্মাষ্টমী দেখে ফিরতে হবে। মিছিল দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা চলবে না; কারণ পড়াশুনার ক্ষতি হবে। এই সেই ঝুলন—"ঝুলনে ঝুলিছে শ্যাম রায়।" বড় বড় ঠাকুরবাড়ীতে সোনার চৌকিতে রাধা-শ্যাম বিগ্রহ, পাঁচদিনে পাঁচ প্রকার সজ্জা। শেষদিন রাজবেশ। কত যে গানের আসর ছোটতে-বড়তে দেখেছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু লালমোহন শাহ্ শঙ্খনিধির নাটমন্দির অবিস্মরণীয়। নৃত্যগীত এবং বাদ্য—এ তিনের মিলনে হয় সঙ্গীত। কোনও বিষয়ে গভীর জ্ঞান-সঞ্চয়ের বয়স আমার তখনো হয়নি। মনে হয় আমি তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র। তথাপি সেই বয়সেই বড় বড় ওস্তাদের কণ্ঠসঙ্গীত, প্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌবী নৃত্য-শিল্পীদের কলাকৌশল এবং প্রবীণ বাদ্যকরদের সারেঙ্গী, মৃদঙ্গ এবং বাঁশীর

সুর আমায় দেহ-মন ভরে' দিয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনেই স্বস্থানে ফিরলাম। কিন্তু চোখে একটা স্বপ্ন এবং দেহমনে একটা সুরের তরঙ্গ নিয়ে।

আমাদেরই গৃহসংলগ্ন সন্তোষ-ছ' আনার জমিদারদের বাড়ী ছিল। সেখানে বসন্তবাবু নামে এক সুকণ্ঠগায়ক মাঝে মাঝে এসে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তিনি সুন্দর ছন্দে বলতেন – "যদি ইচ্ছসি কোকিল-কণ্ঠরবম্" তবে কি কি উপায়ে কণ্ঠ সাধতে হয়। তিনি বোঝাতেন রিয়াজ করা কাকে বলে। তান, লয়, গমক, গিঠকিরি, মীড –এইসব সঙ্গীতের দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতেন নিজের কণ্ঠসুষমায়। বোঝা না-বোঝার কুহেলিকায় তাঁর কথাগুলোতে এবং বিষয়গুলোতে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম। প্রতিবেশী কবিরাজ ললিতমোহন সেনের বড় ওস্তাদ বলে খ্যাতি আছে। শুনতাম তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রটায় প্রবীণ জ্ঞানী। সকালে সন্ধ্যায় তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ইনিয়ে-বিনিয়ে সরগম্ সাধা কানে আসত। আমার কৈশোরে কিছুদিন ঐসব নেশায় খানিকটা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। স্বীকার করব নেশাটা আমাকে মশগুল করেছিল কিন্তু আমি তাতে মত্তী বা পন্তী হয়ে কোন দিনই যাইনি। সে যদি ঘটতো তবে আমি লেখনীপুস্তকহস্ত এই অধম অধ্যাপক না হয়ে— ওমর খৈয়ামের ভাষায় বলি—কি হতাম? "কি হবে জেনে সে কথা তোর?"

তোমার মাঝে তোলেন যিনি দুঃখসুখের নানান ঢেউ,
জানেন তিনি, কেবল তিনি—জানায় নেই অন্য কেউ।

সকলেই কি নিখিল কলাবিদ্যায় পারঙ্গম মহাতপস্বী হতে পারে? আমাদের শাস্ত্র বলে, পারেন যিনি, তিনি মহেশ্বর। সকল শাস্ত্রকথা শিবমুখে। নৃত্যের তালে তালে এই বিশ্বের সৃষ্টি তিনিই করেছেন; আবার উন্মত্ত তাণ্ডবে এ বিশ্ব ধ্বংস তিনিই করবেন। আবার সৃষ্টি—নিমীল নয়নে সৃজনানন্দ। মহাবিশ্বের একটা সঙ্গীত আছে। চোখ বুজলে শুনবেন— তাতা থৈ থৈ, তাথৈ তাথৈ।

আমার ভাগ্য ভাল, আমি গানের সুরে সেই কৈশোরে হারিয়ে যাইনি। ও পথ বড় বিঘ্নসঙ্কুল—আবার বলি—কি হবে জেনে সে কথা তোর? ললিতকলার প্রথম ধাপেই আমি গুরুর অভিসম্পাত লাভ করেছিলাম। তিনি রেগে বলেছিলেন—"তোর গান জীবনে হবে না। তোর গানের সুর শুনলে কুকুর-শেয়ালও ধুত্তোর বলে দূরে চলে যাবে। গাধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতে পারে। যা, চলে যা' এখান থেকে। এখানে আর আসিস নে।" আমার অপরাধ?

গুরু বসন্তবাবু direct method-এ সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন। প্রথম সুর দিলেন—"যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা।" বললেন—এই সুর সাধবি। সাতদিন পরে আমি শুনব। সপ্তাহ শেষে গুরু বসন্ত এলেন বিচিত্র রং-বেরংয়ের পোশাক পরে, অঙ্গের সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে। আমি গুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইলাম; কিন্তু গুরু শোনার জন্য যেই থামেন, আমিও থেমে যাই ভয়ে ও লজ্জায়। তিনি তিন-চারবার চেষ্টা করে আমাকে বশে আনতে পারলেন না। তখন গুরু আমাকে ঐ দারুণ অভিশাপ দিলেন। আমার মায়ের মুখে শুনেছিলাম, দেবী দুর্গার প্রিয়নন্দন গণেশের শুঁড় নেড়ে বেসুরো গান শুনে শিব পরিহাস করেছিলেন। তাই দেখে মা রেগে শিবকে ধমকে দিয়ে বললেন—'মম বরে নিজকণ্ঠ নিজের কাছে সুমধুর মনে হবে।' আমি পরীক্ষা করার জন্য এক দারুণ বর্ষার ঝমঝমে বৃষ্টি টিনের চালায় যখন আরম্ভ তুলেছে তখন উচ্চকণ্ঠে গাইলাম—যখন সঘন গগন গরজে···আর এগোতে পারলাম না। নিজের সুরে নিজেরই লজ্জা হলো। শেয়াল-কুকুর-গাধা—কেউ কাছে ছিল না। আমি নিজেই থেমে গেলাম। দেবী ভগবতীর বর আমি ব্যর্থ করেছি। কত বড় অকৃতী অভাগ্য আমি!

মাঝে মাঝে ভাবি সত্যই কি আমার মধ্যে গান নেই? কোন তান মান নেই? তাই যদি সত্য হয়, তবে এত বড় বড় গানের জলসায় কি নেশা নিয়ে রাত্রি ভোর করেছি? একবার নেতাজী Stadium—এ শীতের রাত্রি ৮টায় শুরু করে ভোর ৬টা পর্যন্ত তন্ময় হয়ে বসেছিলাম কোন নেশায়? এক নর্তকীর "মৈঁ নাচুঙ্গী" বলে বিচিত্র ভঙ্গিমার নৃত্য প্রায় দু ঘণ্টা ধরে শাহ্‌বাস্ শাহ্‌বাস্ ধ্বনির মধ্যে কেন দেখেছিলাম তবে? কেন আমি রাধাকৃষ্ণের নৃত্য প্রতিযোগিতা মানস প্রত্যক্ষ করে চলতাম? —"তক্তা থৈ থৈ বাজয়ে মৃদঙ্গ। নাচত বিধুমুখী অঙ্গবিভঙ্গ।" মহাজনের পদ বার বার মনে আসতো। রাধা বলছেন—শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে, না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড—তোমার অঙ্গ দ্রুত তালে দুলবে—তুমি স্থির। কৃষ্ণ বলছেন—রাই, এবার তোমাকে নাচিতে হবে। চরণের রিনিকি ঝিনি যেন শুনি না, আর পায়েলের ঘুঙ্গু যেন নড়ে না। বিচিত্র পরীক্ষা! দ্রুততার আতিশয্যে ইন্দ্রিয় শক্তি হার মেনে যায়। সেদিন নর্তকীর নৃত্যে আমার বৈষ্ণব পদটির পাঠ সম্পূর্ণ হলো। আমি আমার বিশ বছর বয়সে উদয়শঙ্কর-শিষ্যকীর গজাসুর বধ দেখে, বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। ওরা কি মানুষ, না উমা মহেশ্বর? পরবর্তী জীবনে রোশনকুমারী, কিসনকুমারী, অমলাশঙ্কর, গোপীকিষণ এবং মনে হয় ১০।১২

বছর আগে মমতাশঙ্করের নৃত্য দেখেছি। আমার মনে নৃত্যের তাল লয়ের খেলা না থাকলে আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে কী দেখি?

বোধহয় এক কুড়ি বছর হয়ে গেল—মার্কাস স্কোয়ারে বিশাল এক জলসায় ভীষ্মদেব ধ্রুপদ গানে শুধু একটিমাত্র শব্দের উপর সঙ্গীত করে চললেন—'মহাদেব'। সে বিচিত্র সুর ও ভঙ্গিমা আজও চোখে ভাসে। পান খেলেন—সুরের বিকার নেই। বেশ খানিকটা জর্দা মুখে পুরলেন—অলক্ষ্যে পিকদানী এল, গেল,—'মহাদেব' বিচিত্র স্বরে লয়ে খেলেই চলল। এক ঘণ্টা পর বাক্যটি এল মহাদেব বীণা বাজায়। অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিলাম। ওস্তাদ্ আলাউদ্দীন, মৌজউদ্দীন, ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁর স্ব-কণ্ঠ এবং রেকর্ড আমাকে পাগল করে দিত। আমি রাগ ও রূপের রীতিমত ধ্যান করতাম। উজ্জয়িনী থেকে মেঘের শেষ রাত্রির বিদায়-দৃশ্য আঁকতে গিয়ে আমার ললিত রাগের কথা মনে পড়েছিল। লিখেছিলাম—তোমারে চাড়িয়া যেতে হবে, রাত্রি যবে উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্র রবে। আর্ত হৃদয়ের এই ক্রন্দন উজ্জয়িনীর করুণ বিলাপে মিশে যেন ললিত-বিভাসের দ্বৈত সঙ্গীত রচনা করেছে। রাত্রিশেষে নায়ক দলিত জাতিম ফুলের মালা গলায় নিয়ে নায়িকার গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে বড় কষ্টে। এদিকে প্রভাতের আলোক দেখা দিতে চায়। প্রিয়তমাও চঞ্চলা—বিভাস বেজে উঠলো—তবু ছেড়ে দিতে হবে।

তরুণ বয়সে শোনা অমন এক প্রচণ্ড গায়িকা ইন্দুবালার কণ্ঠে গানটি—"ওরে মাঝি! ওরে মাঝি, তরী হেথা বেঁধো নাকো আজকে সাঁঝে।" আমাকে আনন্দ দিতে পারে নি। আমার মনে হতো ইন্দুবালা জোর করে গমক/গিটকিরি দিয়ে গানটিকে ছিন্ন ভিন্ন করে চলেছেন। এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত। সিন্ধু রাগের ভাবগম্ভীর উদাসকরা বিরাট বিস্তার যেন তার কারুণ্য হারিয়ে ফেলছে। এই গানটি কুমুদরঞ্জন মল্লিক রচনা করেছিলেন।

একদা কালিপ্রসন্ন ঘোষ 'নীরব কবি' নামে প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা নির্দয়ভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। তাঁর কথার তাৎপর্য—'যে কাঠ জ্বলে না, সে আগুন নয়। যে আকাশের দিকে তাকিয়ে' আকাশের মতই নির্বাক তিনিও কবি নন।

কাঠেই তো আগুন আছে। নৈলে জ্বলে ওঠার শক্তি কে দেয়? ওটা অন্তত অগ্নি-আধার। মনেও সঙ্গীত বাজে, কণ্ঠে ফোটে না। সবই অবস্থা ও পরিস্থিতি-নির্ভর। যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে—সেও তো ব্যর্থ নয়, কবিরই কথা।

আমরা সহোদর ভ্রাতা-ভ্রাতৃব্য মিলে ছিলাম আটজন। লোকে মুখে বলতো অষ্ট বসুর সংসার। আমাদের জীবিকা ও উপার্জন কেন্দ্রগুলি মোটামুটি বিস্তৃতই ছিল—টাঙ্গাইল, মৈমনসিং, খুলনা এবং কলিকাতা। আমাদের মূল গৃহ বা বাড়ী ছিল বিক্রম হাটী গ্রামে। বাকী সব গৌণ গৃহ বা বাসা-বাড়ী ভাড়াটে বাড়ী হবে এমন নিয়ম নেই। মালিকানা সত্ত্বেও সে বাসস্থানগুলো বাড়ী, নামের মর্যাদা পায় না, এটাই ছিল পূর্ববঙ্গে অলিখিত অভিধান। বাঙালদের একটি মাত্রই বাড়ী থাকে সে দেশের বাড়ী। সেই স্থানে সকলে দুর্গা পূজার সময় মিলিত হয়। আমাদের পরিবারে তিনজন উকিল ছিলেন, একজন ডাক্তার। যখনকার কথা বলছি, তখন তিনি সদ্য মেডিকেল কলেজ থেকে এম্ বি পাশ করে বেরিয়েছেন। সহোদর তিনটির পাঠাদশা এবং তারা ভাবীকালের অধ্যাপনাব্রতী। আমাদের মেজভ্রাতৃব্য আমাদের মধ্যে বিশেষ কৌলীন্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখনকার নীলরতন মেডিকেল কলেজ তখনকার ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুল। সেখানে এক বছর পড়েই তিনি পলায়ন করলেন। কারণ মড়ার খুলি নাকি তাঁকে নাম ধরে ডেকেছিল। কাকা তাকে প্রথমে খুলনা মূলঘরে তামাকের ব্যবসা করে দিলেন। সেটা ফেল। পরবর্তী দৃশ্যে তিনি কোন এক পাল সহকর্মী নিয়ে মিরজাপুর ষ্ট্রীটে পুস্তকের দোকান দিলেন। "পাল-ভট্টচার্য" ওখানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিন চার বছর চলে, মেজদাদার মত ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। বাবা তাঁকে বিক্রমহাটীতে এনে টাঙ্গাইলে মোক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো না। তার ফৌজদারী ধারাগুলো নাকি মুখস্থ হতে চায় না। কাজেই আমাদের টাঙ্গাইল শহরে নব নির্মীয়মান দুখানা বাড়ী দেখার ভারপ্রাপ্ত হয়ে দাদা কিছুদিন সুখেই ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই আমার বাবার মৃত্যু এবং মেজদাদা বিক্রমহাটীর সার্বভৌম কর্তা (১৯২২ সাল)।

মনে হয় ১৯২৫ সালে আমার মেজদা কলকাতা থেকে একখানা মহেশ ভট্টাচার্যের পারিবারিক চিকিৎসা এবং শতাবধি ওষুধ পরিপূর্ণ একটি সুন্দর ওষুধের বাক্স আনলেন। উদ্দেশ্য মহৎ—গ্রামের দুস্থদের দাতব্য চিকিৎসা করতে হবে। দেখলাম এই মহৎ কাজে কেউ অগ্রসর হতে চাইছে না। তারা তাস, পাশা, ছিপ, ও আড্ডার কোলাহলে প্রমত্ত থাকতেই ভালবাসে। যে কাজ কেউ নেবে না, সে কাজের ভার আমার উপর পড়বে। মুখে দাদাদের মিষ্টি হাসি—"নাও পণ্ডিত, তুমি এই কাজ নাও। মুচির বুড়ো, বামুণের

গুঁড়ো।" মানে মুচি বৃদ্ধ হলে কর্মভার বেশি নেয়, আর বামুণের ছেলেরাই তো সব করে। আমার পক্ষে জোরালো যুক্তি—কারণ বুড়োতে গুঁড়োতে মিল রক্ষা ক'রেছে। আমি উকিল গৃহে মানুষ হয়ে উকিল হতে চাইনি মুনসেফ হতে চাইনি। আমাদের মুহুরিবাবু হেমন্তদা বলতেন মুনসেফগুলো বড় কৃপণ। দুখানা শুকনো রুটী ও কুমড়ো ভাজা খেয়ে টিফিন সারে প্রশাসনের হাকিমরা পার্টি করে এবং জেলাম্যাজিষ্ট্রেটদের তোয়াজ করে শেষে নিঃস্ব হয়ে যায়, থাকে শুধু তাদের চালবাজী। ডাক্তারি জানিও না, বুঝিও না। হোমিও চিকিৎসার মূলমন্ত্র বুঝে নিলাম—সমঃ সমং শময়তি—ল্যাটিনে বললে—Similia, Similibus, Curantur—সুতরাং ডাক্তার তো হয়েই গেলাম। রোগী ওষুধে মরবে না—বড় সান্ত্বনার কথা। লক্ষণ প'ড়ে এবং মিলিয়ে ওষুধ দেওয়া—খুব কঠিন কিছু নয়। দেহস্থ সংগ্রামী রক্ত কণিকাকে শক্তি দিয়ে রোগ বিদ্রাবণ—এ তত্ত্ব ওঁরাও জানতেন না, আমিও তখন জানি নি। ডাক্তারদার কাছে জিজ্ঞাসু হ'লে উত্তর তিনি কিঞ্চিৎও দিতেন না. উন্নাসিক ছিলেন। এখনকার কবিরাজ এবং ডাক্তাররা সমস্বরে বলবেন—যা হয়েছে তার উল্টোটা দিয়ে রোগটা তাড়িয়ে দাও। ওসব তত্ত্বকথা এখন থাক।

বর্ষার শেষ—দেশে দূষিত জলে আন্ত্রিক রোগ দেখা দেয়। ভাল ভাল ওষুধ শিখে নিয়েছিলাম Nux Vom, Puls, Lycopodium. Merc Sol—এসবে খুব ফল পেয়েছি। বেশ চলছিল—আমি নাকি খুব মেধাবী। যা ধরি তাতেই সাফল্য আসে। এতটুকু বয়সে পাকা ডাক্তার হতে চ'লেছি। অদৃষ্টে সইবে কেন? আমাদের অবসর প্রাপ্ত পরিচারক নন্দদাস (নবনন্দদাস) আমাকে জোর করে তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য ধরে নিয়ে গেল। দাদার বললেন—যাও না পণ্ডিত! ডাক্তার হতে গেলে, মুখে শুনলে সব হয় না, Practical Knowledge চাই। গেলাম, সহচর বাক্সটা নিয়ে চলল। থার্মোমিটার ভুলিনি, কারণ রোগীর জ্বর। দাদার স্টেপোসকোপে হাত দিতে সাহস হয়নি। যদি কানে ধ'রে বলেন—স্টেথোতে হাত দিয়েছিস যে? তুই কি হার্ট' লাংগস্ বুঝবি? দাদা নীলরতন সরকার বিধান রায়কে হয়তো দেখেন নি, কিন্তু মণি দে, মণি সরকার, সার্জন ইউ. এন. রায়চৌধুরী ও ললিত ব্যানার্জীর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। স্টেথো ছুঁতে সাহস হলো না।

শয্যাগতা, জ্বর কাপুনি দিয়ে আসে, ছাড়ে আবার আসে, সেই সঙ্গে হাত পা ব্যথা—সর্দি আছে। প্রথম Aconite দিলাম, ওতে কী হবে? বিষটা তো ম্যালেরিয়া। পরের দিনের রিপোর্ট'—চোখ মুখ লাল, দারুণ

মাথা ব্যাথা। ঠুকলাম বেলেডোনা। কিছুটা উপশম। কিন্তু জ্বর নিয়মিত হয় না। মতিস্থির করে ফেললাম। স্বয়ং হ্যানিম্যান সিঙ্কোনা না হলে এবিষ তাড়াতে পারতেন না। কিন্তু আমায় তো পাকা হোমিওপ্যাথ হয়ে চিকিৎসা করতে হবে? আজ যে পাঁচদিন যায়! নসুদা ক্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকায়। 'বাবু, আমার মেয়েটা বাঁচবে তো?' দারুণ প্রশ্ন, উত্তরটা হ'লো পুরো ডাক্তারি।—বাঁচবে বাঁচবে, অত সহজে মানুষ মরে না। মা'র আলমারি থেকে জার্মানির মার্ক কোম্পানির তৈরী Eu Quinine—বিশুদ্ধ কুপোদকে গুলে চার দাগ কেটে হাতে দিয়ে বললাম, এইবার জ্বরের বাবা পালাবে। জানতাম, তখন কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, গ্রামের উটকো পাচন ব্যবসায়ীরা, সকলেই কুইনিন গুলে নতুন নাম দিয়ে রোগী সারায়। আমার কোনও পাপ হতে পারে না। "আজ তিন দাগ দাও, কাল সকালে এক দাগ দিয়ে এসে রিপোর্ট দেবে। তারপর এক সপ্তাহ এইভাবে চলবে।" রাত প্রভাতে নসুদা হাসিতে বিগলিত। "বাবু, জ্বর ছেড়েছে, গা পাথরের মত ঠাণ্ডা। মেয়ে মানছেনা, "ভাত ভাত" করছে। আবার একটু পায়ের ধুলো দিতেই হবে। এবার চললাম বিশেষ ভারিক্কি চালে। ডাক্তারদের মত হাত টেনে নাড়ী দেখা, বুকে, পেটে ডাক্তারি হাতে টোকা দেওয়া। চোখ টেনে রক্ত দেখা, জিভ পরীক্ষা। নসুদা বলে 'ভাত'?" এক ধমক। আজ দুধসাগু, কোষ্ঠ পরিষ্কার চাই। তোমার গাছে অজস্র লেবু, দুটো করে লেবু চিনি মিশিয়ে সরবৎ করে দাও। বাতাবী লেবু এরপর রোজ খাওয়াবে। লিভারকে বলশালী করছি। জ্বর ছেড়েছে—ক্বানি পিলে কমবে। প্লীহা স্ফীত হ'য়ে রক্ত দিতে পারছে না—তাই ফ্যাকাশে। এসব শুনে শুনে আয়ত্ত করেছিলাম। পথ্যটা আবার স্মরণ করালাম—তাহ'লে এই পথ্যই রইলো—মনে থাকে যেন। কাল ভাল থাকলে ভাত দেবো। নসুদা আমার পদধূলি নিল, মেয়ের মাথায় ছোঁয়ালে। আমি বাড়ী এসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ডাক্তারি আর করবনা। ভণ্ডামির একটা সীমা থাকা দরকার। না বুঝি দেহতত্ত্ব, না বুঝি ওষুধের গুণাগুণ। তারপর ডাক্তারিতে গিয়ে আমার শিক্ষার রাজপথ ত্যাগ করব? আমি বিজ্ঞান এবং অঙ্ক ভাল বুঝিই না। ডাক্তারিতে সায়েন্স নিতেই হবে। আমার তাই Physican হওয়া হলো না। Musician, Physician হওয়ার স্বপ্ন এইভাবে শূন্যে মিলিয়ে গেল। বাকী রইলো Magician হওয়া। ওটাও হতে চেয়েছিলাম। ও নেশাটা আমাকে, কয়েক বছর ধরেই রেখেছিল। অভিভূত করেছিল বলা ভুল হবে; কিছুদিন অনুশীলন ক'রেছিলাম।

এতক্ষণ কী প্রলাপ বকছিলাম ? আত্মবিশ্লেষণ করে এই পরিণত বয়সে বুঝতে পেরেছি, কোন বাসনাই মরে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় না। আর চাওয়া না চাওয়া সবকিছু মস্তিষ্কের লক্ষকোটি কোষগৃহে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে মরে। আমরা বাহিরও জানি নে, অন্তরও জানিনে। অন্তর বিশ্লেষণের বৈধ অধিকার এ হতভাগ্যের নেই। বাইরের কথা কিছু কিছু বলতে পারি। সেই রকম রকম করেই আপনাদের ধৈর্য সূত্রকে মাঝে মাঝে ছিন্ন করে দিয়ে চলেছি। আপনারা সম্ভব হলে জোড়াতালি লাগিয়ে যাবেন। পরম জ্ঞানের দিব্য আলোক জ্বললো না, সঙ্গীতের সাগরে ছোট্ট একটা ডুবও দিতে পারলুম না, ওস্তাদ্ ডুবুরি কনিষ্ঠা দিয়েও স্পর্শ করলেন না। ভৈরবী বিস্তার বিভীষিকা এলো। বাকী রইলো ঐন্দ্রজাল। ওটার কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলাম। পাঁচটাকা দিয়ে গুলুওস্তাগর লেন থেকে প্রকাশিত "বৃহৎ ভোজবাড়ীর কৌশল" আমাকে পুরো কৌশলী না করলেও আধা কৌশলী করে তুলেছিল। বাড়ীতে বিজয়া দশমীর রাত্রিতে আবৃত্তি, নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য ইত্যাদির সঙ্গে আমার ভোজবিদ্যার একটা অংশ থাকতো। ছোটখাট খেলার মধ্যে, আমার হাওয়া থেকে টাকা ধরা এবং সেই টাকায় খুব বড় গোলটীন ভরে ফেলা এবং সবগুলো কোনো দর্শকের আঁচলে ঢেলে দিয়ে সব উধাও করে দেওয়া, খুব হাততালি অর্জন করতো। কিন্তু ওতে কতদূর হয় ? মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বহ্নি জ্বলছে, এমন সময়—অভাবিত এক ব্যাপার ঘটল।

আমাদের টাঙ্গাইলের সংলগ্ন গ্রাম আসফজুর-নিবাসী ভবিষ্যতের জগদ্বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক পি. সি. সোরকারে'র সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হলো। আমি তখন সদ্য অধ্যাপনায় নবীন ব্রতী, ঢাকা 'জগন্নাথ'-আশ্রিত। মনে হচ্ছে সালটা ১৯৩৬ হবে। আমার দাদা হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাসা সর্বদাই অতিথি অভ্যাগতে ধন্য হয়। ভালকথা, "সোরকার" লিখেছি—প্রতুল নিজেই আমাকে ব্যাখ্যা করেছিল—"দাদা, আমি Sorcer লিখি তাতে কথাটা Sorcerer এর সগোত্র হয়—এইজন্য। সেবার আনন্দমোহন কলেজের তৃতীয় বর্ষের অন্তশাস্ত্রে অনার্স ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান প্রতুল গ্রীষ্মাবকাশে টাঙ্গাইল নিজগৃহে না গিয়ে আমাদের অতিথি হোল। সে একমাস থাকবে, পড়াশুনার সুবিধার জন্য। সেখানে একটি ক্ষুদ্র গ্রীষ্মরজনী দাদার বৈঠকখানায় "প্রতুল রজনী"রূপে আমরা কাটিয়েছিলাম। না, সে রাত্রির তুলনা হয় না। সেখানে দাদা হেমচন্দ্র, দাদার ভালক নরেন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল, আমাদের মুহুরীবাবু হেমন্তদা, আমি এবং আরও দু একজন নৈশ ভোজনের পর প্রতুলের গল্পে

মেতে গেলাম। প্রতুল ম্যাজিকের ইতিহাস দিলো মিশর থেকে। Gipsy এবং Egypt এর সম্বন্ধ দেখালে। হুডিনী থেকে শুরু করে গণপতি চক্রবর্তী এবং প্রফেসার রুদ্রের (রংপুর) জীবনের ঘটনাপুঞ্জ নভেলের চেয়েও চিত্তাকর্ষক করে বলে চললো। তার মুখেই শুনেছিলাম গণপতি শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন।

শেষে সকলের অনুরোধ হলো। প্রতুল ! দু চারটা খেলা দেখাও। তখন রাত্রি ১২ টার কম নয়। প্রতুল বললে সাজসজ্জা, যাদুদণ্ড, স্টেজ এবং সহকারী ভিন্ন ম্যাজিক হয় না। আমাদের অনুরোধে প্রতুল তাস নিয়ে প্রায় ভুতুড়ে খেলা দেখিয়ে চললো। শেষ দুটো খেলা আমার চিরকাল মনে থাকবে। একটা দড়ি মুহুরীবাবু দিলেন। প্রতুল নরেনবাবুকে দিয়ে হাত-মাপা ক'রে বললে—হেমন্তবাবু, আপনি আমার পাশের গাঁয়ের লোক। মক্কেলদের সঙ্গে মিছে ছাড়া সত্য কথা বলেন না। আসুন আপনার ছুরি নিয়ে। দড়িটা ঠিক দুভাঁজ করলে হেমন্তদা। প্রতুল বললে ঠিক মাঝখানে কাটুন। কাটা হ'লো। প্রতুল দুই করতলে ঘসে মেজে—নরেনবাবুকে দিয়ে মাপালে। দড়ি জোড়া লেগে গেছে এবং হাতের মাপ তবু ঠিক বজায় আছে। আর দ্বিতীয়টি হ'লো—একটা সামান্য সাদা রুমাল চেয়ে নিয়ে চটপট কী গেরো টেরো দিয়ে তাকে সাদা ধবধবে বিলিতি ইঁদুর করলে। সেটা প্রতুলের সারা গায়ে হাতে খেলতে লাগলো। তারপর ছুঁড়ে ফেলতে সেই সাদা রুমালখানা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু এসব বাজে খেলা প্রতুলের ভাল লাগ্‌ছিল না। বললে—তার চাইতে গল্প শুনুন। প্রতুল গল্পেই যেন জাদু খেলা করতো। আমরা সব ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনছি। দাদা আর নরেনবাবু—ভগ্নীপতি আর শালা মিলে গুড়ুক টানছেন। বাইরে কাক ডাকা শুনে দাদা সভা ভঙ্গ করলেন। প্রতুল, দেখ, ভোর হ'য়ে গেছে। আমি আর প্রতুল শয্যাশ্রিত হলাম। সেই সুপ্রভাতে প্রতুল আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল—দাদা ! First Class Honoursটা পেলে আপনাকে 'Vanishing rope' এর খেলাটা শিখিয়ে দেবো।—আমি বললাম, দেবে তো ? হাঁ, প্রতিশ্রুতি রইলো। আশীবাদটা আপনি রাখবেন তো ? Ist class Honours কিন্তু চাই।

দু এক বছর পরের ঘটনা। প্রতুলের শ্বশুর ডাক্তার প্রমথ বসু এম. বি. তাঁর টালাইল ফার্মাসিতে আমাকে বললেন—ভাই, মেয়ে তো সম্প্রদান করেছি তোমার বন্ধুর হাতে। ডাক্তারদার চোখে ভবিষ্যতের ঠিক অন্ধকার নয়, কুয়াশার উদ্‌বেগজনক ছায়া। শুনি, মৈমনসিংহের অমরাবতী থিয়েটারের হল্

ভাড়া নিয়ে মাঝে মাঝে প্রতুল অনুষ্ঠান করে, তাতে কয়েকশো টাকা উপার্জন করে। এই পর্যন্তই তাঁর সঙ্গে আমার সন্দিগ্ধ ছায়ার কথা ও কাহিনী শেষ হলো। পরের বছর আমি টাঙ্গাইল ছেড়ে করটিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দেখি বেশ বড় গেট সম্মুখে নিয়ে, এক প্রশস্ত পুষ্করিণী। চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত সুন্দর একখানা অট্টালিকা। মালিকের নাম সম্মুখে খোদাইকরা, 'P. C. Sorcer'। আর সন্দেহের স্থান নেই। ভিতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ় স্নেহালিঙ্গন। প্রথম প্রশ্ন করলাম, "প্রতুল! বাঃ, সুন্দর হরিণ তো, চিতল হরিণ! মারবে না তো?" উত্তর খুব ঠাণ্ডা। "আপনাকে শিং নেড়ে ভয় দেখাতে পারে কিন্তু ঢুঁ মারবে না। "কোথায় পেলে?" উত্তর—'জয়পুরের মহারাজের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন।' আমার Vanishing rope এর প্রতিশ্রুতি জানি অগাধ বিস্মৃতি সলিলে ডুবেছে। বললাম, কাগজে দেখি, বেশ বড় বড় বিশ্ববিখ্যাত ম্যাজিকের বই লিখে World Champion হতে চলেছ। দুএকখানা বইতো আমাকে Present করতে পার। উত্তরে প্রতুল বললে, You deserve dedication-not presentation. বুঝলাম উপহারও জলের তলে ডুবলো। তা হোক্ আমাদের পি. সি. সরকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিকের সম্মান পেয়েছিল। একি আমাদের কম গৌরবের কথা? এই নব নির্মিত গৃহেই এক নিকারী টাঙ্গাইলের বাজারে অবিক্রীত লালটুকটুকে একটি বৃহৎ রুই ফেলে দিয়ে গেল। যা' দেবেন, দেন। প্রতুল বাজার মূল্যই তাকে দিয়েছিল। গুণে গুণে রূপোর টাকা পাঁচটি। নিকারী মিঞা গুণে গুণে ট্যাঁকে গুঁজে তার পাশের গ্রামে তার বাড়ী গিয়ে দেখে—একটি টাকাও নেই। গাঁট কেউ কাটে নি। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বলেছিল·· বাবু! গরীব নিয়ে খেললে, গরীব মরে যাবে। প্রতুল হেসে সেই পাঁচ টাকাই ফের দিয়ে বলেছিল—যাও, আর খোয়া যাবে না। ভাগ্যমতীর খেলায় তো ধোঁকা আর প্রতারণাই সর্বস্ব। প্রতুলের করাতে-কাটা মহিলা এবং তলোয়ারে গলাকাটা ভদ্রলোকদের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। হাতে হাত-কড়া, রেললাইনে শোয়া, প্রতুলের উপর দিয়ে তুফান মেল চলে যায় এমনও শুনেছিলাম। প্রতুল উঠে সকলকে নমস্কার জানায়!

যেদিন ময়দান ফেরৎ সন্ধ্যার সংবাদটি লিপ্টনের বিজ্ঞাপনের পাশে দেখেছিলাম—বিশ্ববিখ্যাত P. C. Sarkar জাপানে দেহত্যাগ করেছেন, সকলে স্তম্ভিত হ'য়েছিল। আমি হই নি। আমার মন বলছিল, মৃতদেহ

শীতল কফিনে জমিনে নামলেই প্রতুল বুক ফুলিয়ে বলিষ্ঠ দেহে দাঁড়িয়ে নমস্কার ঠুকে অগণিত জনতাকে বলবে—না, চিন্তা করবেন না। আমি মরি নি। কিন্তু আমার চিন্তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। প্রতুলকে আর দেখতে পেলাম না।

Vanishing rope-এর উল্লেখ দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তের "মায়াবাদ" প্রসঙ্গে করেছেন। ঘটনাটি তখনকার Englishman পত্রিকায় উঠেছিল।—

কলকাতা ময়দান, সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়া ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। জাদুকর একটা বেশ মজবুত গাঁট গাঁট দড়ি ঊর্ধে ছুঁড়ে দিলে। তার ছেলে তরতর করে বেয়ে উঠে গেল। জাদুকর হাঁকডাক করে, ছেলে নামে না। তখন জাদুকর বেশ ধারালো চকচকে ছোরা কোমরে গুঁজে উঠে যায়। শেষে, উপরে শূন্যে মিলিয়ে যায়। আওয়াজ আসে, মানুষ দেখা যায় না। তারপর অতি বীভৎস দৃশ্য। বাপ গিয়ে ছেলেটাকে টুকরো করে নীচে ফেলতে থাকে। ('দর্শক জন মুদিলা নয়ন'।) তারপর ঐন্দ্রজালিক রক্তাক্ত হাতে মাঠে নামে। সকলে মারতে যায়। সে বলে ঘাবড়াইয়ে মত্। কাপড় দিয়ে টুকরোগুলো ঢেকে ফেলে জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে অবোধ্য সঞ্জীবনী মন্ত্র অবোধ্যতম ভাষায় বলে' কাপড় তোলে। ছেলে হেঁসে সেলাম দেয়, মুখে বলে, জিয়াদা বখশিশ্ চাহি এ।

[ক্রমশ]

অহিংস বিপ্লবের পথে পোল্যাণ্ড ?*

শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়

১৯৮১ সালের ১২ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে সামরিক আইন জারি করে পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক যারুজেল্স্কি যখন পোলিশ শ্রমিকদের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সলিডারিটিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন এবং লেখ্ ভ্যালেসা, তাদেউঝ্ ম্যাজোওয়েস্কি প্রমুখ সলিডারিটির নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করেন, তখন তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে ওই ভাবেই পোল্যাণ্ডে স্বাধীনতার জন আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে চিরদিনের মতো, যেমন ভাবছেন, সম্প্রতি

---

* লোকস্বরাজ পত্রিকার ১ লা অক্টোবর (১৯৮৯) সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।
সম্পাদক, আলেখ্য

চীনের কম্যুনিস্ট কর্তৃপক্ষ, ছাত্রদের গণতন্ত্রের আন্দোলনকে সামরিক আইন জারি ক'রে ও ট্যাংক চালিয়ে সাময়িক ভাবে স্তব্ধ করে দিয়ে। সেদিন অন্তত দুঃস্বপ্নেও ধারুঙ্গেলস্কির মনে এমন সম্ভাবনার উদয় হয় নি যে, একদিন ওই সলিডারিটির অস্তিত্বের বৈধতা স্বীকার করে নিয়ে তার নেতৃবৃন্দের হাতেই দেশের শাসন ভার অর্পণ করতে বাধ্য হতে হবে। গত ২৪শে আগস্ট পোল্যাণ্ডের নব নির্বাচিত পার্লামেণ্ট সেম (Sejm) যখন লেখ ভ্যালেসার প্রধান পরামর্শদাতা সাংবাদিক তাদেউঝ ম্যাজোওয়েস্‌কিকে প্রধান মন্ত্রিত্বের পদে বরণ করে নিল, বিপুল পরিমাণে সমর্থন জানিয়ে (৪৬০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩৭৮ জনই তাকে সমর্থন জানান), তখন সেই অসম্ভাবনীয় ঘটনাই ঘটল।

মার্ক্সবাদীরা মনে করেন ইতিহাস সর্বদাই তাঁদের পক্ষে ; ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির বাস্তবিক যুক্তি নাকি তাঁদের নখ দর্পণে। দেখা গেল, হেগেল যাকে বলেছেন 'cunning of history'—ইতিহাসের ধূর্তি বা ধূর্তামি—তা তাঁদের ধারণার অতীত, কিন্তু ইতিহাসের ধূর্তি বা কৌতুক. যাই বলা হোক—পোল্যাণ্ডের মতো এক কম্যুনিস্ট পার্টি শাসিত দেশে যে, অবশেষে এক অ-কম্যুনিস্ট সরকার গঠিত হতে পারল জনসমর্থনের ভিত্তিতে, তা সত্যই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এটা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, এতদিন ধরে সোভিয়েট রাশিয়া প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির ঐকপত্য অনড় ছিল গায়ের জোরেই ; জনসাধারণের স্বাধীন সম্মতির উপর তার প্রতিষ্ঠা ছিল না। আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিন একদা বলেছিলেন, সোভিয়েট শক্তি দাঁড়িয়ে আছে হিংসা ও মিথ্যার উপর। হিংসার সাহায্যে যারা ক্ষমতা অধিকার করে হিংসার সাহায্যেই তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে হয় ; এবং মিথ্যার সাহায্যেই তাদের সেই হিংসাকে ঢাকতে হয় নিজেদের কর্তৃত্বকে বৈধতা দানের জন্য। কিন্তু গান্ধীজী জানতেন, মিথ্যা ও হিংসার উপর কোনও ব্যবস্থাই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। বলশেভিক বিপ্লবের সত্তর বছর পরে রাশিয়ায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপ ও অন্যান্য যে সব দেশে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা অধিকার করে' সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করে, সেই সব দেশের দিকে তাকালেই গান্ধীজীর এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে।

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ যে অর্থনীতি, তার দুর্বলতা অবশ্য ধরা পড়েছে অনেক দিন আগেই। কিন্তু এতদিন সে কথা স্বীকার করার মতো

নৈতিক সাহস ছিল না ওই সব দেশের কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষের। আর জনসাধারণের স্বাধীন বিচার বুদ্ধিকে কবর দিয়েই তো তার উপর গড়ে উঠেছে কম্যুনিষ্ট টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রের পিরামিড। রবীন্দ্রনাথও ১৯৩০ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে লক্ষ করেছিলেন, ওই দেশে "মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ···ওদিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না, তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে। সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুঁটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়— এ কথাও বোঝে না, জোর ক'রে ঠেসে ঠুসে যদি কোনো এক রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না ; বস্তুত যে পরিমাণে জোর, সেই পরিমাণেই সত্যের অপ্রমাণ।" (রাশিয়ার চিঠি, উপসংহার)। এই মিথ্যা ও হিংসার উপর গড়ে তোলা কম্যুনিষ্ট বা মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে আজ এক অচলায়তনে পরিণত হয়েছে, তা উপলব্ধি করেই সোভিয়েট নেতা গর্বাচভকে রাশিয়ায় পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাস্নসত্-এর কথা বলতে হচ্ছে। পোল্যাণ্ডেও গত এক দশক ধরে যে-আর্থনীতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে, জনচিত্তে তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সলিডারিটির আন্দোলনে।

আসলে এই আর্থনীতিক সংকটের মূলে রয়েছে এক তত্ত্ব, যার মূলকথা, মাও জে দঙ-এর ভাষায়, 'politics in command'—অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি-শাসিত অর্থনীতি। মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসরণ করে' এই রাষ্ট্রনীতি বলে, উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং রাষ্ট্রের উপর শ্রমিক শ্রেণীর তথা তাদের ইতিহাস-নির্দিষ্ট একমাত্র প্রতিনিধি কম্যুনিষ্ট পার্টির, সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে ; তা হলেই নাকি সমাজের উৎপাদিকা শক্তি তথা সৃজনী শক্তির সম্যক্ বিকাশের দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টির সার্বিক অভ্যুদয় হবে। আজ সোভিয়েট রাশিয়া চীন পোল্যাণ্ড হাঙ্গেরি প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট দেশগুলির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করছেন যে তা হয় নি। পার্টির আমলাদের দ্বারা পরিচালিত আর্থিক ব্যবস্থা আজ দ'য়ে মজতে বসেছে ; পোল্যাণ্ডে পার্টির অর্ধেক সভ্য (নয় লক্ষ) কলে কারখানায় ক্ষেতে খামারে মনিবী করেন। উদ্বৃত্ত মূল্য যা সৃষ্ট হয়, তার সিংহভাগ যায় এই পরভৃতিকদের পুষতে। কিন্তু তাতে উৎপাদন বাড়ে না, বরং শিল্পে ও কৃষিতে লোকসান মেটাতে ভরতুকি দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত সরকারকে বিদেশ থেকে প্রচুর ঋণ করতে হয় (বর্তমানে ঋণের পরিমাণ ৩৯০০ কোটি ডলার) আর

সেই ঋণের সুদ গুণতে গিয়ে (বছরে ৩০০ কোটি ডলার) জনসাধারণের অনেক ভোগ্য সামগ্রীর অনটন ঘটে। তাছাড়া ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির (২০০ শতাংশ) ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার অবধি থাকে না। পোল্যাণ্ডের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বাস করে দারিদ্র্য সীমার নিচে। গত সাত বছর ধরে প্রায় পাঁচ লক্ষ পোল্যাণ্ডবাসী বিদেশে (বেশির ভাগই পশ্চিমী দেশগুলিতে) চলে গেছে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশায়। (এই ভাবে, লেনিন-এর ভাষায়, 'পাদ চালনার দ্বারাই'—'with their feet'—তারা পোল্যাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মত জানিয়েছে।) এখন তাদের কথা হল, লেখ, ভ্যালেসার ভাষায়, প্রকৃত সমাজতন্ত্র হল সেটাই, যেখানকার বেকারীতে শস্তায় ভালো রুটি তৈরি হয়,—সেই বেকারী রাষ্ট্রায়ত্ত হবে কি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে, কি সমবায় ভিত্তিক হবে, সেটা বড়ো কথা নয়।

এই আর্থিক পরিস্থিতির চাপ দুঃসহ বোধ হওয়ায় পোল্যাণ্ডের শ্রমিকরা মাঝে মাঝেই বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট দেশে তাদের স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন নেই। সকল গণ-সংগঠনেই পার্টি'র নেতৃত্ব অবশ্যমান্য হওয়ায় শ্রমিকরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে স্বাধীন ভাবে আন্দোলন করতে পারত না। এ জন্যই ন' বছর আগে স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দাবি করেছিল সলিডারিটি, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারও, যেগুলি না হলে পোল্যাণ্ডের আর্থিক সংকট নিরসনের কোনও সম্ভাবনা নেই। সেদিন পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ পার্টি'র বাইরে কোনও স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন মেনে নিতে সম্মত হন নি. এবং সলিডারিটির আন্দোলনকে দমন করতে প্রয়াসী হন সামরিক বলপ্রয়োগ করেই। তাতে পোল্যাণ্ডের আর্থিক সংকট দূর হয় নি, বরং তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। এ বছরের প্রথম দিকে তাই পোল্যাণ্ডে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির দশম চূড়ান্ত অধিবেশনে,—আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফাঁসটা কিয়ৎ পরিমাণে আলগা করে দিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে যতদূর সম্ভব উৎসাহিত করার জন্য।

সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যথাসম্ভব বাজারের অর্থনীতি অনুবর্তন করার দিকে ঝুঁকেছে আজ চীন, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি অনেক সমাজতন্ত্রী দেশই। কিন্তু আপাতত তার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে (বিশেষত খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির মূল্য) কারণ ভরতুকি দিয়ে এই সব সামগ্রীর দাম কৃত্রিম

উপায়ে কমিয়ে রাখার আর সামর্থ্য নেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির। সামাজিক কল্যাণ খাতে ব্যয় সঙ্কোচের ফলে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্য এখন জনসাধারণকেই ব্যয় করতে হবে। তাদের আয় না বাড়লে ব্যয়-বৃদ্ধির বোঝা দুঃসহ হবে, আয় বাড়াতে হলে আপাতত মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে—কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি হতে সময় লাগবে। এই সব কারণে আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কারের দরুণ এখনই জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করতে হলে সরকারকে জনসাধারণের বিশেষ আস্থাভাজন হতে হবে, বিশেষত শ্রমিকদের। এবং তাদের সহযোগিতা ছাড়া উৎপাদন বাড়িয়ে পোল্যাণ্ডের বিদেশী ঋণের পরিমাণ হ্রাস এবং সেই পথে আর্থিক সংকট দূর করার অন্য কোনো পথ নেই। কম্যুনিষ্ট পার্টিই যে শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি, তাদের এই দাবি গত আট বছরে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে, বে-আইনী বলে ঘোষিত সলিডারিটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির দ্বারা ; এই কয় বছরে পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির (PUWP) শ্রমিক সদস্য সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে বিপুলভাবে। এইজন্যই গত এপ্রিল মাসে সলিডারিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে এক চুক্তি সম্পাদিত করতে হয়েছে পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষকে, সলিডারিটিকে স্বতন্ত্র বৈধ শ্রমিক সংগঠন বলে স্বীকার করে নিয়ে। বস্তুত সলিডারিটি এখন শুধু শ্রমিক সংগঠন নয়, পোল্যাণ্ডের বিরোধী জনমতের মুখ্য প্রতিনিধিও বটে। তাই গত ফেব্রুয়ারি মাসেই পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন, যাতে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, জুন মাসেই সংসদে ও সেনেটে সাধারণ নির্বাচন হবে এবং ওই নির্বাচনে সংসদের (Seim) মোট ৪৬০টি আসনের মধ্যে ১৬১টি আসনের (৩৫ শতাংশ) এবং সেনেট-এর সবকটি (১০০টি) আসনের জন্যই অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হবে। (সংসদের ২৭৬টি অর্থাৎ ৬০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকে শাসক কোয়ালিশন-এর জন্য—যার 'প্রধান শরিক' অবশ্য পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি বা কম্যুনিষ্ট পার্টি, এবং অন্য দুই শরিক হল ইউনাইটেড পেজান্টস্ পার্টি বা সংযুক্ত কৃষক দল এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বা গণতান্ত্রিক দল। এ ছাড়াও ২৩টি আসন সংরক্ষিত থাকে 'সেক্যুলার' রোম্যান ক্যাথলিকদের জন্য।) আসন ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে রফা করার সময় কম্যুনিষ্টরা সলিডারিটির নেতাদের আশ্বাস দেয় যে, আগামী চার বছরের জন্য এই বাটোয়ারা মেনে নিলে পরবর্তী নির্বাচনে সংসদের এবং সেনেট-এর

আসনের জন্ত অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করা হবে এবং ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠেয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও হবে অনুরূপভাবে।

কম্যুনিষ্টরা আশা করেছিল, আপাতত চার বছর সংরক্ষিত আসনগুলির জোরে, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে' শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারলে দেশের পরিস্থিতি তারা তাদের আয়ত্তে আনতে পারবে এবং বিরোধিতার পথ একটু খুলে দিলে বিক্ষোভ অনেকটা প্রশমিত হবে ; ফলে চার বছর পরে অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও তারাই আগের মতো ক্ষমতাসীন থাকতে পারবে। তাছাড়া, মস্কো হতে প্রকাশিত নিউ টাইম্‌স পত্রিকায় এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, কম্যুনিষ্ট (PUWP) দলের নেতা সাক্ষাৎকার কালে তাঁকে বলেন, "নিরাপত্তাবাহিনী ও সৈন্তবাহিনী আমাদের হাতে, কাজেই যে কোনও অবস্থা আয়ত্তাধীন রাখার উপায় আমাদের জানা আছে" (নিউ টাইম্‌স্ ২০শ সংখ্যা, মে ১৬-২২, ১৯৮৯)। কিন্তু এত আট-ঘাট বেঁধে শাসন রজ্জু কিছুটা আলগা করে দিতে সম্মত হলেও, গত জুন মাসে যে-নির্বাচন হয়ে গেল তাতে কম্যুনিষ্টদের প্রতি পোল্যাণ্ডের জনসাধারণের অনাস্থাই প্রকট হয়ে উঠেছে। এই নির্বাচনে সলিডারিটি সেনেট-এর ৯৯টি আসনই লাভ করেছে (সংসদে কোনো বিল পাশ হলেও আইনে পরিণত হতে পারবে না সেনেট-এর অনুমোদন ছাড়া) এবং সংসদেও (Sejm) তাদের জন্ত নির্ধারিত সব কটি আসনেও (১৬১) তারা জয়ী হয়েছে। অপর পক্ষে সংসদের সংরক্ষিত আসনগুলির মধ্যে অনেক আসনেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থীরা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে ন্যূনতম ৫০ শতাংশের একটি বেশি ভোট পায় নি ; এদের মধ্যে মিয়েচিস্লাভ রাকাউস্কি, চেশলভ কিশ্চাক প্রমুখ ৩৩ জন নামজাদা নেতাও আছেন। জানা যায় যে গত ১৮ই জুন দ্বিতীয় বার যে ভোট নেওয়া হয় তাতে দু'কোটি সত্তর লক্ষ ভোটদাতাদের প্রায় দুই পঞ্চমাংশই ভোট দিতে যায়নি। তাদের এই অনীহা যে পার্টির জনপ্রিয়তা সূচিত করে না, তা বলাই বাহুল্য। সংরক্ষিত আসনেই যখন এই অবস্থা, তখন সবকটি আসনের জন্ত অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থাকলে পোল্যাণ্ডে কম্যুনিষ্ট পার্টির আজ কী হাল হত তা সহজেই অনুমেয়।

যাইহোক, চুক্তি অনুসারে সংসদের ৬৫ শতাংশ আসন কোয়ালিশনকে ছেড়ে দিয়ে, সলিডারিটি, বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়েও, কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট শাসনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব তাদের পক্ষে অস্বস্তিকর বলে কম্যুনিষ্টরা

সলিডারিটিকেও আহ্বান জানায় কোয়ালিশনে যোগ দিয়ে এক সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠন করার জন্য। সলিডারিটি অবশ্য তাদের সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। ইতিমধ্যে কোয়ালিশন-এর অন্য দুই শরিক দল জনমত কোনদিকে ঝুঁকেছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েই কম্যুনিষ্টদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, কম্যুনিষ্টদের প্রতি এই দুটি দল অনেকদিন থেকেই অপ্রসন্ন, কারণ তাদের প্রতি কম্যুনিষ্টদের মনোভাব অবজ্ঞাসূচক, (যেমন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট-এর অন্য শরিক দলগুলি সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের মনোভাব। এবং এটা স্বয়ং যারুজেলস্কিও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এতদিনে আমরা ওই শরিক দলগুলিকে আমাদের অনুচর বলেই মনে করতাম এবং আমরা সকল বিষয়ে আগে সিদ্ধান্ত নিয়েই তাদের সামনে উপস্থিত হতাম। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কাজ হত তার জন্য অবশ্য দায়িত্বের ভাগী হতে হত তাদেরও।" (নিউ টাইমস্, ১০/৮৯)। শরিক দল দুটির সমর্থন হারানোর ফলে চেশলভ কিশ্চাক-কে প্রধানমন্ত্রী করে কম্যুনিষ্টদের মন্ত্রীসভা গঠনের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হল। কয়েকদিনের মধ্যেই তাই পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি যারুজেলস্কিকে বাধ্য হয়ে সলিডারিটির নেতা তাদেউষ ম্যাজোওয়েসকিকে ডাকতে হয় সরকার গঠনের জন্য। অবশেষে এক কম্যুনিষ্ট-পার্টিশাসিত দেশে অকম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হতে পারল দেখে সলিডারিটির এক নেতা বলেছেন, 'এর দ্বারা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী—এই বাতিল হয়ে যাওয়া তত্ত্বের শবাধারে সুনিশ্চিতভাবেই শেষ পেরেকটি ঠোকা হল।'

অবশ্য তত্ত্বটাকে কবরে দিলেও তার ভূতের কবল থেকে অব্যাহতি সহজে মিলবে বলে মনে হয় না। সলিডারিটির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলেও এই সরকার কার্যত এক সর্বদলীয় সরকারই, এবং এতে প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর কম্যুনিষ্টদের হাতেই থাকছে। লেখ ভ্যালেসাই এই ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছেন, কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সংঘর্ষের পথ পরিহার করে' সকল দলের সহযোগিতায় পোল্যাণ্ডকে গত এক দশকের গভীর সঙ্কট থেকে মুক্ত করার আশায়। সংসদ বিপুল ভোটে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করে নেবার পর, ম্যাজোওয়েসকি কম্যুনিষ্ট সদস্যদের করমর্দন করে বলেন, "বিরোধীপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য সংগ্রামের নীতি ছেড়ে এখন সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। নয় তো আমরা এক টোটালিটারিয়ান ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রে উপনীত

হতে পারব না। (ষ্টেটস্‌ম্যান, ২৬শে আগষ্ট)। সলিডারিটির নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার সুমহতী ইচ্ছাকে সফল বা ব্যর্থ করার দায়িত্ব এখন কম্যুনিষ্টদের। মনে রাখা ভালো, বিগত সংসদে পোল্যাণ্ডের সংবিধানের যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়, সেগুলির দ্বারা রাষ্ট্রপতির হাতে অনেক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে। তিনি কেবল সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রতিরক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যানই নন, বিদেশে পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁরই। দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপরেই সমর্পিত। তিনি আবশ্যক মনে করলে সংসদে প্রণীত যে কোনও আইনকে বাতিল করতে পারেন এবং বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে উভয় পরিষদ দ্বারা গঠিত পার্লামেণ্টকে ভেঙে দিতে ও দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এই নির্বাচনে পোল্যাণ্ডের জনসাধারণ সলিডারিটির প্রতি তাদের প্রগাঢ় আস্থা জ্ঞাপন করেছে বটে, কিন্তু আর্থিক সঙ্কটজনিত তাদের দুঃখ দুর্দশার আশু লাঘব না হলে (আগেই বলেছি, সেই সম্ভাবনা কম) অস্থিরমতি জনগণের সেই আস্থা বিচলিত হতে বিলম্ব হবে না। এবং তখন জনসাধারণের কাছে সলিডারিটিকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের ক্ষীয়মাণ কর্তৃত্বের পুনরুদ্ধারের লোভ সংবরণ করবে কম্যুনিষ্টরা, তাদের হৃদয়ের এতখানি পরিবর্তন এখনই আশা করা চলে না। তবে লেখ ভ্যালেসা মনে করেন, 'কম্যুনিষ্টদের মধ্যে আন্তরিক পরিবর্তন না হলে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই'; এবং গত আট বছরের অভিজ্ঞতা থেকে কম্যুনিষ্টদের অন্তত এটা বোঝা উচিত যে কেবলমাত্র নিরাপত্তাবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে দেশে শান্তি রক্ষা করতে হলে তাতে করে বর্তমানের এই গভীর আর্থিক সঙ্কট থেকে পোল্যাণ্ড পরিত্রাণ পাবে না।

পোল্যাণ্ডের নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ম্যাজোওয়েসকি বলেছেন, "আমরা ইতিহাসের এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছি। আমাদের দ্বারা গঠিত সরকারের আয়ু যদি কয়েক মাসের বেশি না-ও হয় তবুও এ এক বিরাট সাফল্য।" তিনি জানেন, সমস্যাকণ্টকিত পোলাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করে তিনি কাঁটার মুকুট মাথায় তুলে নিয়েছেন; তিনি বলেছেন, "সরকার গঠন করা তত কঠিন কাজ নয়, যতটা কঠিন হল সরকারের পক্ষে কাজ করতে পারার মতো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।" তবে ম্যাজোওয়েসকি রোমান ক্যাথলিক, তিনি গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী; তাই বিশ্বাস করেন যে,

যে-পতাকা ঈশ্বর তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন, তাকে বহন করার শক্তিও তিনিই দেবেন। পোল্যাণ্ডের তিন কোটি আশি লক্ষ অধিবাসীর অধিকাংশই (৯৭ শতাংশ) রোম্যান ক্যাথলিক, ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের জোরেই তারা এতদিন মনুষ্যত্ব-বিনাশী, চিৎপ্রধর্ষী কম্যুনিজম্-এর করাল গ্রাস থেকে নিজেদের আধ্যাত্মিক সত্তা, জাতিক সত্তাকে রক্ষা করতে পেরেছে, পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্চ-এর আশ্রয়ে। সলিডারিটির সংগ্রামে পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্চ-এর ভূমিকা সুবিদিত। যীশুর মঙ্গলবার্তার মর্ম অনুসারে পোল্যাণ্ডে মানবিক অধিকার রক্ষার জন্যই চার্চ সলিডারিটির আন্দোলনকে সমর্থন করেছে, এবং প্রাগুক্ত সোভিয়েট সাংবাদিকের ভাষায়, "The Church has assumed the role it is intended for by its very nature···to take the persecuted and the humiliated under its wing"—নির্যাতিত অবমানিত মানুষকে তার পক্ষপুটে গ্রহণ করে পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্চ তার প্রকৃত ভূমিকাই পালন করেছে। ১৯৮১ সালের শেষে যখন পোল্যাণ্ড-এর রাষ্ট্রশক্তি তার সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সলিডারিটির বিদ্রোহী শ্রমিকদের উপর, তখন চার্চ এর আর্চবিশপ যোসেফ গ্লেম্প তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "Christ hanging on the Cross forgave all his oppressors, all the villains who flogged and crucified Him. This is our Christian way, our difficult way."—'ক্রুশবিদ্ধ যীশু ক্ষমা করেছিলেন তাঁর যন্ত্রণাদাতাদের; এই হল খ্রীষ্টীয় পথ, আমাদের দুর্গম পথ।' শত্রুকে ক্ষমা করার, তাকে ভালবাসার দুর্গম পথেই,—আত্মার সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে, নির্ভয় হয়ে, সলিডারিটির অহিংস সংগ্রাম আজ অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে' নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই আধ্যাত্মিক পথ থেকে বিচলিত না হলে, আশা করি, ম্যাজোওয়েসকির সরকার যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে সলিডারিটি।

ওই সোভিয়েট সাংবাদিক বলেছেন, "এক টোটালিটারিয়ান গঠন-বিন্যাসের ভিতর থেকে এক অনেকান্তবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণ হয় ক্রমে ক্রমে, তা রাতারাতি হয় না। তবে যে-সব সংস্কার সাধিত হচ্ছে তাদের সামাজিক ভিত্তিই হচ্ছে অনেকান্তবাদ বা বহুত্ববাদ। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এক মুক্ত পরিবেশই যে আর্থিক প্রগতির সহায়ক, একথা আজ সোভিয়েট রাশিয়াতেও গরবাচভ-এর পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্ত-এর জন্য উদ্যোগের দ্বারাই স্বীকৃত। বস্তুত

সোভিটে রাশিয়ায় এই নতুন রাজনৈতিক চিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা [না হলে পোল্যাণ্ডে আজ পালাবদল হতে পারত কি না সন্দেহ। লায়নেল ট্রিলিং একদা ঠিকই বলেছিলেন যে, "The question of Polish freedom is to be answered in Russia'—পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নের উত্তর রাশিয়া থেকেই আসতে হবে ('The Broken Mirror' গ্রন্থের ভূমিকা)। আপাতত মনে রাখা ভালো যে, গরবাচভ এখনও কম্যুনিস্ট পার্টির guiding role বা নেতৃত্বের ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন; সোভিয়েট রাশিয়ায় অনেকান্তবাদ এখনও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পায় নি।

আপাতত আর্থিক ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্যই প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্কারের সহায়করূপে সমাজে কিছু পরিমাণে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার কথা ভাবছেন, সোভিয়েট রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট কর্তৃকপক্ষ। কিন্তু এতো বাহ্য। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন একমাত্র লক্ষ্য হলে স্বাধীনতার প্রশ্ন গৌণ হয়ে যায়। মানুষের স্বাধীনতাকে কেবল আর্থিক বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই মানুষের স্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছে, ধনতান্ত্রিক ও কম্যুনিষ্ট উভয় ব্যবস্থাতেই। বস্তুত উভয় ব্যবস্থাই গড়ে উঠেছে এই ধারণার উপর যে, বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধিই মানুষের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পর্কে শ্রদ্ধা রেখে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে হলে, অন্ততঃ এক রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে, যা আমরা পাই গান্ধীজীর চিন্তায়। গরবাচভ-এর নতুন রাজনৈতিক চিন্তায় এখানো তার ইঙ্গিত নেই। পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য থেকে যদি নতুনতর এক সমাজ ও রাষ্ট্র-দর্শনের উদ্ভব হয়, যা দেখাবে কেমন করে ব্যক্তি, পরবশ না হয়ে, স্বাধীনভাবে যুক্ত হতে পারবে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে, আসক্তিহীন কর্মের দ্বারা, নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা, ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা, তাহলেই সলিডারিটির অহিংস সংগ্রাম সার্থক হবে। এ যুগের সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব ঘটবে পোল্যাণ্ডে।

জঁা রাসিন

তীর্থরেণু দাস

আমাদের এদেশে—কেবল বাংলাতেই নয়, সারা ভারতের পক্ষেই এটা সত্য যে,—শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি বলতে আমরা বুঝি শেক্‌স্‌পীয়রের বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকৃতিগুলি : হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, কিংলীয়র ইত্যাদি। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যে, ট্র্যাজেডিনাট্যের তুলনীয় আর কোনো উৎকর্ষস্থল আমরা জানিনা। অবশ্য, মহান্ গ্রীক নাট্যকারত্রয়ীর—এস্কিলস্, সফোক্লেস, ইউরিপিদিস-এর—কিছু কিছু অত্যুৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডির কথা আমরা অনেকে পড়েছি। ইংরাজি অনুবাদে কেউ কেউ সে নাটক পড়েওছি। এবং পড়ে তাদের বহুখ্যাত মহত্ত্বের কিছু আভাস ও উপলব্ধি করেছি, হয়তো। কিন্তু তবু বিশ্বসাহিত্যে—আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে তো বটেই—মহৎ নাটকের নিদর্শন বলতে আমরা শেক্‌সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাট্যরাজিকেই স্মরণ করি, নির্দেশও করে থাকি।

অথচ, তুলনীয় মহৎ নাটকের দৃষ্টান্তস্থল যে ফরাসী সাহিত্যেই আছে, সেখবর কেউই প্রায় রাখি না। কিন্তু কোনো শিক্ষিত ফরাসীকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কাকে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিকার বলে মনে করেন, তিনি নির্দ্বিধায় নাম করবেন—শেক্‌স্‌পীয়রের নয়,—জঁা রাসিন-এর। রাসিনের এ্যাণ্ড্রোম্যাকি ও ফেইড্রা নাকি ট্র্যাজেডির পরোৎকর্ষ। কে এই রাসিন, এবং কেনই বা তাঁকে ফরাসীরা সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাট্যকার মনে করেন?

রাসিন ফরাসী সাহিত্যের স্বর্ণযুগের ফসল। ইংরাজী সাহিত্যে যেমন এলিজাবেথীয় যুগকে সেই সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়, তেমনি 'রোয়া সলেইল' (Roi Soleil) বা 'সূর্যসঙ্কাশ' ফরাসী সম্রাট, চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছরকেই ফরাসী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধই সে-যুগ। এই যুগেই নাটকে কর্নেই (Corneille), রাসিন (Jean Racine) ও মলিয়েরের (Moliere) অভ্যুদয়। ট্র্যাজেডিতে কর্নেই ও রাসিন এবং কমেডি-নাট্যে মলিয়ের, তাঁদের অতুলনীয় প্রতিভায় স্বর্ণাক্ষর রাখেন এই যুগেই। আমাদের শিক্ষিত মহল বিশ্ববিশ্রুত কমেডিনাট্যকার মলিয়ের-এর নামের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। উনিশ শতকেই তাঁর কয়েকটি নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। এখনো তাঁর নাটকের নতুন নতুন অনুবাদ হচ্ছে।

কিন্তু কর্নেই ও রাসিনের কোনো নাটকের বাংলায় অনুবাদ ঘটেছে বলে জানি না। তাঁদের নামের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় অতি যৎসামান্য। এটা অবশ্যই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

কর্নেই রাসিনের অগ্রজ নাট্যকার। রাসিনের প্রথম নাটক La Thebaide (The Thebaide)-এর আঠার বছর আগেই (১৬৩৬) কর্নেই-এর যুগান্তকারী নাটক Le Cid (The Cid) মঞ্চস্থ হয় এবং এক নূতন নাট্যধারার সূত্রপাত করে। Neo-Classical বা নব্যক্লপদী নাট্যরীতির প্রথম বিজয়ভেরী Le Cid। ক্লপদী গ্রীক নাট্যরীতির বিধিবিধান নিয়ম-কানুন সর্বাংশে মেনে নাট্য রচনার এই প্রথম সফল প্রয়াস। কর্নেই-এর শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি Horace, Cinna ও Polyeucte এর রচনাকাল ১৬৪৩ এর মধ্যে—যখন রাসিনের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। দীর্ঘজীবী কর্নেই ১৬৮৪ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং রাসিন যখন সৃষ্টিশীলতা ও খ্যাতির মধ্য গগনে, তখনো তিনি নাট্য রচনায় ব্যাপৃত এবং রাসিনের প্রতিযোগী নাট্যকার। কর্নেই-এর শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলি যে সব বৈশিষ্ট্যের জন্য খ্যাত, তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখ্য, তাঁর নাটকীয় কথাবস্তু ও চরিত্র চিত্রণে মহৎ ভাব, ও আদর্শের রূপায়ণ। নায়ক নায়িকার চিত্তে আদর্শের সঙ্কট এবং প্রতিকূল ঘটনাবর্তের মধ্যে সেই আদর্শ রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে উচ্ছ্রিত বেদনার উত্তুঙ্গ মহিমা—কর্নেই-এর শ্রেষ্ঠ নাটককগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ। যেমন, The Cid নাটকে নায়ক রোডেরিগ (Roderigue) ও নায়িকা শিমেন (Shimene) দুই বিপরীত আদর্শের দ্বন্দ্বে সঙ্কটাপন্ন। সেই বিপরীত আদর্শ দুটি হোল, আত্মমর্যাদা ও প্রেম। তাদের সঙ্কটের উদ্ভব ঘটে, যখন নায়িকা শিমেনের পিতা ডন গোমেজ রোডেরিগের পিতাকে অপমান ও আঘাত করেন। রোডেরিগের আত্মসম্মান ও প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—আত্মসম্মান দাবি করে যে, সে পিতৃ অপমানকারী ডন গোমেজকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান ক'রে উচিৎ শিক্ষা দেয়—যদিও এর ফলে শিমেনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু প্রেমের দাবির উপরে আত্মসম্মানের দাবিই জয়ী হোল এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে রোডেরিগের হাতে শিমেনের পিতা ডন গোমেজ নিহত হলেন। এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ পিতৃহন্তা রোডেরিগ ও শিমেনের মধ্যে অনুত্তরণীয় ব্যবধান সৃষ্টি হোল। কেবল ব্যবধান নয়, শিমেনের আত্মসম্মান ও বংশমর্যাদা দাবি করলো যে রোডেরিগকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এই অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ। রোডেরিগ দেশ ছেড়ে প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়ে মাতৃভূমি স্পেন আক্রমণকারী বিধর্মী মুরদের

বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে লাগল এবং সেই সফল নেতৃত্ব তাকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিল। কিন্তু শিমেন,—যে তখনও তাকে ভালবাসে—তবুও তাকে ক্ষমা বা গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ। তার আহত আত্মসম্মানের দাবি তখনও পূর্ণ হয়নি। সে তার পাণিপ্রার্থী এক যোদ্ধা ডন সাঞ্চেকে প্ররোচিত করল, তার আহত আত্মসম্মানের উদ্ধার কল্পে রোডেরিগকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করতে। এবং প্রতিশ্রুতি দিল, এ দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে বিজয়ী হবে তাকেই সে বরমাল্য দেবে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোল, কিন্তু রোডেরিগই বিজয়ী হোল। এইভাবে শিমেনের আত্মমর্যাদার পুনরুদ্ধার ঘটলো—স্বীয় প্রেমিককে মৃত্যু-সম্ভাবনাময় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রেরণ করে'। এরপর আর রোডেরিগকে গ্রহণে তার আর আপত্তির কারণ রইলো না। পিতৃশোকের নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হলেই সে ও রোডেরিগ বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হবে, স্থির হোল।

এ নাটকে দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। নায়ক নায়িকার চরিত্র ও হৃদয় এ সংঘাতের রঙ্গভূমি এবং বাইরের ঘটনার উৎসও মানবচরিত্রের মধ্যেই নিহিত। কর্নেই যেভাবে এই প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বসঙ্কুল ঘটনাবৃত্তকে এক সুন্দর নাটকীয় সংহতি ও সুমিতি দান করেছেন এবং ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পাদন করেছেন এ নাটকে, তা তাঁর অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন। তাঁর নাটকের অপর বৈশিষ্ট্য তার উচ্ছল উদ্বেল বিপুলপ্রবাহ ভাষার সৌন্দর্য। এ-দুয়ের সমবায়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলি ফরাসী সাহিত্যের নব্যক্লাসিক রীতির—তথা সমগ্র নাট্যসাহিত্যের—মহৎ সম্পদ হয়ে উঠেছে।

রাসিন (১৬৩৯-১৬৯৯) যখন নাট্যসৃষ্টির প্রাঙ্গনে নব আগন্তুক, তখন কর্নেই-এর প্রভাব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সীমা পরিসীমা নেই। নব্যক্লাসিক রীতির পরোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল রূপে কর্নেই-এর নাটকগুলি সর্বজন স্বীকৃত। সেইকালে ও সেই আবহে আপন নাট্যকৃতি দ্বারা কর্নেই-র সুবিপুল খ্যাতিকে ম্লান করে দেওয়া নিশ্চয়ই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু ১৬৬৪তে যখন রাসিনের প্রথম নাটক La Thebaide (The Thebaide) অভিনীত হোল, তা যে কেবল তরুণ সম্রাট চতুর্দশ লুই-এরই প্রশংসা অর্জন করলো তাই নয়, বিদগ্ধ নাট্য রসিকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁরা এর মধ্যে এক নূতন সুর যেন শুনতে পেলেন। সে-সুর এক নবতন ট্র্যাজিক বেদনার, নূতনতর এক ট্র্যাজিক রসের। এতে কোনো আদর্শের মহৎ চিত্রায়ণ নেই, নেই চারিত্র শক্তির বৈজয়ন্তী : তদ্বিপরীতে আছে, আবেগতাড়িত মানুষের ভয়ঙ্কর

সর্বনাশের ছবি। মানুষের মহত্ত্ব এর উপজীব্য নয়, তার সান্ত্বনাহীন ভয়ঙ্কর নিয়তিই এখানে নির্মম রেখায় ব্যঞ্জিত।

জঁা রাসিন জন্মেছিলেন এক ধর্মপ্রাণ—'জ্যানসেনিষ্ট' *পরিবারে এবং তাঁর লেখাপড়া শিক্ষাদীক্ষা সবই ঘটে পিউরিট্যান জ্যানসেনিষ্ট পরিচালিত স্কুলে ও কলেজ ঈ বোভ্যেই এবং পোর্ত্ত রোয়্যাল (Port Royal)-এ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান 'জ্যানসেনিষ্ট' শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। এই শিক্ষার নৈতিক ফল যাই হোক, রাসিনের ঘটেছিল গ্রীকসাহিত্যে গভীর প্রবেশ ও অনুরাগ। যে নিও-ক্লাসিক্যাল, বা নব্যক্রপদী নাট্যরীতি দ্বারা ফরাসী নাটক তখন শাসিত ছিল, তার উৎস ছিল গ্রীক নাটকে, এস্কিলস, সফোক্লেস ও ইউরিপিদিসের নাট্যরাজিতে এবং এ্যারিষ্টটলের পোয়েটিক্স্-এ। ফ্রান্সে তখন গ্রীক সাহিত্যের পঠন পাঠন এক পোর্ত্ত রোয়্যাল ছাড়া অন্যত্র খুব একটা গুরুত্ব পেত না। তাই পোর্ত্ত রোয়্যালে শিক্ষা রাসিনের পক্ষে এদিক দিয়ে অর্থাৎ গ্রীক ক্রপদী নাটক ও নাট্যরীতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটার দিক দিয়ে, খুবই লাভজনক হয়েছিল।

গ্রীক নাটকে অনুসৃত বিধি নিষেধ—স্থান-কাল-ঘটনাবৃত্তের ঐক্যবিধি যার মধ্যে সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে কষ্টকর অনুশাসন—কর্নেই-এর পক্ষে সর্বদা সুখকর না হলেও, রাসিনের কাছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই সহজ হয়ে গিয়েছিল ; এমন কি, ক্ল্যাসিক নাট্যরীতির অনুশাসন গ্রীক নাটকের চেয়েও রাসিনের নাটকে অধিকতর মান্যতাপ্রাপ্ত বলেই মনে হয়।

রাসিনের নাটকে ঘটনার কাল-সীমা কোথাও দিবাভাগ বা দিনের বারো ঘণ্টার বেশী নয়। এবং স্থানিক ঐক্য অধিকাংশতই রাজপ্রাসাদের কক্ষ-প্রাচীরের মধ্যেই নিবদ্ধ। কাহিনীর ঐক্যও অখণ্ড : কয়েকটি চরিত্রের সূত্রে গাঁথা একটি তীব্রগতি বিয়োগান্ত পরিণাম। অন্য কোনো উপকাহিনীর স্থান নেই, অন্য কোনো রসেরও অনুপ্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ। একেবারে একমুখী অনিবার্য সমাধান। ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানেরও কোনো ইঙ্গিত নেই, নেই

• রোমান ক্যাথলিক বিশপ Cornelius Jansen (১৫৮৫-১৬৩৮)-এর মতবাদী। এই মত অনুযায়ী, ব্যক্তির freedom of will বা ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয়েছে ; এবং বলা হয়েছে যে, কেবল অল্প কয়েকজনেরই পারলৌকিক মুক্তি, ঈশ্বর দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট —সকলের নয়। যীশুখ্রীষ্ট সব মানুষের মুক্তি সুনিশ্চিত করেন নি। ফলকথা, এ মত কঠোর নীতিবাদী মানসিকতার জন্ম দেয়।

কোনো সান্ত্বনা—পাপের শাস্তি ও পুণ্যের জয়ের আভাসও কোথাও নেই। এ এক ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডির জগৎ, যে-জগৎ আমার তোমার সকলের পক্ষেই সত্য। কবি Meredith যেমন বলেছেন: In tragic life, God wot, No villain need be! Passions spin the plot: We are betrayed by what is false within.

তাঁর তৃতীয় নাটক এ্যাণ্ড্রোম্যাকি (Andromache)-তেই রাসিনের নাট্যপ্রতিভা সমস্ত প্যারিস নগরীর স্বীকৃতি লাভ করে। এবং কর্নেই-এর নাটক অপেক্ষা তাঁর ট্র্যাজেডির ট্র্যাজিক বিভব বা তীব্রতা যে অনেক বেশী এবং অনেক বেশী মর্মস্পর্শী, তাও বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। বলা বাহুল্য, এতে কর্নেই মোটেই খুশী হননি এবং তাঁর বন্ধুবর্গও রাসিনের নাটকের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। এছাড়া প্রতিভাহীন নাট্যকাররাও রাসিনের এই সাফল্যে ঈর্ষায় অস্থির হয়ে নিন্দার রোল তোলে। কবিশিল্পীরা সাধারণতঃ একটু বেশী সূক্ষ্মবেদী হন, রাসিনও তাই ছিলেন। স্তুতি-প্রশংসায় আনন্দিত হলেও নিন্দা-সমালোচনায় অত্যন্ত আহত হতেন। তবে সম্রাট চতুর্দশ লুই ছিলেন রাসিনের পৃষ্ঠপোষক এবং তখনকার দিনে রাজানুগ্রহ ছিল সব সম্মান ও সাফল্যের উৎস। রাসিন এর পরের দশ বছরে সাতটি নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেন, যার মধ্যে একটিই (Les Plaideurs) কমেডি—তাঁর একমাত্র কমেডি—এছাড়া আর সব কয়টিই ট্র্যাজেডি। এই দশকের (১৬৬৭-১৬৭৭) শেষ নাটক ফেইড্রা (Phaedra)-ই রাসিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-নাট্য বলে প্রায় সর্বস্বীকৃত। ঐ একই বিষয়বস্তু নিয়ে ইউরিপিদিসের বহুখ্যাত নাটক 'হিপোলাইটাস' অপেক্ষা রাসিনের এ-ট্র্যাজেডি অধিকতর মর্মস্পর্শী ও ট্র্যাজিকরসে উজ্জ্বল বলে' অনেকে মনে ক'রে থাকেন।

এরপরের বারো বছর রাসিন আর কোনো নাটক লেখেননি। তাঁর জীবনের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। তিনি অনুতাপ প্রকাশ ক'রে জ্যানসেনিষ্ট বিশ্বাসের আশ্রয়ে আবার ফিরে যান। বাইবেলের সেই 'প্রডিগ্যাল সানে'র কাহিনী। জ্যানসেনিষ্টদের চোখে যা সবচেয়ে দুর্নীতির আখড়া, সেই রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের জগৎ থেকে অনুতপ্ত রাসিন ফিরে এলেন তাঁর শৈশবদীক্ষার সুনিশ্চিত স্বচ্ছন্দ জগতে, এবং ৩৯ বছর বয়সে, একটি সদ্যঃশজাতা জ্যানসেনিষ্ট কন্যাকে বিবাহ করে সংসারী হলেন। শোনা যায় তাঁর স্ত্রী নাকি তাঁর একটিও 'দুর্নীতিলাঞ্ছিত' নাটকের একটি পংক্তিও পড়েন নি। তবে এই স্ত্রীকে নিয়ে রাসিন সুখী পরিবারিক জীবন যাপন

করেন, এবং সাতটি সন্তানের জনক হন। সম্রাট এখনো তাঁকে আনুকূল্য ক'রে চলেন—তাঁকে Royal Historiographer বা রাজকীয় ইতিহাস লেখকের উচ্চবেতন ও মর্যাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই বারো বছর কেবল নাট্যরচনাই নয়, সর্বপ্রকার সাহিত্যকর্ম থেকে, রাসিন নিজেকে দূরে রাখেন। কিন্তু তাঁর নাট্যপ্রতিভা যে তখনো অম্লান তার পরিচয়ও পাওয়া গেল। সম্রাটের অনুরাগধন্যা মাদাম দ্য মেয়েঁৎনঁ (Mme. de Maintenon) একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, ভদ্রগৃহস্থ-কন্যাদের শিক্ষাদানকল্পে, St. Cyr-এ। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিনয়যোগ্য একটি নাটক লিখতে মাদাম তাঁকে অনুরোধ করেন। রাসিন সম্মত হন এবং বাইবেলের কাহিনী নিয়ে লেখেন Esther। নাটকটি বিদগ্ধ সমাজে উচ্চপ্রশংসিত হয় এবং মাদামের অনুরোধে রাসিন পরের বছর (১৬৯০) আরেকখানি বাইবেল-সম্বন্ধী কথাবস্তু নিয়ে নাটক রচনা করেন—Athalie. অনেকের মতে Athalie রাসিনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি। তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবু Athalie যে ট্র্যাজেডি হিসাবে অসামান্য তাতে সন্দেহ নাই। এই শেষ দু'খানি সম্পূর্ণ ধর্মকেন্দ্রিক নাটকে রাসিন গ্রীক নাটকের অনুসরণে 'কোরাস' সংযোজিত করেন। তাঁর আগের কোনো নাটকেই কোরাসের উপস্থিতি নেই। তার স্থলে পাই, নায়ক-নায়িকার প্রত্যেকের এক একটি ক'রে confidant বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সহচরী, যাদের কাছে নায়ক নায়িকা আপন অন্তরকে উদ্ঘাটিত করে, যারা তাদের পরামর্শ দেয়, সাবধান করে এবং প্রায় সর্বক্ষণ তাদের পাশেপাশে থাকে। এই অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর চরিত্র নব্য গ্রুপদী নাটকে কোরাসের মতোই নাটকীয় ঘটনা সম্পর্কে তাদের মতামত, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি ব্যক্ত করে। রাসিন তাঁর দশটি ট্র্যাজেডির মধ্যে মাত্র এই শেষ দুখানিতেই কোরাসের ভূমিকার গ্রুপদী ব্যবহার করেছেন। অবশ্যই নাটকীয় প্রয়োজনেই করেছেন : ধর্মকেন্দ্রিক নাটকে কোরাসের মুখে ঈশ্বরের প্রতি আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত করার অবকাশ ছিল ; নাটকের ধর্মীয় আবহের নিবিড়তা এরদ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

রাসিনের জীবনে, তাঁর ৩৯ বছর বয়সে, এবং নাট্যকাররূপে সাফল্যের তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়ে, কেন, কী কারণে এই ধর্মবিপ্লব ঘটলো, সে নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। অনেকে বলেন যে, প্রণয়ঘটিত তীব্র মর্মবেদনা ও হতাশাই এই বৈপ্লবিক প্রত্যাবর্তনের মূলে। রাসিনের প্রণয়-জীবন নিয়ে নানা কাহিনী ফরাসী রঙ্গ জগতে ভাসমান। তাঁর সমকালীনরাও তাঁদের স্মৃতিকথায়

কিছু কিছু আভাসও দিয়ে গেছেন ; কিন্তু রাসিনের অন্তর্জীবন ও অন্তরঙ্গ জীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানবার উপায় নেই। রাসিন তাঁর কোনো ডায়েরী বা চিঠিপত্র কিছুই রেখে যাননি। তাঁর বংশধররাও, হয়তো তাঁর শেষ জীবনের ধর্মপরায়ণ আদর্শনিষ্ঠ গৃহস্থের ভাবমূর্তি অম্লান রাখার জন্যই, তাঁর সব চিঠিপত্র ডায়েরী ইত্যাদি একেবারে নিঃশেষে নষ্ট করে ফেলেছেন। ফলে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না—কীভাবে তাঁর জীবনে এই আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটে।

সে যাই হোক, রাসিনের নাটকের ট্রাজিক রসের বৈশিষ্ট্যের কথায় আসা যাক। রাসিনীয় ট্রাজিক রস, কর্ণেই'র নাটকের ট্রাজিক রসের চেয়ে ভিন্নতর। শুধু ভিন্নতরই নয়, অনেক বেশী তীব্র বিদাহী। রাসিনের নাটকে আদর্শের সংঘাত নেই। মানবিক মহত্ত্বের আভাষও লক্ষণীয় নয়। চরিত্রগুলি অবশ্য বড়-মাপের ; গ্রীক পুরাণ এবং দূরকালের ইতিহাস থেকে আহরিত। এবং সবই রাজন্যকুলের। কিন্তু নাটকীয় ঘটনাবৃত্তের মধ্যে তারা প্রত্যেকেই সুতীব্র চিত্তপ্রক্ষোভ দ্বারা আলোড়িত ; হৃদয়-সমুখ ঝড়ের মুখে অবশ নাবিকের মতো আত্মসমর্পিত ; তারা সকলেই রিপু-পরবশ, এবং সে-রিপু অধিকাংশতই প্রথম রিপু। রিপুপারবশ্যতা আনে মোহান্ধতা এবং শুভাশুভ-বিবেকহীনতা। রাসিনের নাটকের কেন্দ্রে আছে, এই অন্ধ আবেগের প্রলয় তাড়না, যা নিয়তির মতো ঘটনা তথা চরিত্রকে সর্বনাশের দিকে আকর্ষণ করে চলে।

এ্যাণ্ড্রোম্যাকি (Andromache) নাটকটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। এ নাটকে প্রধান চরিত্র চারটি, পিরাস, এ্যাণ্ড্রোম্যাকি, হারমিয়োনি এবং অরেষ্টিস। পিরাস হলেন ট্রয় যুদ্ধের গ্রীকবীরচূড়ামণি অ্যাকিলিসের পুত্র। তিনি নিজেও ট্রয় নগরীর ধ্বংস সাধনে অন্যতম প্রধান নায়ক। ট্রয় যুদ্ধের শেষে, হেক্টর-পত্নী এ্যাণ্ড্রোম্যাকিকে পিরাস আপন বীর্যভোগ্যা দাসীরূপে লাভ করে। কিন্তু লাভ করে' নিজেই বন্দিনীর প্রেমপাশে বন্দী হয়ে পড়ে। কিন্তু এ্যাণ্ড্রোম্যাকি মৃতস্বামী বীরশ্রেষ্ঠ হেক্টরের পবিত্র স্মৃতির প্রতি একান্ত আত্মউৎসর্গিতা—তার পক্ষে অন্যতম স্বামীর চিন্তাই অসহ্য। তবে প্রেমান্ধ পিরাস তাতে নিবৃত্ত হবার নয়, সে কেবলই অনুনয় ও ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। ভীতি প্রদর্শনের সহজ উপায় ছিল, হেক্টরের শিশু পুত্রকে—মায়ের সঙ্গে সেও ছিল পিরাসের বন্দী.—মৃত্যুমুখে নিক্ষেপের সঙ্কল্প ঘোষণা। পুত্রগত প্রাণ এণ্ড্রোম্যাকির পক্ষে সে-সম্ভাবনা প্রাণঘাতী। সে তখন একটু নরম হয়। কিন্তু বিবাহে রাজী হয় না কিছুতেই। এদিকে হেলেন আর মেনেলসের

কন্যা হারমিয়োনি ছিল পিরাসের বাগদত্তা। সে পিরাসের রাজ্য এপিরাসে এসেছিল পিরাসের সঙ্গে বিবাহিত হবে এই আশ্বাসে ও আমন্ত্রণে। অধিকন্তু মনে মনে সে পিরাসের প্রেমে অন্ধও। পিরাস যে, বাগদত্তা তার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে—হেক্টর-পত্নী এ্যাণ্ড্রোম্যাকির প্রেমে আত্মবিক্রীত, এজন্যে ঈর্ষা ও অপমানবোধ হারমিয়োনিকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। এমন সময়—গ্রীসের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি হয়ে সেখানে এল অরেষ্টিস (এ্যাগামেমননের পুত্র) পিরাসের কাছ থেকে হেক্টরের শিশুপুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য—কারণ হেক্টরের মতো ভয়ঙ্কর শত্রুর পুত্র ভবিষ্যতে বড় হয়ে গ্রীসের পক্ষে সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে—তাই তাকে তারা মেরে ফেলতে বদ্ধপরিকর। সেই দাবী নিয়েই অরেষ্টিস এসেছিল। তার অবশ্য আরো বড় আকর্ষণ ছিল হারমিয়োনি—যার প্রেমে সে ছিল পাগল। যদিও হারমিয়োনি তাকে কখনো উৎসাহ দেয়নি।

এপিরাসে অরেষ্টিসের এই উপস্থিতিতেই নাটকের সুরু। অরেষ্টিস হারমিয়োনির অপমানে সমবেদনা জ্ঞাপন করে' নিজের সুদীর্ঘ লালিত প্রেম তাকে পুনরায় নিবেদন করলো। হারমিয়োনি অরেষ্টিসকে তার ঈর্ষাজনিত প্রতিহিংসালাভের উপায়রূপে ব্যবহার করতে মনস্থ করলো। সে অরেষ্টিসকে বললো পিরাসকে হত্যা করতে। পিরাস এদিকে এ্যাণ্ড্রোম্যাকিকে বিবাহে সম্মত করে এনেছিল। গ্রীক রাজন্যবর্গের দাবি, হেক্টরের শিশুপুত্রকে তাদের হাতে (অরোষ্টিসের মারফত) সঁপে দিতে হবে—এই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তাকে অবহিত করে'ই সে এ্যাণ্ড্রোম্যাকিকে তাকে বিবাহ করতে রাজী করে। এ্যাণ্ড্রোম্যাকি পুত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশ্বাস বিষয়ে পিরাসের পবিত্র শপথ আদায় ক'রে, পিরাসকে বিবাহ করবে বলে' সম্মতি দেয়। অবশ্য সে এও স্থির করেছিল যে, বিবাহের পরেই সে আত্মহত্যা করবে—যেহেতু মৃত স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হওয়ার কলুষ সে বিবাহের পরমুহূর্তেই আত্মহত্যার দ্বারা মার্জনা করবে। তাতে ছেলেও যেমন বাঁচবে, তার নিজের অপরাধও তেমনি ক্ষালিত হবে।

হারমিয়োনির উত্তেজনায় অরেষ্টিস তার সঙ্গীদের দ্বারা পিরাসকে তার সেই বিবাহ মণ্ডপেই হত্যার চক্রান্ত করলো। সে হারমিয়োনির আশ্বাস পেয়েছিল যে, পিরাসকে এই চরম শাস্তি প্রদান দ্বারাই সে হারমিয়োনিকে লাভ করবে—অন্যথা নয়।

ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতিতে, অরেষ্টিসের সঙ্গীরা পিরাসকে তাদের পরিকল্পনা

মতো বিবাহ মণ্ডপেই হত্যা করলো। কিন্তু আরেস্টিস যখন এই সংবাদ হারমিয়োনিকে দিল, তখন পিরাস-প্রেমিকা হারমিয়োনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে, অরেস্টিসকেই অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে তৎক্ষণাৎ পিরাসের মৃতদেহের উপরে আত্মঘাতী হলো। কিন্তু এর ফলে আশ্বাস, হতাশ্বাস ও বিবেক দংশনে অরেস্টিস হয়ে গেল বদ্ধ উন্মাদ। তার সঙ্গীরা তাকে জোর করে জাহাজে তুলে নিয়ে গ্রীসের পথে পাড়ি দিল।

ঘটনাবৃত্তের এই কাঠখোট্টা আখ্যান থেকে ঠিক বোঝা যাবে না যে, কী অসাধারণ নাটকীয় টানাপাড়েনের মধ্য দিয়ে নাটকটি এই ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিক পরিণতিতে এসে পৌছলো। চারটি প্রধান চরিত্রই প্রত্যেকে প্রেমে পাগল। পিরাস এ্যাণ্ড্রোম্যাকির প্রেমে অন্ধ, এ্যাণ্ড্রোম্যাকি হেক্টরের স্মৃতির ধ্যানে মগ্ন, হারমিয়োনি পিরাসের প্রতি অনুরাগে আত্মহারা, আর অরেস্টিস হারমিয়োনির প্রেমে আত্মবিক্রীত। নিয়তির কী খেলা, সব প্রেমিক-প্রেমিকাই কেবল অপ্রাপনীয়ের পিছনেই ধাবমান! এবং যেহেতু চরিত্রগুলি বড় মাপের এবং তাদের প্রক্ষোভও বড় মাপের, এই বিষম প্রণয়াবর্ত এক ভয়ংকর ট্র্যাজিক পরিণামেই অবসিত হওয়া সম্ভব, এবং হোলোও তাই। লক্ষণীয় যে, রাসিনের নাটকে—এবং সব ক্ল্যাসিক্যাল নাটকেই—নাটকের উন্মোচন ঘটে ঘটনার পঞ্চম অঙ্কে। অর্থাৎ যখন বিপরীত আবেগে তাড়িত নায়ক নায়িকা এক চরম পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয়েছে,—সেই সঙ্কট মুহূর্তেই ঘটে নাটকের উন্মোচন। তারপর অতিশয় তীব্র লয়ে ঘটনার সর্বনাশ অভিমুখী দ্রুতধাবন, এবং পরিশেষে সর্বনাশের মধ্যে ঘটনার পরিসমাপ্তি। অন্য কোনো রস বা সুরের অনুপ্রবেশ এখানে রসাভাস ঘটাবে। এমন কি, রাসিনীয় চরিত্রগুলিও যেন একতলীয়। তাদের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, কোনো বিপরীত বৈশিষ্ট্যের বিমিশ্রণ নেই। এমন কি তাদের ত্রিমাত্রিক করার প্রয়াসও যেন অনুপস্থিত। অনস্বীকার্য যে, রাসিনের নাট্য চরিত্রেরা খুবই জীবন্ত ও বাস্তব, কিন্তু তারা কেউ হ্যামলেটের মতো বহুমাত্রিক নয়। তারা প্রত্যেকে এক একটি আবেগের বিগ্রহ স্বরূপ। তারপর এদের স্থানিক বা কালিক পশ্চাৎপট অর্থাৎ দেশকালের পৃষ্ঠভূমিও যথেষ্ট অনুপুঙ্খায়িত নয়। যেটুকু নাহলে নয়, কেবল সেইটুকু দেশকালের ভূমিকায় উল্লেখ পাই, বেশী অনুপুঙ্খ রাসিনীয় ট্র্যাজিক রসের পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ। চরিত্রের ক্ষেত্রেও যেমন, দেশকালের ক্ষেত্রেও তেমনি। তাই রাসিনে সবই অতি সরলীকৃত। বাস্তবতা সূচিত করার জন্য যেটুকু অনুপুঙ্খ দরকার কেবল সেইটুকুই আভাসিত, তার বেশী

একটুও নয়।—এমনই রাসিনের অসামান্ত নাটকীয় মিতভাষিতা, ও মিতাচার, তাঁর সাত্ত্বিক economy। এমন কি কবিভাষার অতিবিস্তার, কল্পনার অতিউল্লাস, তাও তাঁর অনুমোদিত নয়। কারণ তাতেও ট্র্যাজিক রসের বৈশুদ্ধি ব্যাহত হতে পারে।

রাসিনের নাট্যভাষা ক্লাসিক্যাল নাটকের স্বভাব অনুযায়ী আগাগোড়া ছন্দোবদ্ধ। প্রতি চরণ ষট্‌পদী Alexandrine ছন্দে বিন্যস্ত এবং প্রতি দ্বিতীয় চরণের শেষে রয়েছে সুমসৃণ মিল ; এইভাবে রচিত এ-নাটকের কাব্য-দেহ। ভাব প্রকাশে সর্বত্র সংযম ও পরিমিতি। ক্ল্যাসিকাল নাটকে violent emotion-এর প্রকাশ violent হওয়া অবিধেয়, রুচিবিগর্হিত। মঞ্চে যুদ্ধ বা মৃত্যুর দৃশ্যের প্রদর্শনও নিষিদ্ধ। এমন কি, লীয়র বা ওথেলোর মতো উদ্দাম অসংযত আবেগের অসংবদ্ধ বাচিক প্রকাশও নিওক্ল্যাসিক্যাল নাটকে অসন্তুষ্ট ভ্রূকুটির উদ্রেক করতো। অতি সংযত ভাষায় ও সুসংযত আচরণের মধ্য দিয়ে অতি প্রবল আবেগ ও চিত্তবিক্ষোভের প্রকাশ মোটেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু ফরাসী নব্যক্রপদী নাট্যরীতির এই অসামান্য সংযমের আদর্শ রাসিন তাঁর নাটকে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শুধু অক্ষুণ্ণ রাখেন নি, সব বিধিনিষেধকে তিনি আপন প্রতিভাবলে ট্র্যাজিক নাট্যরস-সৃষ্টির উপায় করে তুলেছেন। এর অপূর্বতা আমাদের বিস্মিত করে।

রাসিনের নাটককে তাই অনেকে pure tragedy বা বিশুদ্ধ ট্র্যাজিক নাট্যরসের দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ তুলনায় অন্য ট্র্যাজেডিনাট্যে অতোখানি রস-বৈশুদ্ধি নেই। গ্রীক নাটকে কোরাসের সমবেত নৃত্যগীত দ্বারা তা কিছুটা লঘুকৃত। আর শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে অনেক পার্শ্বচরিত্র, সাবপ্লট ও নানা সঞ্চারী-ব্যভিচারী ভাবের সংমিশ্রণে ট্র্যাজিক রসের রূপান্তরই ঘটেছে বলা চলে ;—যদিও সেই রূপান্তরে তাঁর নাটকের রস এক অপূর্ব আস্বাদ্যতা ও ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, এও সত্য। কিন্তু একেবারে পরিশুদ্ধ ট্র্যাজিক রসের সন্ধানে, আমাদের যেতে হবে রাসিনের ট্র্যাজেডি-নাট্যের মহলে।

'Character is destiny'—বা চারিত্রই নিয়তি, এই উক্তি শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে বহু বিবুধজন করে থাকেন। কিন্তু এই উক্তি রাসিনের নাট্যচরিত্রদের সম্বন্ধে যেরূপ প্রযোজ্য সেরূপ হয়তো আর কোথাও তেমন নয়। রাসিনের ট্র্যাজেডি-নাট্যের গতি-প্রকৃতি এরই মধ্যে নিহিত। তাঁর পাত্রপাত্রীরা তাদের আপন আপন অদৃষ্টকে আকর্ষণ করে আনে।

তাদের চারিত্র তাদের আপন আপন মর্মনিগূঢ় আবেগের মধ্যেই মুখ্যতঃ নিহিত—যা তাদের সব কাজকর্ম ও সঙ্কল্পকে সবলে নিয়ন্ত্রিত করে, যা সব সামাজিক বিধিনিষেধকে দলিত মথিত করে' আদিম প্রবলতায় আত্মপ্রকাশ করে। রাসিনের নাট্যচরিত্রেরা এই জন্যই অত্যন্ত বাস্তব। তাদের কিন্তু তথাকথিত বা প্রচলিত বাস্তবতা নয়। রাসিন তাঁর চরিত্রগুলিকে সব বাহ্যিক ও আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্য ও প্রাতিস্বিকতা থেকে মুক্ত করে', তাদের চারিত্রিক অন্য সর্ব প্রকার বৈলক্ষণ্য বা বিশিষ্ট লক্ষণ। থেকেও নির্দোত করে', কেবলমাত্র তাদের নিরাবরণ, নিরাভরণ অন্তরতম চারিত্রিক সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। এইভাবে রাসিন তাদের অসামান্য সজীবতা দান করেছেন, একান্ত বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ সব মানুষের ক্ষেত্রেই আমরা তাদের স্বভাবের গভীরতম প্রবণতা দ্বারাই তাদের বিচার করি, চিহ্নিত করি, তাদের চিনি ও জানি। রাসিনের চরিত্রদের প্রবল আবেগ-নিয়ন্ত্রিত স্বভাব তাদের যে কেবল এক প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন সরল বীর্যত্তাই দান করে তাই নয়, তারা সত্যতরও হয়ে ওঠে, তারা তাদের আপন অন্তরতম স্বারূপ্যের নির্যাসে অধিষ্ঠিত বলে', অত্যন্ত বাস্তব বলে' প্রতিভাত হয়। তারা তাদের সব শক্তি সামর্থ্য ও অহঙ্কৃত স্বাধীনচিত্ততার ভাবভঙ্গি সত্ত্বেও, তাদের স্বভাবের কেন্দ্রস্থ ভারাকর্ষ অতিক্রম করতে পারে না। তারা সর্বদাই নিতান্ত অনতি-ক্রম্যরূপেই আপন স্বভাবে অবিচল থাকে—এবং এটাই তাদের গৌরবও যেমন, তেমনি তাদের ট্র্যাজেডিরও মূল।

মানবচরিত্রে রাসিনের প্রগাঢ় জ্ঞান থাকার জন্য, তিনি এক একটি কেন্দ্রীয় প্রবল আবেগের সঙ্গে কিছু অনুষঙ্গী অন্য আবেগও চরিত্রগুলিতে সংযুক্ত করেছেন এবং এই আবেগ-সংহতিই তাদের চিহ্নিত করে। যেমন রোক্সানা, হারমিয়োনি, ফেইড্রা ইত্যাদি সব নায়িকাই মুখ্যতঃ প্রণয়মুগ্ধ হলেও তাদের প্রণয়ের সঙ্গে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চারী মনোবৃত্তি তাদের চরিত্রকে বিশেষিত করেছে। রোক্সোনার চরিত্রে প্রণয়ের সঙ্গে ক্ষমতাপ্রিয়তা অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে; হারমিয়োনির চরিত্রে প্রেমের সঙ্গে ঈর্ষার তীব্র অভিঘাত তার হিতাহিত জ্ঞান হরণ করেছে; ফেইড্রার কামনার প্রক্ষোভের সঙ্গে তার অপরাধবোধ ও পরাজয়ের আশঙ্কা অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। এমনই সব চরিত্রে।

সেই সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে, মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ খুবই উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। লা রোশফুকো (La Rochefoucauld) এবং পাস্কাল (Pascal)-এর লেখায় তা ধরা পড়ে। তাঁরা স্পষ্টীকৃত করেন যে, মানুষের

চিত্তে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি, ভালো ও মন্দ, পুণ্য ও পাপকামনা, সর্বদা জড়িয়ে থাকে ; বিশুদ্ধভাবে কোনোটাই থাকে না। রাসিনও এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে তাই আপাতবিপরীতমুখী অভিকর্ষের দ্বন্দ্ব নাট্যমুহূর্তকে তীব্রতর করে তোলে। যে ক্ষিপ্তপ্রায় হারমিয়োনি অরেষ্টিসকে পিরাস-হত্যার নির্দেশ ও প্রবর্তনা দেয়, সেই ঈর্ষান্ধ নারী পিরাস-হত্যার খবর পেয়ে অরেষ্টিসের প্রতি নির্মম ক্ষমাহীন ঘৃণায় এবং পিরাসের প্রতি প্রবুদ্ধ অনুরাগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। ফেইড্রার চিত্তে তীব্র কামার্তি ও পাপবোধ একই সঙ্গে উত্তাল হয়ে তার সত্তাকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। ভালো ও মন্দ একই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ও দ্বিমুখী টানে একটা আবর্তের সৃষ্টি করে ; তবু প্রবলতর আবেগই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় এবং চরিত্র ও ঘটনাকে ট্র্যাজিক পরিণামের দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে স্বতঃচালিত করে।

রাসিনের নাটকে স্ত্রী-চরিত্রগুলি এক অতি বিচিত্র, উজ্জ্বল ও প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী রমণীরাজির চিত্রশালা। নারী-হৃদয়ের প্রগাঢ় রহস্যের এমন বাস্তব রূপায়ণ অন্যত্র দুর্লভ। প্রেমবিধুরা প্রণয়সন্তপ্তা নারীর কতো রূপই যে এই ট্র্যাজেডিগুলিতে উদ্ভাসিত, এবং তাদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের ছবি এরূপ সত্যতায় উন্মোচিত যে, মুগ্ধ ও বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। রাসিনের নাটক তাই শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের অভিনয় পারঙ্গমতা প্রদর্শনের আলম্বন।

রাসিনের নাট্যনির্মিতিতে যে সারল্য ও ঘটনার নির্বাহুল্য লক্ষিত হয়, অনুরূপ সারল্য ও নির্বাহুল্যই আমরা তাঁর ভাষাশৈলীতে ও স্টাইলেও দেখি। যা কিছু তাঁর অভিপ্রেত সমুচ্চ ট্র্যাজিক রসের বিন্দুমাত্র পরিপন্থী বা অপহ্নবকারী, সেইসব শব্দ ও ইঙ্গিত তিনি তাঁর নাট্যভাষা থেকে নির্মমভাবে পরিহার করেছেন। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা সাকুল্যে দুই হাজারের মতো, শেক্সপীয়রের যেখানে তার দশগুণ। একই শব্দগুচ্ছ একাধিকবার ব্যবহারে তাঁর অনীহা নাই। অবাক-করে-দেওয়া নতুন কোনো শব্দ বা উপমার ধার ঘেঁষেও তিনি যান না। আবার প্রাত্যহিক জীবনের কথ্যভাষার কোনো শব্দ বা নীচুস্তরের জীবন সম্পৃক্ত কোনো শব্দ বা ইমেজও তিনি ব্যবহার করেন না। শব্দবিচারে তিনি উঁচু-নীচুর বর্ণভেদ মানতেন। মেটাফর বা উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারও তাঁর নাট্যকাব্যে অত্যন্ত কম এবং যা-ও বা আছে তাও নিতান্ত প্রথাসিদ্ধ গোত্রের। বিমূর্ত শব্দের বহুল ব্যবহার তিনি করেছেন। দর্শনেন্দ্রিয়কে আনন্দিত করায় তাঁর আগ্রহ নেই, রঙের উল্লেখেও তিনি লাজুক, ফুলকে তিনি ফুল ছাড়া অন্য কোনো বিশিষ্টতায় বিশেষিত

করেন না। ট্র্যাজেডির যোগ্য মহত্ত্ব দানের প্রবর্তনাতেই ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধন, নিরলঙ্কৃত সারল্যের এই সাধনা।

রাসিনের ষ্টাইলের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হোল, তা গীতধর্মী নয়—সচেষ্টভাবে গীতিময়তা বর্জিত। শেক্সপীয়রে যে গীতিময়তা সর্বত্র নৃত্যশীল ও সঞ্চরমান এবং অতি সাধারণ বস্তুকেও অলোকসামান্য করে তোলে—তা এখানে অনুপস্থিত। সপ্তদশ শতকের ফরাসী দর্শকদের মেজাজেও যেমন তা সুগ্রাহ্য হোত না, তেমনি রাসিনের কাছেও তা ছিল ট্র্যাজেডির গাম্ভীর্য হানিকর। রাসিনের উদ্দেশ্য ছিল কথাকেই নাটকীয় ঘটনার দর্পণ করে তোলা। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকুই বলা, একটুও তার বেশী নয়—কারণ অতি সামান্য হলেও কোনো অতিশয়োক্তি বা অবান্তর উক্তি ট্র্যাজেডির কেন্দ্রগত বিষয় থেকে দর্শকের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করবে। গ্রীক নাট্যকারদের অপেক্ষাও এদিক দিয়ে তিনি আরো নির্মম, কারণ তাঁদের নাটকে ভাষা মাঝে মাঝে অলৌকিক রহস্যের দিকে ডানা মেলে দেয়। কিন্তু নাট্যভাষা সম্বন্ধে রাসিনের ধারণা ছিল অত্যন্ত অনমনীয় এবং তিনি কোথাও এ-বিষয়ে রফা করেন নি।

রাসিনের নাট্যভাষা কিন্তু তার নিরলঙ্কৃত সরলতা সত্ত্বেও অত্যন্ত সুললিত: ছন্দে লয়ে মিলে অত্যন্ত মনোগ্রাহী, কোথাও বিন্দু শৈথিল্যের লেশ নেই। প্রতিটি পংক্তি এবং প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্ট উচ্চারণের অপেক্ষা রাখে, তবেই তার সব সৌন্দর্য ও শক্তি পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধ হয়। রাসিনের ষ্টাইল মোটেই একঘেয়ে বা সমরূপ নয়। তাঁর মিত্রাক্ষরী চরণযুগলের ওঠা-পড়া ও সুরবিভঙ্গ মহাকবির স্বাক্ষরযুক্ত। এমনকি কোনো কোনো চরিত্রের একশ'র বেশী পংক্তিযুক্ত বাচনও একঘেয়ে ঠেকে না—কারণ বক্তব্য বস্তুর সঙ্গে স্বরের ওঠা-পড়া ও লয়ের বৈচিত্র্য আশ্চর্য সমঞ্জসীভূত।

মনে রাখতে হবে যে, শেক্সপীয়রও চরম ট্র্যাজিক মুহূর্তে ভাষার সব অলঙ্কার ফেলে দিয়ে অতি সাদা সরল কথাকে গভীরতম বেদনার বাহন করেছেন। এবং রাসিনের নাটকে যেকালে সূচনাই সঙ্কট মুহূর্তে এবং তারপর পাঁচটি অঙ্কই কেবল ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবন মাত্র, সেখানে অলঙ্কৃত বাচনের অবকাশ এমনিতেই কম। সংযত ভাষায় তীব্রতম আবেগের প্রকাশ যে অসম্ভব নয়, বরং স্বল্পপ্রসর মাধ্যমে আবেগের প্রকাশ যে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে, এ সত্যের প্রমাণ রাসিনের নাটকের সর্বত্র। নানা বিরুদ্ধ আবেগের সংঘাতে কোথাও সুরের ভুল নেই, চরিত্র ও মুহূর্ত সার্থক

উচ্চারিত ; তীব্র নিখাদে ঝঙ্কার যদিবা ধ্বনিত নাও হয়, তবু সংবৃত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বেদনার মর্মবাণী সর্বত্র শ্রুতিগম্য।

রাসিনের বাচনে কোনো অন্তস্তর বা দূরতর অর্থের আভাস থাকে না, বা অস্ফুট প্রতিধ্বনি ও প্রতীকী ব্যঞ্জনাও নাই ; অর্থাৎ যা কিছু কাব্য-কে বহুব্যাপ্ত ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করে, সে সবকিছুই মিলবে না এখানে। রাসিনের অভীষ্টও তা নয়। তিনি প্রতিটি চিন্তা ও হৃদয়ভাবকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ-প্রতিভাত করতে চেয়েছেন, যাতে হৃদয়মনের ঘনিষ্ঠ ছবিটা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দূরবিস্তারী চিন্তার মধ্যে পাঠকচিত্তকে উধাও করা তাঁর উদ্দিষ্ট নয়, তিনি চান, যা প্রত্যক্ষ তার মধ্যেই সব মনোযোগকে আকৃষ্ট করতে এবং দেখাতে যে, তাও কত অদ্ভুত ও সম্মোহক। যতো জটিলই হোক তার বয়ন, তিনি তাকে স্বচ্ছ সরল রূপেই তুলে ধরেন এবং আমাদের সমস্ত হৃদয় ও চেতনাকে তারই মধ্যে সমাহিত করেন।

অ্যারিষ্টট্‌ল্-প্রোক্ত ট্র্যাজেডির পরিণামী রস বা Catharsis রাসিনের নাটকে একটু স্বতন্ত্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভয় ও করুণার অত্যধিক উদ্রেক দর্শকচিত্তকে এ দুই প্রক্ষোভ থেকে নির্মুক্ত করবে, ট্র্যাজেডির এ ফলশ্রুতি রাসিনের নাটকে যে সর্বত্র ঘটে তা নয়। ঘটলেও একটু স্বতন্ত্ররূপে। কেবল ভয় ও করুণাই নয়, আরও বহু হৃদয়ভাবের উদ্রেক ও আলোড়ন ঘটে এবং নির্মোচন যা ঘটে, তা নঞর্থক শান্তি নয়, বরং তা অতিরেকী ভাবসমূহের আনন্দময় রূপান্তর। ঐসব ভয়ঙ্কর অবিবেকী ও আত্মঘাতী চরিত্রদের অন্তরে প্রবেশ করে' এবং তাদের অদৃষ্টের সব বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে, আমরা এক অপূর্ব গম্ভীর বিষাদে উত্তীর্ণ হই, যা কিন্তু আনন্দের সঙ্গে বিবাদী নয়। নাটকের অন্তর্নিহিত কবিতাই আমাদের এখানে উত্তীর্ণ করে দেয়।

ভাষাবিদ্ ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সুহৃৎ ও বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য কিছুকাল পূর্বে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্য, জ্ঞানের গভীরতা এবং মনের ঔদার্য লিখে বোঝানো যায় না। বিষ্ণুবাবুর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই তাঁর এই সব গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছেন। এখানে আমরা শুধু তাঁর বাইরের পরিচয়ের কিছুটা লিখছি।

১৯১৮ সালের ১লা জানুয়ারী বরিশাল জেলার রহমৎপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৯৩৪ সালে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ব্রজমোহন কলেজে ভর্ত্তি হন। এবং ঐ কলেজ থেকে ১ম শ্রেণীতে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। এর পর এম. এ. পড়েন বাংলায়। স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা উপলক্ষে তিনি কাজ করেছেন দমদমের মতিঝিল, দেওঘর, কলকাতা, কাটোয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জায়গায়। পরিণত বয়সে তিনি বাংলার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন বঙ্গবাসী কলেজে।

কলেজ জীবনে তাঁর সতীর্থ ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ লেখকরা। তাঁরা সকলে মিলে নিজেদের রচনা 'দল বেঁধে' নামে একটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এখানে বিষ্ণুপদবাবুর একটি কবিতা ছিল যার নাম "জোনাকী"।

তাঁর নিজস্ব প্রথম রচনা 'ভারততীর্থ'। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে ঐসব স্থানের ভাষা শেখার ঔৎসুক্য জাগে তাঁর মনে। শেখায় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আঞ্চলিক ভাষার চর্চা তিনি প্রথম আরম্ভ করেন শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'ত্রয়ী'র হিন্দী অনুবাদ করে। 'ভারতীয় শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'-এর আংশিক অনুবাদও তিনি করেছিলেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হয়ে যোগদান করেন। সেখানেই বিশেষ করে পেলেন দক্ষিণ

ভারতীয় ভাষা চর্চার সুযোগ। কিছুকাল পরে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের আহ্বানে বিষ্ণুবাবু চলে যান সিমলার ইনষ্টিটিউট্ অফ এ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ-এ। সেখানকার ব্যবস্থা ছিল ভাল, পড়াশোনার সুযোগও যথেষ্ট, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না বলে', দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগে যোগ-দান করেন।

বাঙলার বাইরে কাজ করবার সময় তাঁর বহির্বঙ্গের ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে। শুধু ভাষা নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তিনি জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, প্রত্যেক অঞ্চলের জীবনে ও সাহিত্যে কিছু বিশেষ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকা যেকোন ভারতবাসীর পক্ষে অনুচিত। এজন্যেই ভারতের সকল প্রান্তের ভাষা এবং লেখক ও জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে বিষ্ণুবাবুর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

ভারতীয় ভাষা গভীর ভাবে পঠন পাঠনের ঔৎসুক্য তাঁর মনে প্রথম জাগে যখন তিনি ভারতের ভক্তি সাহিত্য নিয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। গবেষণা-পত্রে তিনি প্রধানতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের ভক্তি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য উত্তর ভারতকেও বাদ দেওয়া চলে না। সংশ্লিষ্ট ভক্তি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়ার জন্য তাই তিনি ঐসব ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। মূলতঃ নিজের আগ্রহে ও চেষ্টায় ভারতের প্রায় সকল আঞ্চলিক ভাষাই বিষ্ণুবাবু আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে যাঁরা তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের ঋণ স্বীকার করতে কখনও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

পূর্বে সর্ব-ভারতীয় ভাষা বলতে আমরা একমাত্র সংস্কৃতকেই বুঝতাম। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাও সংস্কৃত ভাষারই চর্চা করেছেন এতদিন। কিন্তু "আজ পশ্চিমের ঝোঁক পড়িয়াছে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর এবং ইতিমধ্যেই ইংরেজী ভাষায় কয়েকখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপক এদেশে আসিয়া বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া বর্তমান ভারত-বর্ষকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর আমরা? পারস্পরিক সংহার কার্যে অমানবীয় উল্লাস বোধ করিতেছি।"

পূর্বেই বলেছি তাঁর প্রথম বই ভ্রমণকাহিনী, 'ভারততীর্থ'। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য' (১৯৬৪)। ভক্তি ধর্মের উপরে বাংলা ভাষায় এটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ভক্তিবাদের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির যে অচ্ছেদ্য মিলন আছে তা

উপলব্ধি করা যাবে বিষ্ণুবাবুর বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সকল ধর্মে ভক্তিবাদের কথা তিনি উদ্ধৃতিসহ নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ এ বই নিঃশেষিত। এ সব গ্রন্থের প্রকাশক মেলা কঠিন। তাই তিনি পরিমার্জিত সংস্করণ বের করে যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

ভারতীয় ভাষা থেকে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার বই তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। ৮টি অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে আছে জয়কান্তনের গল্প উপন্যাস, তামিল গল্প সঞ্চয়ন, ভারতীয় কবিতা সংগ্রহ, ভারতীয় গল্প সঙ্কলন, মালয়ালাম গল্পগুচ্ছ, শিবরাম করন্থের উপন্যাস 'মাটির টানে' প্রভৃতি। আরও একটি কন্নড় উপন্যাসের অনুবাদ তিনি সম্পূর্ণ করে গেছেন। অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য আকাদেমি ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে। না হলে এসব বই প্রকাশের তাগিদ বাঙালী প্রকাশকদের বড় একটা নেই।

আমাদের দেশে বিদেশী ভাষা জানলেই ভাষাবিজ্ঞানী বলে খ্যাতি পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুবাবু ভারতের প্রায় সকল প্রধান ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলেও তাঁর যোগ্য সমাদর লাভ করে যাননি। তাই তাঁর জ্ঞান ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তার কিছু প্রমাণ রেখে যেতে পারেননি। তবে তাঁর অনেক রচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা, আলেখ্য, চতুরঙ্গ, সমকালীন এবং বহু ছোটো ছোটো পত্রিকায়। এদের মধ্য থেকে আমরা শুধু কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি যা থেকে দেখা যাবে তাঁর কৌতূহল কিরূপ বহুমুখী ছিল: ভিন্ন প্রদেশে রবীন্দ্র চর্চা (পৃথক পৃথক ভাষার পৃথক আলোচনা); হিন্দি উর্দু হিন্দুস্থানী; হিন্দী সাহিত্যের গোড়ার কথা; বাংলা দেশের হিন্দী কবি নিরালা; নাগা-জীবনের কাহিনী; কান্নাডা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা; হিন্দি কথাশিল্পী ইয়শপাল —উপন্যাস; যে কথা কবির গভীর মনের কথা; নর্মদার উপকূলে; গুজরাতে শরৎচন্দ্র; বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ; সৃষ্টির শেষ রহস্য; বিশ্বনাগরিক সুনীতি-কুমার; রবীন্দ্র তন্ত্র; উমাশঙ্কর জোশী; An Outline of the Evolution of Hindi; মারাঠি ও বাঙালী; কনে যখন বরের চেয়ে বড়; সর্বভারতীয় শরৎচন্দ্র; কোলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এসো; বঙ্কিম সাহিত্যে সংস্কৃত; দক্ষিণের বিবাহরীতি; সাম্প্রতিক [illegible] সাহিত্য; দক্ষিণ ভারতে রবীন্দ্রনাথ; কাবেরী যেথায় দেবতা; [illegible]কারে

জ্যোতির্ময় রবি ; তামিল গল্পে বাঙলার সমাজচিত্র ; ভগিনী নিবেদিতা ও কবি ভারতী ; মারাঠী কন্যা বাঙালী বধূ ; মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ ; যে রমণীদের পদবী 'অন্তর্জনম্' ; কালিদাস ও উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ; রায়প্রোলু ও তাঁর গুরুদেব ; সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্য—তামিল ; রবীন্দ্রনাথ ও কাকা কালেলকর ; রায়প্রোলু ও শান্তিনিকেতন ; মারাঠী কথাশিল্পীর চোখে রবীন্দ্রনাথ ; অন্যভাষায় বাঙলা সাহিত্য ; বাঙলা সাহিত্যের ভারত ভ্রমণ ; নিশ্চিন্দিপুরের নতুন ঠিকানা ; কর্ণাটকে বঙ্কিম-চর্চা ; রবীন্দ্রনাথ ও জোশ মলীহাবাদী ; রঘুপতি সহায় 'ফিরাক' ; রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী লেখকগোষ্ঠী ইত্যাদি। বিষ্ণুবাবু নিজেও কয়েকটি ছোটো গল্প লিখেছিলেন এবং অনুবাদ করেছিলেন বেশ কিছু গল্প অন্য ভাষা থেকে।

কেউ মারা গেলে আমরা অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে শোক প্রকাশ করি। এটা প্রায় মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুপদবাবুর ক্ষেত্রে একথা যথার্থই ব্যবহার করা চলে, কারণ তাঁর মতো সকল ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেউ আছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আমাদের কথা

বর্তমান সংখ্যায় 'আলেখ্য' বিংশতি বর্ষে উত্তীর্ণ হোল। আগের উনিশ বছর এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। অর্থবলহীন, গোষ্ঠীবলহীন, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাহীন হয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্ভীক-মতাদর্শ সম্পন্ন পত্রিকাকে কেবলমাত্র সঙ্কল্পের জোরে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার জোরে দাঁড় করানোর প্রয়াস যে কতো গ্রাণান্তিক দুরূহ, তা এরূপ আয়াস যারা কখনো করেছেন, মাত্র তাঁরাই জানেন।

এই উনিশ বছরের সংগ্রামের পথে অনেক বন্ধুজন লাভ হয়েছে, যাঁরা প্রাণের টানে আলেখ্য'র পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং নানাভাবে আলেখ্য'কে সাহায্য করে আমাদের কৃতার্থ ও চমৎকৃত করেছেন। আলেখ্য'র মধ্যে যে একটি মহৎ আদর্শের প্রেরণা কাজ করছে তারই উপলব্ধি তাঁদের হৃদয় ও উদ্যমকে আলেখ্য'র প্রতি প্রসারিত করেছে। এ আদর্শ কেবল নির্ভীক নিরপেক্ষ সত্যকথনের নয়, এর মর্মে ছিল স্বদেশব্রত,—বাঙ্গালীর চারিত্র্য ও ঐতিহ্যকে সাময়িক অপচ্ছায়ার কবল থেকে মুক্ত করে' তাকে তার পূর্বতন গৌরবের স্মৃতিতে সঞ্জীবিত করা।

আলেখ্য'র জন্মলগ্ন ১৯৭০ সাল, যখন পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ কলকাতা শহর, নক্‌শালী আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবর্তে বিক্ষুব্ধ উত্তাল। বোমা পিস্তল পাইপগানের দোর্দণ্ড প্রতাপ যুবমানসকে তখন মাতাল করে তুলেছে। তারা সব চিরন্তন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে দুই পায়ে দলে' চটকে রসাতলে দিতে বদ্ধপরিকর। সমস্ত সমাজে ভয় শঙ্কা অস্থিরতা। সাংস্কৃতিক জীবন আতঙ্কে পাণ্ডুর। দেশগৌরব মনীষীদের মূর্তি ভাঙ্গা, বই পোড়ানো থেকে, সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা ও শিক্ষাবিদকে হত্যা পর্যন্ত অবলীলাক্রমে ঘটে চলেছে। প্রতিবাদ করবার সাহস অদৃশ্যপ্রায়। অধিকাংশ পত্র-

পত্রিকা ও লেখকলেখিকা কিছু না-দেখা, না-শোনা ও না-বলার সাধনায় তৎপর।

এই ঘোর দুর্দিনের সঙ্কট কালে, বাঙ্গালী জাতির জীবনের প্রলয় সন্ধ্যায়, 'আলেখ্য' একটুখানি ছোট্ট প্রদীপ শিখার মতো জ্বলে উঠলো। একটু আলো, একটু চেতনা, একটু আত্মসমীক্ষা যদি জাগাতে পারে, যদি জাগানো যায়, সেই সঙ্কল্প নিয়ে। সাধ্য খুবই সীমিত। অখ্যাত অল্পসংখ্যক লেখক নিয়ে, প্রায় সকলের দৃষ্টির অগোচরেই, শুরু হোল ক্ষুদ্র 'আলেখ্য'র 'কাঠবেড়ালীর সাধনা'—মহৎ উদ্দেশ্যে অতি স্বল্প ক্ষমতা নিয়েও যৎসামান্য কিছু করা ও গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস। সেই উন্মাদ প্রজন্মকে আত্মস্থ করার জন্য, তার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত করার জন্য, তার বুদ্ধিকে মোহমুক্ত করার জন্য 'আলেখ্য' তার সকল উদ্যম নিয়োজিত করলো। সাহিত্য-পরিক্রমা, সংস্কৃতি-চিন্তা, সমাজচিন্তা, গ্রন্থসমীক্ষা ইত্যাদি নানা বিভাগে নির্ভীক সত্যভাষণের মধ্য দিয়ে সেই উৎকণ্ঠা অনুরণিত হতে লাগলো। সমকালীন সাহিত্যিক খ্যাতির বাজারী কোলাহল অপসৃত করে' তাদের নির্মোহ মূল্যায়নও সেই প্রয়াসেরই অঙ্গ ছিল।

এইভাবে 'আলেখ্য' ক্রমে ক্রমে কিছু বিদগ্ধজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এমন কি, আলেখ্য'র ন্যায় একটি নির্ভীক সত্যসন্ধ মহৎ আদর্শপ্রাণিত কোনো পত্রিকা যে তখনকার সেই ঘোর তমিস্রার মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে, এই আশ্চর্য ব্যাপারে অভিভূত হয়ে অনেকে বলতে লাগলেন যে, তা হলে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সত্যিই হয়তো অন্ধকার নয়। ক্ষীণ আশার আলো যেন দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, একটি ক্ষুত্র পত্রিকার প্রতি বহুজনের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, এবং এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার বৃহৎ মর্মকথা যে বহু মানুষের প্রাণে আশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করেছে, তা দেখে আমরা, আলেখ্য-পরিজনেরা, অত্যন্ত কৃতার্থ বোধ করলাম; এবং গীতার সেই আশ্বাসবাণী—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

এবং "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" এই মহাবাক্যদ্বয় স্মরণ করলাম।

ধীরে ধীরে 'আলেখ্য' কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা অর্জন করলো। কিন্তু সে শুধু বিদগ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে। বিজ্ঞাপনের বাজারে এ প্রতিষ্ঠা মূল্যস্বীকৃতি পেল না; আলেখ্য'র সীমিত প্রচার বিজ্ঞাপনদাতাদের আকৃষ্ট করলো না। কিন্তু আমরা নিরুপায়। আলেখ্য তার আদর্শকে খর্ব করে' জনপ্রিয়তার ভজনা করতে পারে না। সেতো হবে তার অপমৃত্যু। তাই আগাগোড়া প্রচুর লোকসান বহন করেও আলেখ্য তার 'মিশনে' রইলো অবিচল।

১৯৭৫-এ আমাদের বৃহত্তর জাতীয় জীবনে "ইমারজেন্সি" এলো আরেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে। সব রকম রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক সমালোচনা, বিশেষ ক'রে যা তদানীন্তন সরকারের সত্যের কণ্ঠরোধী প্রয়াসের বিরুদ্ধে তির্যক ইঙ্গিতও বহন করে এমন কোনো লেখা, তখন সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কড়া সেন্সরশিপের রক্তচক্ষু প্রায় সব লেখক প্রকাশককেই সত্যভীরু সময়সেবকে পরিণত করলো। আলেখ্য'র সামনে সে এক কঠিন পরীক্ষা। ইন্দিরা সরকারের স্বৈরশাসনের কোনো সমালোচনা, এবং জনগণের সত্য জানা ও প্রকাশের মৌলিক অধিকারের উপর এই বলাৎকার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ আলোচনা, 'আলেখ্য' প্রকাশ করবে কি না?—করলে 'আলেখ্য'কে জোর ক'রে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে, আলেখ্য'র সম্পাদক-প্রকাশককেও হাজতে যেতে হতে পারে। না করলে জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে 'আলেখ্য' তার কর্তব্যভ্রষ্ট হবে, তার নির্ভীকতার পতাকা তাকে অবনমিত করতে হবে। 'আলেখ্য' সত্যভাষণের ক্ষুরধার পথই বেছে নিলে। 'সমাজচিন্তা'র সরকারের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে 'আলেখ্য'তে প্রকাশিত হতে লাগলো সত্যের সপক্ষে এবং স্বৈরতন্ত্রের বিপক্ষে নানা রচনা, মৌলিক এবং অনুবাদিত। এই সময় পরমশ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁর 'ইমারজেন্সি'র সমালোচনামূলক কিছু লেখা আলেখ্য'তে প্রকাশিত করেন।

কোনো নামী পত্রিকাই তাঁর সেসব লেখা প্রকাশে তখন সাহসী হয়নি। তবে হয়তো ছোট পত্রিকা হওয়ার কারণেই 'আলেখ্য' সরকারের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। বহুল প্রচারিত পত্রিকা হলে সেন্সরশিপের কোপে পড়ে তাকে নির্ঘাৎ বন্ধ হয়েই যেতে হোত। অন্যবিধ শাস্তিরও সম্ভাবনা ঘটতে পারত। সে যাহোক, আলেখ্য মস্ত ঝুঁকি নিয়েই সে-সময়, সেই 'ইমারজেন্সি'র আঠারো মাস, সত্য কথনের দায়িত্ব পালন করেছিল। ইমারজেন্সি-পরবর্তী অধ্যায়েও সেই একই আদর্শ সে অক্ষুন্ন রেখেছে। না রাখলে তার জন্মলগ্নের সঙ্কল্পই ব্যর্থ হয়ে যেত।

কিন্তু এই উনিশ বছরব্যাপী প্রকাশনার বন্ধুর পথ অতিবাহিত করে' আলেখ্য'র প্রকাশক-সম্পাদক শুধু ক্লান্তই হয়ে পড়েননি, বয়োজীর্ণও হয়েছেন। পূর্বের সেই শ্রমশক্তি আর অক্ষুণ্ণ নেই, বিজ্ঞাপন তাই ক্রমেই আরো দুর্লভ হয়ে উঠছে। মুদ্রণব্যয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের কোনো অনুদান পাওয়া দূরস্থান, সরকারী বিজ্ঞাপনের যৎসামান্য সাহায্যও অন্তর্হিত হয়েছে। অপ্রিয় সত্যকথনের দুঃসাহস ক্ষমতাসীনরা কদাচিৎ পরিপাক করতে পারেন। ভালো একটি আদর্শনিষ্ঠ উচ্চমানের পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সমগ্র সমাজের। সমাজ সে দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত না হলে এরূপ পত্রিকা কেবল একক উদ্যমের জোরে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

আলেখ্য'র আর্থিক লোকসান ক্রমেইঅতিশয় দুর্ভর হয়ে উঠেছে। মাঝে একবার আবেদন করায় কিছু বন্ধুবান্ধব সহৃদয় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। তার দ্বারা আর্থিক সঙ্কট সাময়িক নিবারিত হয়। কিন্তু সঙ্কট আবার ঘনীভূত হয়েছে। স্বল্প সাহায্যের ভেলায় এরূপ দুরুত্তরণীয় সঙ্কট পাথার অতিক্রম করা ক্রমেই অসাধ্য প্রতিপন্ন হচ্ছে। তাই আলেখ্যর সামনে এখন দুটি বিকল্প : 'আলেখ্য' কি এই বিংশতি বর্ষের শেষেই তার কঠিন জীবনের সমাপ্তি রেখা টানবে ; অথবা যথোচিত সামাজিক আনুকুল্য লাভ হলে—

'আলেখ্য' আগের মতোই কিম্বা আরো সার্থকতর ভাবে তার প্রকাশন অক্ষুণ্ণ রাখবে।

শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় অবশ্য আলেখ্যর জন্য একটা endowment-এর আবেদন সাধারণ্যে প্রচার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু পৃথকভাবে একটা আবেদন প্রচার করতে আমাদের উৎসাহ হচ্ছে না। এদেশে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা দান করার মতো সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির অপ্রাতুল্য নেই। কিন্তু তাঁদের এ জাতীয় প্রচারহীন সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সাহায্য করার আগ্রহ প্রায়শঃই থাকে না—দেশকালের ধর্মে তা থাকার কথাও নয়। যদি সাংস্কৃতিক দায়িত্ব-সচেতন, স্বজাতিকল্যাণব্রতী কিছু মানুষ 'আলেখ্য'র জন্য একটি অর্থভাণ্ডার গড়ে' পত্রিকাটির প্রকাশ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াসী হন ও এগিয়ে আসেন, তা হলেই আলেখ্য'র বিংশোত্তরী দশায় সংক্রম ও সঞ্চার ঘটতে পারে, নচেৎ বিংশতি বর্ষ পর্যন্তই তার মেয়াদ। এই শোষোক্ত না-ধর্মী সম্ভাবনাই নিশ্চিততর বলে' আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু সেজন্য আমাদের খেদ নেই। আলেখ্য'র ব্রত ও জীবন যে নিষ্ফল হয় নাই, তা বহু পত্র পত্রিকা ও সুধীজনের অকুণ্ঠিত সাধু-বাদে উচ্চারিত হয়েছে। আলেখ্য'র দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বহু বিদগ্ধ অনুরাগীর প্রীতিপূর্ণ উষ্ণ অভিনন্দন পেয়েছিলাম; পত্রিকার এই বিংশতি বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষেও অনুরূপ সপ্রশংস শুভেচ্ছাবাণী এসেছে। এই সঙ্গে বিদগ্ধমণ্ডলীর এই সব সাধুবাদের কিছু কিছু তুলে ধরছি। অন্যথায়, বিংশতিবর্ষের পরে পাথেয় অভাবে আলেখ্য যদি তৈলহীন প্রদীপের মতো নিভে যায়, তা হলে অদ্যতনীয় পাঠক সম্প্রদায় হয়তো আলেখ্য'র ব্রত সম্বন্ধে এবং দেশের জ্ঞানীগুণীর আশীর্বাদ কিরূপ অকৃপণভাবে তাকে সর্বদা অভিনন্দিত করেছে, সে বিষয়ে তেমন কিছু জানতে পারবে না। আর আজকের নতুন পাঠকদের কাছেই 'আলেখ্য'-রূপ প্রচেষ্টার মর্মকথা উদ্‌বারিত হওয়া বিশেষ জরুরী, কারণ ভবিষ্যৎ বঙ্গসংস্কৃতি রচনার ভার তাদেরই নিতে হবে। এই ভেবেই এত কথা লিখলাম,

এবং আলেখ্য'র উদ্দেশ্যে উচ্চারিত কিছু শুভেচ্ছা ও প্রশস্তিবাণী এখানে উদ্ধৃত করছি।—

* *

১২।১।৯০

"আমি 'আলেখ্য' নিয়মিত পাই এবং পড়ি। আলেখ্য পশ্চিম বাংলার ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। —বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উচ্চ স্তরের লেখার জন্য এ পত্রিকার আসন খুব উচ্চে। 'আলেখ্য' বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করছে জেনে আনন্দিত হলাম।"

—প্রফুল্লচন্দ্র সেন
৬ সি, মিডলটন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭১

* *

১১ই জানুয়ারী ১৯৯০

"'আলেখ্য' বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করছে এটি একটি আনন্দের সংবাদ। আপনি এককভাবে যে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। ·····আমি আলেখ্যর দীর্ঘায়ু কামনা করি।·····"

—অন্নদাশঙ্কর রায়

* *

পি ১৭-এ, আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউ
কলিকাতা-১৯

২৪।১।৯০

প্রীতিভাজনেষু,

আলেখ্যর দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমি যা লিখেছিলাম এখনো সেই মত পোষণ করি। আলেখ্য স্বাধীনভাবে যে সব বিষয়ে আপনার অভিমত ব্যক্ত করে, সে সব বিষয়ে ভবিষ্যতেও স্বাধীনভাবে তার স্বকীয় মত ব্যক্ত করবে। অর্থাভাবে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হবে না, হওয়া উচিত নয়।

আলেখ্যর জন্য একটি endowment স্থাপনের জন্য আপনি

একটি appeal প্রচার করুন। অনুরাগীরা নিশ্চয় সাড়া দেবেন। .....নমস্কারান্তে।

—অন্নদাশঙ্কর রায়

* *

১/১ কে, যোধপুর পার্ক
কলিকাতা-৬৮
৯ই জানুয়ারী, ১৯৯০

ত্রৈমাসিক 'আলেখ্য' বিংশতিতম বর্ষে উপনীত হয়েছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। কুড়ি বছর না হলেও বহু বছর ধরে 'আলেখ্য' পড়ছি—এবং পড়ে তৃপ্ত ও লাভবান হচ্ছি। আমাদের দেশে উঁচুস্তরের প্রবন্ধ পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। আমি বুঝতে পারি 'আলেখ্য'র পেছনে অর্থবল, জনবল, গোষ্ঠিবল নেই। শ্রীযুক্ত ঘোষালের একক প্রচেষ্টাই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ভবতোষ দত্ত
(এমেরিটাস প্রফেসর অফ ইকনমিকস্,
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা)

* *

১৫, জনতা রোড, কলিকাতা—৭৫
১।২।১৯৯০

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সম্পাদিত আলেখ্য পত্রিকা এবার ২০শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে জানিয়া উল্লসিত হইয়াছি।...আলেখ্য তার জন্মলগ্ন হইতে এ পর্যন্ত যে সু-উচ্চমান বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত। আলেখ্য'র শতায়ু কামনা করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
[গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক]

* *

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। মাঝে মাঝে আলেখ্য পাই—দীর্ঘদিন ধরে আপনি কত ধৈর্যে এই পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রেখেছেন তা জানি। —আমি তো পারলাম না। 'নবজাতক' ১৩ বছর চালিয়ে বন্ধ করে দিলাম—আসল কথা এই -এ সব পত্রিকা কেউ পড়ে না—পড়ে যত বাচাল অশ্লীল পত্রিকা। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য যে পত্রিকাগুলো হচ্ছে তা মেয়েদের অসম্মান। ··· আপনার নিষ্ঠা অতুলনীয়। প্রার্থনা করি আলেখ্য'র সমৃদ্ধি হোক। আপনি সুস্থ থেকে দীর্ঘদিন কাজ করে যান। ইতি—

২৭. ১. ৯০

নিবেদিকা
মৈত্রেয়ী দেবী
১৩/১, পাম এভিনিউ, কলিকাতা-১৯

* *

বিশিষ্ট ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'আলেখ্য' বিশ বছরে পদার্পণ করছে জেনে আনন্দিত হলাম। এই উপলক্ষে পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষালকে আমার সহর্ষ অভিনন্দন জানাই এবং পত্রিকার অব্যাহত অগ্রগতি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

'আলেখ্য' একটি মননশীল পত্রিকা। আজকের দিনে চিন্তা-সমৃদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর সীরিয়াস ধরণের সাহিত্যপত্র চালানো যে কী কঠিন ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ ধারণা করতে পারবেন না। চটুল মানসিকতার দ্বারা অনুবিদ্ধ হাল্কা সাহিত্যের প্লাবনে যে কোন প্রকার সাহিত্যের অভিযান ভেসে যাবার উপক্রম। পুরনো দিনের 'বঙ্গদর্শন', 'সাধনা', নবপর্যায় বঙ্গ-দর্শন, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকাগুলির আদর্শ আজ অবসিতপ্রায়। সুস্থ ও সুন্দর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বোক্ত গৌরবময় পত্রিকা-গুলির ধারা অনুসরণে কোনও নূতন পত্রিকা পরিচালনার জন্যে যে-অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন, তেমন পরিবেশ সমাজে ও সাহিত্যে

আজ শোচনীয়রূপে অনুপস্থিত। তবু এরই মধ্যে বহুতর বাধার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে' 'আলেখ্য' যেভাবে বিগত ১৯ বছর কাল আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পেরেছে তা একপ্রকার অসাধ্য সাধনেরই নামান্তর। এই বিরল কৃতিত্বের মূলে যেমন সম্পাদক ক্ষিতীনবাবুর সুযোগ্য সম্পাদনার একটি গণনীয় ভূমিকা রয়েছে, তেমনি পত্রিকাটিকে বেষ্টন করে' বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-লেখক-গোষ্ঠির মত তিনি যে এক নতুন লেখকগোষ্ঠি তৈরী করে তুলেছেন, তাঁদের রচনাগৌরবও পত্রিকাটিকে বিশিষ্টতা দান করতে কম সহায়তা করছে না।.....

আমি 'আলেখ্য' সাহিত্য পত্রের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনার সঙ্গে সঙ্গে এও মনে প্রাণে চাইব, বর্তমান বাংলা সাময়িক সাহিত্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি আলোকবর্তিকা স্বরূপ কাজ করুক। নেতৃত্বের ভূমিকাই একে মানায়।— **নারায়ণ চৌধুরী**

১১.১.৯০

C. I. T. Building Flat E-8
Madan Chatterjee Lane,
Calcutta-700 007

* *

'ত্রৈমাসিক 'আলেখ্য' দীর্ঘ বিশ বছর পেরিয়ে এল। এর ইতিহাস এক অবিরাম নীরন্ধ্র সংগ্রামের ইতিহাস। শাশ্বত মূল্যবোধ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি পত্রিকাটিকে একমেবাদ্বিতীয়ং করে তুলেছে। তাকে অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করুন। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের কাছে এই আমার সনির্বন্ধ আকুতি রইল।"

জগদীশ নারায়ণ সরকার

২৪.১.৯০

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।]

* *

'আলেখ্য' এবার বিশ বছরে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে

আমি একে আমার সাদর অভিনন্দন এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আলেখ্য সর্বসাধারণের পত্রিকা নয়। এতে রঙ্গমঞ্চের নট-নটীদের কীর্তিকাহিনী নেই, ক্রিকেটারদের নৈপুণ্যের অহেতুক উচ্ছ্বাস নেই, রাজনৈতিক দলদের প্রচার বিভ্রাট নেই। এই পত্রিকাটিতে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কথাই মুখ্য, আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিকটা গৌণ।

আলেখ্য'তে প্রকাশিত লেখা এত উচ্চমানের যে, অনেক সময় কোন কোন লেখা প্রায় গবেষণার পর্যায়ে পড়ে। এ ধরণের উচ্চস্তরের পত্রিকা সহসা চোখে পড়ে না। ···

নানা ঝড়ঝঞ্ঝা সত্বেও আলেখ্য'র মত একটি ছোট পত্রিকার এত দীর্ঘকাল অবিরাম প্রকাশনা এক বিরল এবং আশ্চর্য ঘটনা। শ্রীক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষালের একক প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে ভাবলে আরও অদ্ভুত মনে হয়। শ্রীযুক্ত ঘোষাল নিজেই একাধারে সম্পাদক, প্রকাশক, পরিচালক এবং পরিবেশক। তাঁর ঐকান্তিক যত্ন, নিরলস পরিশ্রম, উচ্চমান রাখা সম্পর্কে কঠোর সচেতনতা, অকৃত্রিম নিষ্ঠা, পত্রিকাটিকে এই উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। শুধু মৌখিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ঋণ শোধ করা যায় না।

আবার আমি 'আলেখ্য-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত
(কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের
প্রাক্তন অধ্যক্ষ)

৮.১.৯০

* *

'আলেখ্য' বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করছে এটা একটা আশার খবর। সাধারণ দৃষ্টিতে একটি পত্রিকার বয়স কুড়ি বছর হওয়া এমন কিছু বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হতে পারে না। কিন্তু

আমাদের দেশে আজকাল যে পরিস্থিতি তাতে সদ্‌ভাবনা-প্রসূত সকল প্রচেষ্টাই বিপদের সম্মুখীন।

ঠিক প্রথম সংখ্যা থেকে না হলেও দু-দশকের কাছাকাছি সময় অবধি আমি 'আলেখ্য' পত্রিকাটি দেখেছি এবং পড়েছি। সর্বদাই সম্পাদক মহাশয় পত্রিকাটির সংস্কৃতিমূলক চরিত্রটি বজায় রেখেছেন। বিষয় বস্তুর নির্বাচন এবং উপস্থাপনা সর্বদাই পাঠকের মানসিক প্রসারণের অনুকূল শুধু তাই নয়, মানসিক শক্তিবর্ধক। সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি সর্বদাই স্পষ্ট, সতেজ এবং নির্ভীক।

জরুরী অবস্থার চলাকালে সম্পাদক মহাশয়ের সমালোচনামূলক মন্তব্য পড়ে আমি শঙ্কিত হতাম যে, সরকারের কোপ না এসে পড়ে পত্রিকা এবং সম্পাদকের ওপর। বস্তুতঃ আমি একাধিক চিঠিতে সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি তাঁর সমালোচনা একটু মোলায়েম করেন। অবশ্য কোন প্রকৃত সম্পাদক অপরের পরামর্শমত চলতে পারেন না—শ্রীঘোষালও চলেননি—তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁর বক্তব্য বলে গিয়েছেন।

'আলেখ্য' পত্রিকা তার স্রষ্টা-সম্পাদকের মানসিক আকৃতির আলেখ্য। সব রচনাতেই লেখকের চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। সকল সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কেই এই একই বাক্য প্রযোজ্য—সৃষ্টি তার স্রষ্টাকেই প্রতিফলিত করে। 'আলেখ্য' পত্রিকার মধ্যে সম্পাদকের যে-প্রতিবিম্ব পাই, তাতে দেখি একজন বহুগ্রন্থপাঠকারী বিদগ্ধ-মানসিকতাসম্পন্ন সমাজসচেতন বুদ্ধিজীবিকে—যিনি সমাজের অপূর্ণতা এবং ন্যায়ের অভাব সহ্য করতে পারছেন না এবং তার প্রতিধাদে মুখর।

বাঙ্গালীর বর্তমান দুর্দিনে 'আলেখ্য'র বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা সমধিক। এধরনের পত্রিকার চলার পথে বাধা অনেক—আর্থিক, সাংগঠনিক এবং বৌদ্ধিক (intellectual)। প্রথম দুটি চেষ্টা করে সংগ্রহ করা যায়—কিন্তু সম্পাদকের পাণ্ডিত্য, সমাজপ্রীতি এবং

সাহসিকতা ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য বলার ক্ষমতা জোগাড় করে দেওয়া যায় না। আমরা তাই আশা করব যে অন্ততঃ আলেখ্য চালাবার জন্য শ্রীঘোষাল দীর্ঘজীবী হবেন। 'আলেখ্য' প্রকাশনার সঙ্গে সংযুক্ত সকলকেই আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নমস্কারান্তে—নিবেদক,

সুভাষচন্দ্র সরকার

১৫.১.৯০ [প্রখ্যাত সাংবাদিক (পাটনার সার্চলাইট দৈনিকের প্রাক্তন সম্পাদক)]

* *

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত 'আলেখ্য' সাহিত্য-পত্রিকার আমি দীর্ঘকাল যাবৎ নিয়মিত পাঠক। প্রকাশিত রচনার পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ও বিষয় বৈচিত্র্য আমার ভাল লাগে। প্রবন্ধের পত্রিকা আজকাল খুবই কম। 'আলেখ্য' এর ব্যতিক্রম। প্রবন্ধ লেখকদের পক্ষে 'আলেখ্য' বড় নির্ভরস্থল। সম্পাদক নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছেন—এজন্য তিনি সকল পাঠক ও লেখকের ধন্যবাদভাজন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩.১.৯০ ১৭৯/১ কাঁকুলিয়া রোড

কলিকাতা-২৯

* *

'আলেখ্য' তার বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করছে জেনে আনন্দ হ'ল। ···এর রচনার মান অত্যন্ত উন্নত। এ পত্রিকা যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য।

বহু পরিণত মনের শস্যসম্ভারের মিলনের ফলে 'আলেখ্য' নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করছে। এ শুধু পত্রিকা নয় : গবেষণার ফলশ্রুতি।

আলেখ্য'র জয়যাত্রা অব্যাহত থেকে বাঙ্গালীর জ্ঞানতৃষ্ণাকে চরিতার্থ করবে—এসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১২৮/১ সন্তোষপুর এভিনিউ
কলিকাতা-৭৫
[ভূতপূর্ব উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়]

৭.২.৯০

আলেখ্যর দ্বাদশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষেও অনেক অভিনন্দন এসেছিল। তার থেকেও কয়েকটি এখানে অংশতঃ উদ্ধৃত করছি।—

পি-১৭এ, আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউ
কলিকাতা-১৯
১৪ই নভেম্বর ১৯৮২

শ্রীক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল
'আলেখ্য' সম্পাদক

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সম্পাদিত 'আলেখ্য' ত্রৈমাসিক পত্রের দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। বারো বছর তো একটা যুগ। এক যুগ ধরে আপনার সঙ্গে ও আপনার প্রচেষ্টার সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট। এই ধরনের পত্রিকাকে ফরাসীরা বলে রিভিউ। এটি ঠিক লিটল ম্যাগাজিন নয়। বরাবরই আপনি পাকা লেখাকে স্থান দিয়েছেন। যখন পাকা লেখকের অভাব হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথের মতো আপনি স্বয়ং স্বনামে বা ছদ্মনামে সে অভাব পূরণ করেছেন। ফলে 'আলেখ্য'র মান বজায় রয়েছে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই সারবান। আর সম্পাদকীয় বিভাগটির তো কথাই নেই। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতোই আপনি নির্ভীক ও নিরপেক্ষ। বিগত এমারজেন্সীর সময়েও আপনি দমে যান নি। স্বাধীনভাবে লিখেছেন ও প্রকাশ করেছেন। সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আপনি আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।

আপনার এ প্রয়াস অর্থকরী নয়। ঘরের খেয়ে আপনি বনের মোষ চরাচ্ছেন। ছাপা কাগজ প্রভৃতির খরচ আজকাল আকাশ-ছোঁয়া। গ্রাহক সংখ্যা যদি না বাড়ে, বিজ্ঞাপন যদি দুর্লভ হয়, তবে আপনি আর কতকাল লোকসান দিয়ে পত্রিকা চালাতে পারবেন তা বিধাতাই জানেন। তা সত্ত্বেও আমি আশা করব যে আপনি আজীবন এ কাজ চালিয়ে যাবেন। এটা শুধু আপনার নয় আমাদের সকলের কাজ। আমরা যারা লিখি ও আমরা যারা পড়ি। এমন এক সময় ছিল যখন আমার লেখা সেনসরের ভয়ে আর কোনো সম্পাদক প্রকাশ করতে চাইতেন না, কিম্বা প্রকাশ করলেও বাদসাদ দিতেন বা দিতে বলতেন। সে সময় 'আলেখ্য'ই ছিল আমার ভরসা……

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানবেন।

ইতি—
আপনার
অন্নদাশঙ্কর রায়

* *

Ratan Palli—Santi Niketan

আলেখ্য সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

'আলেখ্য'র দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি সংখ্যা পেয়ে আনন্দিত হলাম। যে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় এই সাহিত্য সংস্কৃতির পত্র দিয়েছে তাতে মুগ্ধ হতে হয়।……

'আলেখ্য' বাঙালী শিক্ষিতের শুধু আলেখ্য হয়নি, তার অতীত ও ভবিষ্যতের রূপ নিরূপণও করবার চেষ্টা করেছে। শিক্ষার ও রুচির মান যে ভাবে টলমল, তাতে নতুন বাঙালীর সম্ভাব্য ও উপযুক্ত আলেখ্য প্রকাশে নিয়োজিত থাকুন আরও বহু যুগ—পাঠকের আশা ও স্তুতি জানাবার জন্যেই এই পত্র।

ইতি—

৬।১০।৮২ বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৪ বি, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

কয়েক বৎসর পুর্বে কোনো বন্ধুর সৌজন্যে 'আলেখ্য' পত্রিকা প্রথম দেখি। পশ্চিমবঙ্গে পত্রিকার অভাব নেই, তার মধ্যে আলেখ্য'র বৈশিষ্ট্যে একান্ত ভাবেই আকৃষ্ট হই—তদবধি প্রত্যেক সংখ্যাই অনুধাবন করে আসছি। বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধই এ পত্রিকার গৌরব। তার নধ্যে বিশেষ ভাবে পাঠযোগ্য সম্পাদকীয় 'সমাজ-চিন্তা'—দেশ বিদেশের নানা উল্লেখ্য ঘটনা প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ অনুত্তেজিত কিন্তু সুস্পষ্ট মন্তব্য—প্রবাসী পত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিবিধ প্রসঙ্গ'র কথা মনে পড়ে।...

পত্রিকাটির দ্বাদশবর্ষ পুর্ত্তি উপলক্ষে সম্পাদককে অভিনন্দিত করি এবং প্রত্যাশা করি যে, পত্রিকাটির মান আগামী দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষুণ্ণ থাকবে ও তার পরিধি বিস্তৃততর হবে।

শ্রীপুলিন বিহারী সেন
২৪ নভেম্বর, ১৯৮২

* *

২-জি কার্তিক বসু লেন
কলিকাতা-৬

অভিনন্দন

"আলেখ্য" তাহার নাম।
ছোট একখানি বই ছেলেদের ঘরে দেখিলাম।
হবে কি সিনেমা কথা কিম্বা লঘু সাহিত্যবারতা ?
হাতে লইলাম।
আনন্দ সাহিত্যলোক জানা ও অজানা
সাহিত্যের সব পথে যার আনাগোনা ;

সমাজ সংস্কৃতি কাব্য কথা ইতিহাস
সত্য দৃঢ় বাণীময় সরল প্রকাশ ;
পরম ধনের মত আলেখ্য এমন !
লও মুগ্ধ হৃদয়ের এ অভিনন্দন ।

জ্যোতির্ময়ী দেবী

এ রকম বিশেষ উপলক্ষ ছাড়াও মাঝে মাঝে অনেক অভিনন্দন ও প্রশস্তিজ্ঞাপক পত্র আমরা পেয়েছি। তারও ২।১টি এখানে দিলাম।—

* *

.....আপনার সম্পাদনায় 'আলেখ্য' এখনো যে উচ্চমান আজও বজায় রেখে চলেছে তার জন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ। আপনি বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যে ভাবে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে চলেছেন, তা দেখে আমি বিস্মিত হই। প্রত্যেক বিদগ্ধ মানুষ আপনার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতে বাধ্য।.....

(চিঠি প্রাপ্তির তারিখ ১০।১২।১৯৭৬।)

প্রীতিমুগ্ধ
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

* *

২১।১ রসা রোড, সাউথ, থার্ড লেন

আলেখ্য সত্যিকার উচ্চমানের সাহিত্যপত্র হচ্ছে, অথচ কোন বিশেষ শিবিরের মুখপত্র হয়ে ওঠেনি, এজন্য সত্যিই আপনি ধন্যবাদের পাত্র।.....

আপনাদের
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Lake Gardens
Calcutta-45 12. 9. '78

সবিনয় নিবেদন,

হঠাৎ এক সংখ্যা 'আলেখ্য' আমার হস্তগত হলে আনন্দময় বিস্ময় অনুভব করলাম। সাহিত্য পত্র আজ বিরল ও অনাদৃত। হুয়োরাণীর পুত্র জর্নালিজম এখন সুয়োরাণীর পুত্র সাহিত্যকে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন বেদখল করেছে আর পাঠক তাকেই রাজ্যেশ্বর মনে করে ভেট ও ভোট দিচ্ছে। এ বাজারে আলেখ্য সাহিত্যের স্বকীয়তা রক্ষা করছে। ·· ····বাংলা সাহিত্য বাঙালীর ভরসা— বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি আপনারা ভোলেন নি দেখে মনে হল বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা আছে। ····

গুণমুগ্ধ
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

* *

১, বালিগঞ্জ টেরাস
কলিকাতা-২৯
২।২।৮৩

·····এমন একটি পরিচ্ছন্ন, উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা আপনার দক্ষ পরিচালনায় দীর্ঘায়ু লাভ করেছে জেনে সুখী হয়েছি। আপনার নিরপেক্ষ, বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পাদকীয় মন্তব্যকে বৈশিষ্ট দান করেছে।

অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা রাখলাম। ইতি—

আপনার
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

* *

"·· ····চতুর্দিকের এই বিশৃঙ্খলা ও উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে আপনাদের পত্রিকার মননশীল রচনাবলী এবং বিশেষ করে 'সাহিত্য

পরিক্রমা' 'সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' 'সমাজচিন্তা' ও 'গ্রন্থ-সমালোচনা' বিভাগগুলির সুস্থ চিন্তা মনে যুগপৎ বাঙলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ও আনন্দ সৃষ্টি করে।"—

ভট্টোজী দীক্ষিত

* *

....."আপনাদের কাগজটিকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। এ বিষয়ে আমার মতামত আমার পত্রেও পেয়েছেন।"—ভবদীয়

পান্নালাল দাশগুপ্ত

কম্পাস—২১. ১. ৯০

'আলেখ্য, সম্বন্ধে দুটি পত্রিকার অভিমত :—

"এই অসার ঐতিহ্যভ্রষ্ট, আদর্শলক্ষ্যবিমুক্ত পত্রপত্রিকার বেনোজলের বন্যার মধ্যে 'আলেখ্য' এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মনন-শীলতার নিরপেক্ষতার নির্ভিকতার ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সত্যকার আলেখ্য।....

অমৃত—৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৭

"একথার মধ্যে আদৌ কোন বাহুল্য নেই যে 'আলেখ্য'র মত সৎ ও সুস্থরুচি উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা বাংলা ভাষায় খুব বেশী নেই।".....

কথাসাহিত্য—আশ্বিন, ১৩৭৮

* *

অলমতি বিস্তরেণ।

সমাজচিন্তা

মৈত্রেয়ী দেবী

সংবাদটা খুবই অপ্রত্যাশিত। ৩/৪ দিন আগেই ওঁর স্বহস্তলিখিত লিপি পেয়েছিলাম। সেই চিরকালের উষ্ণ আন্তরিকতানিস্নাত শুভেচ্ছালিপি। তখন কী করেই বা জানব বা ভাবব যে মৃত্যু ওঁর এত আসন্ন। অবশ্য গেছেন খুবই ভালোভাবে : না ভুগে, দীর্ঘকাল মৃত্যুর সঙ্গে ব্যর্থ লড়াই না করে। ৭৬ বছর বয়সে মেদবহুল শরীরে হার্ট-এ্যাটাক হওয়া অস্বাভাবিকও ছিল না। আগের দিন স্বামীর স্মৃতিপূত বারাসতের 'খেলাঘর'-এ গিয়েছিলেন, তাঁরই জন্মদিন পালনের উপলক্ষে। দীর্ঘ পথশ্রম এবং সারাদিনের উত্তেজনার ক্লান্তি হৃৎপিণ্ডের কার্যে ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু কাগজে তাঁর অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশিত হবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনতে হবে, এটা কেউ ভাবেনি তখন। কিন্তু সেই অভাবিতই ঘটলো।

মৈত্রেয়ী দেবীর প্রয়াণে বাংলা সাহিত্য এক মহান বাণীশিল্পীকে হারালো। মৈত্রেয়ী দেবীর সব লেখাই সুপাঠ্য তবে তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথকে এমন প্রত্যক্ষগোচর ক'রে উপস্থিত করা—তাঁর ব্যক্তিত্বের সব সৌরভ ও দ্যুতি অক্ষুণ্ণ রেখে—এ আর কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্র-স্মৃতি সুরভিত তাঁর অন্যান্য রচনাও অতীব সুপাঠ্য। কিন্তু তিনি তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর জন্যই বাংলা সাহিত্যে চিরজীবী হয়ে থাকবেন। এ একখানি আশ্চর্য বই—উপন্যাসের চেয়েও মনোহারী। নিজেকে প্রায় অগোচরে রেখে, এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে সবটুকু জায়গা ছেড়ে দিয়ে—তাঁর অপরূপ ব্যক্তিত্বকে পরমনিষ্ঠায় আলেখ্যায়িত করা কেবল মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সাধ্য। মৈত্রেয়ী দেবী তাই ছিলেন। হয়তো কেবল শিল্পীর পক্ষেও তা সাধ্য ছিল না। তাঁর মধ্যে শিল্পী ও ভক্তের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবেও মৈত্রেয়ী দেবী বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য। বার্ধক্যের উপান্তে পৌঁছে তিনি এক অসাধারণ উপন্যাসে তাঁর সেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেন। 'ন হন্যতে' তাঁর আত্মজৈবনিক কথাবস্তুর অপরূপ রূপনির্মিতি —ঔপন্যাসিক রূপান্তর সাধন। এরূপ একটি সার্থক উপন্যাস—এবং প্রথম ও

একমাত্রও বটে—যে, কেউ বার্ধক্যের প্রান্তে পৌঁছে রচনা করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর যেকোনো সাহিত্যেই বিরল। 'ন হন্যতে' একটি অসাধারণ সাহিত্যকৃতি। আখ্যানের দিক দিয়েও যেমন, উপস্থাপনার দিক দিয়েও তেমনি। এবং আগাগোড়া পাঠকের কৌতূহল ও বেদনাকে উদ্রিক্ত করে রাখে বলে' কাব্যরসেও সমুজ্জ্বল।

মৈত্রেয়ী দেবীর প্রয়াণের সাথে সাথে একটা যুগের যেন অবসান হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গমণ্ডলীর আর বড় কেউ বেঁচে নেই। মৈত্রেয়ী দেবী সর্বদা রবীন্দ্রভাবনায় এরূপ ওতপ্রোত থাকতেন যে, ওঁর কথাবার্তায়, কাজকর্মে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো অতি সহজেই ব্যঞ্জিত হোত। ওঁর সমাজসেবার আদর্শের মধ্যেও 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথেরই প্রেরণা কাজ করেছে। এই মানুষটির মৃত্যুতে বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজজীবন থেকে একটি আলোক বিভা অন্তর্হিত হোল।

আঁদ্রেই সাখারভ

গত ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৮৯), সোভিয়েট বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ এবং শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য বিশ্ববন্দিত সংগ্রামী, আঁদ্রেই সাখারভ পরলোকগত হলেন। মৃত্যু খুব আকস্মিকভাবেই তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আগের দিনও তিনি সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আরও বিস্তৃততর করার জন্য রক্ষণশীল সদস্যদের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছিলেন। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করার জন্য এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে সাখারভ এরূপ উচ্চরোল তোলেন যে, পূর্বতন সোভিয়েট শাসকবৃন্দ (ব্রেজনেভ আমলে) তাঁকে নির্বাসিত ও গৃহবন্দী করে' নিজেদের নিরাপদ করেন। কিন্তু তবু তাঁর কণ্ঠস্বর বিশ্ববাসীর কাছে অশ্রুত থাকে না। স্বদেশবাসীদের কানেও, ক্ষীণ সূত্রে হলেও, তা' গিয়ে পৌঁছোয়। এবং সাখারভ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে একজন অসাধারণ প্রবাদপুরুষ হয়ে দাঁড়ান।

তারপর নূতন সোভিয়েত আমলে, প্রেসিডেন্ট গরবাচভ প্রবর্তিত পেরেস্ত্রয়কার বাতাবরণে মুক্ত হয়ে, তিনি বর্তমান সুপ্রীম সোভিয়েটের (পার্লিয়ামেণ্টের) সদস্য নির্বাচিত হন এবং তাঁর অদ্ভুত যুক্তি ও নিষ্ঠার বলে সেদেশের সমাজে ও অর্থনীতিতে গণতান্ত্রিক অধিকার অধিকতর প্রসারিত ও ব্যাপক করার জন্যে সংগ্রাম করে চলেন। মৃত্যুর দ্বারা তিনি আরও

জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলেন এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এক অম্লান অনুপ্রেরণাস্থল হয়ে থাকবেন।

নবম লোকসভা নির্বাচন ও নতুন সরকার

গত নভেম্বরের শেষে লোকসভার নবম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবং তার ফলে কেন্দ্রে নতুন সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেস এবার গরিষ্ঠতা হারিয়ে বিরোধী আসনে গিয়ে বসেছে। সরকার গঠন করেছে তিনটি গোষ্ঠী—জাতীয় মোর্চা—যার প্রধান শরিক জনতা দল—এবং বাম-ফ্রন্ট আর 'ভারতীয় জনতা দল'। এরাই একত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তবে এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বামফ্রন্ট ও বি. জে. পি., সরকারের মধ্যে না থেকে, বাইরে থেকে জাতীয় মোর্চা দলের সরকারকে সমর্থন করবে স্থির করেছে। জাতীয় মোর্চা এখন একক জনতাদলেই পর্যবসিত হয়েছে, দক্ষিণের ডি. এম. কে. ও তেলেগুদেশম্ পার্টি এ নির্বাচনে মুছে যাওয়ার মতো। ওদিকে আসামে ভোটার তালিকার চূড়ান্তকরণ না হওয়ায় এবারকার লোকসভা নির্বাচন সেখানে হতে পারেনি—তাই জাতীয় মোর্চার অন্যতম শরিক অ. গ. প.-ও লোকসভায় অনুপস্থিত। কাজেই কেন্দ্রের সরকারকে জনতা দলের সরকার বললে ভুল বা অন্যায় হবে না।

নতুন সরকারের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। তিনি অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং অবস্থা বুঝে কাজ করতে পারঙ্গম। তাই নতুন সরকার মাটিতে পা ফেলেই ছুটতে সুরু করেছে—অনেক কাজ তার করে ফেলা চাই, দেরী করার অবসর নাও মিলতে পারে। আকাশবাণী ও দূরদর্শনকে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের সঙ্কল্প ঘোষণা ও তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া, প্রথম পদক্ষেপ। দশ হাজার টাকা পর্যন্ত সব কৃষিঋণ মকুব করার সঙ্কল্প, আরেক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। পাঞ্জাবে রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়াসে আকালীদলের (সিমরানজিৎ সিং মান-এর গোষ্ঠীর) প্রতি বন্ধুত্বের হস্তপ্রসারণ এবং পূর্বতন গভর্নর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে সেখান থেকে অপসারণ; এবং কাশ্মীরেও নতুন গভর্নর শ্রীযুক্ত জগমোহনকে নিয়োগ করে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস গঠিত সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা ইত্যাদি অনেক কাজ খুব দ্রুত গতিতে সুরু হয়ে গেছে। তারপর 'বোফর্স' রহস্য উদ্‌ঘাটন। তার উন্মোচনে ও কমিশন গ্রহীতাদের খুঁজে বের করার জন্য, এই সরকার বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না ক'রে বোফর্স কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি রদ করে দিয়েছে, এবং কোম্পানীর পূর্বতন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আর্ডবো-র বিরুদ্ধেই আদালতে মামলা রুজু করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে আরও জনা ১৩ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিরুদ্ধেও। সুইস্ ব্যাঙ্কগুলির উপরও নির্দেশ গেছে যেন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির এ্যাকাউণ্ট 'ফ্রীজ' করে দেওয়া হয়। ওসব নিয়ে পুলিশী অনুসন্ধান করা হবে। সি বি. আই. এর এক বৃহৎ দল এরই মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড রওনা হয়ে গেছে। খুব আশ্চর্য কর্মতৎপরতা এই সরকারের। দেখে শুনে আশা হচ্ছে।

এদিকে কেন্দ্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ দুর্বল সরকার অধিষ্ঠিত হয়েছে অনুমান করে' পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে আবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ফলে পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের আবহাওয়া ঘনায়মান। নতুন সরকারকে বাহাদুরি দিতে হয়—একসঙ্গে এত কিছুতে হাত দেওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানকে সোজা তুরুক জবাব দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাশ্মীরের একমাত্র সমস্যা তাদেরই দুষ্কর্মজাত ; এবং তারা যেন অবিলম্বে তাদের প্ররোচনামূলক কার্যক্রম সাঙ্গ করে এবং তাদের জবরদখলী অংশ থেকে সরে যায়। পাকিস্তানের সঙ্গে শক্ত হাতে মোকাবিলা করার এই নীতি গ্রহণ করে' এই নূতন সরকার তাদের পৌরুষ ও দূরদৃষ্টি দুইই প্রমাণিত করেছে।

পাঞ্জাবেও প্রাথমিক মিত্রতার হাত প্রসারিত করায় উগ্রপন্থীদের উগ্রতা একটুও প্রশমিত না হয়ে, বরং তাকে দুর্বলতা জ্ঞান করে, তারা আরও সন্ত্রাসক হতে সুরু করলে' এই সরকার সমান দৃঢ়তার সঙ্গে সন্ত্রাসের মোকাবিলা সুরু করেছেন এবং তাতে সুফলও ফলছে। কাশ্মীরও ক্রমশঃ শান্ত হবার দিকে।

এইসব কারণে বর্তমান বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর সরকারকে সাধুবাদ দিতেই হয়। আমরা আশা করবো, এই 'সংখ্যালঘু' সরকার পুরো পাঁচ বছরের স্থায়িত্ব লাভ করবে ; কারণ এর দ্বারা দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

পূর্ব ইউরোপের নাটক

পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নাটক তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। সর্বত্রই কম্যুনিষ্ট পার্টি পশ্চাদপসারী। পূর্ব জার্মানীতে বহু দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সাময়িক সরকার গঠিত হয়েছে—তাদের তত্ত্বাবধানে আগামী এপ্রিল মাসে বহুদলীয় প্রথায় সেখানে নির্বাচন হবে। নির্বাচনের পরে নতুন সরকার নতুন সংবিধান বিধিবদ্ধ করবে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর একীভবনও হয় তো খুব দূরবর্তী নয়। পোল্যাণ্ডে অকম্যুনিষ্ট প্রধান মন্ত্রী

সরকার গঠন করেছেন। সেখানেও বহুদলীয় অবাধ নির্বাচন প্রথা স্বীকৃত হলে, এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির গাজুরি-সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিশেষাধিকার রদ হয়ে গেলে, খুব সম্ভবতঃ অকম্যুনিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারই গঠিত হবে এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি নিতান্ত সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। সেই নির্বাচন-পরবর্তী পোলাণ্ডের সংবিধানও যে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ অর্থাৎ ষোলআনা গণতান্ত্রিক হবে, তাতে সন্দেহ নাই। হাঙ্গারী তো ইতিমধ্যেই সেই ঘোষণা করেছে। চেকোস্লোভাকিয়াও আগামী এপ্রিলে বহুদলীয় অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে। বুলগেরিয়াও কম্যুনিষ্ট-পার্টির সাংবিধানিক একাধিপত্য লোপ করেছে। বাকী ছিল রোমানিয়া, চেয়াসেস্কুর অভেদ্য কম্যুনিষ্ট দুর্গ। সেখানেও অবশেষে গণ অভ্যুত্থান ঘটলো। গত ডিসেম্বরে ('৮৯) এক প্রবল ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবির জোয়ার উত্তাল হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। চেয়াসেস্কুর ব্লাডহাউণ্ড রক্ষীদল বা সিকিউরিটি ফোর্স তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার প্রতিবাদীকে হত্যা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই গণবিপ্লব অপ্রতিরোধ্য প্রতিপন্ন হয়। চেয়াসেস্কু সস্ত্রীক বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার পথে ধরা পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে গণ-আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। পত্নীসহ চেয়াসেস্কুকে ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলিতে প্রাণবলি দিতে হয়। দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে এক পাঁচমিশেলি সংঘ, নাম ন্যাশনাল সলভেশন ফ্রন্ট। তাদের মধ্যে চেয়াসেস্কুর অনুগামীরাও গা-ঢাকা দিয়ে অনেকে আছে, এরূপ সন্দেহ লোকে করছে। যা হোক, আগামী জুনে এখানেও মুক্ত, অবাধ বহুদলীয় নির্বাচন হবে এবং নতুন সরকার ও সংবিধান রচিত হবে—স্থির হয়েছে।

সোভিয়েট এজারবাইজানে বিষম দাঙ্গাহাঙ্গামা

সোভিয়েট রাষ্ট্রে এ্যাজারবাইজান ও আর্মেনিয়া দুটি পাশাপাশি প্রদেশ—ক্যাসপিয়ান হ্রদের তটবর্তী দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। এ্যাজারীরা মুসলমান এবং আর্মানীরা খ্রীষ্টান। এজন্য এদের মধ্যে দাঙ্গার, প্রবণতা ছিলই। বিশেষ করে এ্যাজারবাইজানের অন্তর্বর্তী একটি অঞ্চলে, নাগরনি-কারাবাখ্-এ, যা আর্মানী অধ্যুষিত একটি ছিটমহল। পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্ত-এর আবহাওয়ায় সোভিয়েট কেন্দ্রীয় শাসন একটু শিথিল হয়ে পড়ায়, অ্যাজারীরা তাদের অঞ্চলস্থ সব আর্মানীদের নির্মমভাবে কোতল করতে সুরু করে। সে এক ভয়াবহ গণহত্যা। এমন কি এ্যাজারবাইজানের রাজধানী বাকু শহরেও যে সব আর্মানী ছিল তাদেরও খতম করার অভিযান চলে। সোভিয়েট কেন্দ্রীয় শক্তি

অবশ্য হস্তক্ষেপ ক'রে অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আনেন এবং আর্মানীদের নিরাপদ স্থানে অপসারিত করার কাজ সুরু করেন। ওদিকে আর্মেনিয়াতেও আজেরী হত্যা সুরু হয়েছে। দাঙ্গার আগুন কিছুতেই নেভানো যাচ্ছে না। ওদিকে এজারবাইজানের দক্ষিণ সীমান্তের ওপারে ইরান—যা অত্যন্ত উগ্র মৌলবাদী সিয়াপন্থী ইসলামী রাষ্ট্র। তারা প্রতিবেশী মুসলিম এ্যাজারবাইজানের সঙ্গে তাদের সীমান্ত-প্রাচীর ভেঙে ফেলছে। এ্যাজারীরাও তাদের সঙ্গে মিলনোৎসুক হয়ে উঠেছে। এ এক ঘোরতর সমস্যা।

পঃ বঙ্গের পরিস্থিতি

কেন্দ্রে জনতা দল সরকার গঠন করায় এবং সে-সরকার বাবক্রণ্ট সদস্যদের ভোটের উপর একান্ত নির্ভরশীল বলে', পঃ বঙ্গ সরকারের এখন পোয়াবারো। যা কিছু দাবি করছে, কেন্দ্র তাই উদারভাবে তথাস্তু করছেন। একেবারে ভরা পৌষমাস। আমরা এখন পঃ বঙ্গে অনেক নূতন শিল্পোদ্যোগ দেখবো বলে' আশা করছি। হলদিয়া প্রকল্প ও বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র আর স্বপ্ন নয়—বাস্তবায়িত হওয়ার মুখে। পঃ বঙ্গ সরকার উঠে পড়ে কলকাতা উৎসব করতে লেগেছেন, কারণ কেন্দ্র থেকে কলকাতা উন্নয়নে প্রচুর অনুদান প্রাপ্তির আশ্বাস পাওয়া গেছে। এবং এ আমলে আশ্বাস মানেই নগদ প্রাপ্তি।

এ সবই খুব ভালো। কিন্তু পঃ বঙ্গের রাজনীতিতে সেই খুনখারাপির দুষ্টচক্র এখনো আগের মতোই প্রবল। রাজনৈতিক খুন এবং ঘরদোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, এখনো সমান দাপটে চলেছে। পুলিশ তেমনি নিষ্ক্রিয় দর্শক।

রাজনীতিকে দুর্বৃত্ত-বৃত্তিতে রূপান্তরিত করে', অথবা করতে দিয়ে, পঃ বঙ্গের বর্তমান শাসকবৃন্দ বাঙালীর কী ভয়ানক সাংস্কৃতিক ও মানবিক ক্ষতি করে চলেছেন, তা কে তাঁদের বোঝাতে পারবে! (১৬. ২. ৯০)

CENTRAL LIBRARY

With Compliments From :

MACKINNON MACKENZIE & CO. LTD.

BOMBAY CALCUTTA DELHI

16, STRAND ROAD,
CALCUTTA-700 001

Phone : 20-1651 (16 Lines)

Registered with the Registrar of Newspapers
Registration No. R.N. 18431/70
ALEKHYA ★ VOL XX No. 1 ★ Aug.—Oct. 1989

"অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই! আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি,—সাত বছর। সে-পর্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবী মায়ের কোলে গড়াইয়া ধুলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে। সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায়, তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্যসাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস আকাশ মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীর মনের যে একটা স্বাভাবিক টান আছে—সব জায়গাতেই তার যে একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড় দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাত স্থাপন করা যায়, তবে ছেলেটার সব উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইচঁড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে-উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত, বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।"—

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলেখ্য ২০শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা মূল্য ৭·০০ টাকা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক ৩৩-বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬ স্থিত ইম্প্রেশন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৭৫ হইতে প্রকাশিত।

সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ জিজ্ঞাসার মুখপত্র

আলোচনা

২০-শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক—পৌষ, ১৩৯৬

॥ শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আত্মগোপন··· ॥ কালিদাস মুখোপাধ্যায়
॥ আলাপচারী জনসন ॥ দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস
॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার পাঠান্তর··· ॥ দেবকুমার ঘোষ
॥ পশ্চাতের কোলাহল হতে ॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য
॥ শ্রীরামকৃষ্ণের সুখদুঃখ ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত
॥ লা রোশফুকোর প্রবচন মালা ॥ তীর্থরেণু দাস
॥ এছাড়া গল্প, কবিতা, সংস্কৃতিভাবনা, সমাজচিন্তা, গ্রন্থসমীক্ষা ইত্যাদি

সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল

With Compliments from :

M/s. BISWAS ENTERPRISE

MARSHALL HOUSE

Netaji Subhas Road

Calcutta-700 001

SPACE DONATED BY :

A WELL WISHER

CENTRAL LIBRARY

Important Publications of Calcutta University

1. Balaram Daser Padavali—Edited by Dr.Manu Jana, M.A. Ph, D. Rs, 60·00
2. Manasa Mangal—Edited by Dr. Asutosh Das, M.A. (Double) Ph. D., D. Litt. and Late Surendra Ch. Bhattacharyya, Kavya Tirtha (2nd Edition), Rs. 50·00
3. Pranta Uttar Banger Upabhasa—Edited by Dr. Nirmalendu Bhowmick, M.A. Ph. D., D. Litt. (in Bengali), Rs. 60·00
4. Banglar Baire Bangla Gaddyer Charcha (In Bengali) Edited by Dr. Sudhansu Sekhar Tunga, M.A.,D.Litt. Rs. 50·00
5. Varieties of Socialism—Tapan Kr. Chattopadhyay and Dipak Kumar Das—Paper Cover Rs. 28·00
   —Hard Cover Rs. 40·00
6. Catalogue of Paintings of the Asutosh Museum (Niranjan Goswami) (Ram Charita Manasa)— Rs. 250·00
7. Collected Poems—Dr. Monmohon Ghosh—
   Vol I Bs. 25·00
   Vol II Rs. 20·00
   Vol III Rs. 40·00
   Vol IV Rs. 38·00
8. Dictionary of Indian History—Dr. S. Bhattacharyya Rs. 70·00
9. Liberty, Equality, Property and the Constitutions —P. Jagamohon Reddy Rs.90·00
10. Comparative Aspect of the Pituitary Gland— Dr. B.B. Roy Rs. 275·00
11. Political History of Ancient India—Dr. H. C. Roy Chaudhury Rs. 70·00

For other Details please get in touch with Manager,

PUBLICATION CALCUTTA UNIVERSITY

48, Hazra Road, Calcutta-700 019

২০শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

আলেখ্য

কার্ত্তিক-পৌষ
১৩৯৬

॥ সূচীপত্র ॥

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আত্মগোপন ও পণ্ডিচেরি পলায়ন ॥
কালিদাস মুখোপাধ্যায় ॥ ১২১

কবিতা :

কালের মন্দিরা ॥ বিজয় কুমার দত্ত ॥ ১৩১
অকাল বসন্ত ॥ শ্রীমতী প্রতীতি সরকার ॥ ১৩২
আছে হেথা আছে এইখানে ॥ দিলীপ দত্ত ॥ ১৩৩
আলাপচারী স্যামুয়েল জনসন ॥ দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস ॥ ১৩৪
রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার পাঠান্তর ভিত্তিক আলোচনা ॥
দেবকুমার ঘোষ ॥ ১৪২
চুম্বক (গল্প) ॥ সুনীল চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৫৪
পশ্চাতের কোলাহল হতে ॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ॥ ১৬২
লা রোশফুকোর প্রবচন মালা ॥ তীর্থরেণু দাস ॥ ১৭২
শ্রীরামকৃষ্ণের সুখদুঃখ ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ॥ ১৮৫
সংস্কৃতি-ভাবনা ॥ ১৯৯
সমাজচিন্তা ॥ ২০৬
গ্রন্থসমীক্ষা ॥ ২১৬
জড়ভরতের চিঠি ॥ ২২৪

সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল
দপ্তর : ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০৭৫
ফোন : ৭২-১৫৬২

বার্ষিক চাঁদা : ১৫·০০ টাকা
বিদেশে বার্ষিক চাঁদা—৫ ডলার

আ লে খ্য
২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৬

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আত্মগোপন ও পণ্ডিচেরি পলায়ন

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আত্মগোপন ও পণ্ডিচেরি পলায়ন সম্পর্কে অসংখ্য গালগল্প প্রচারিত হয়েছে। এইসব আষাঢ়ে গল্প যাঁরা প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ভগ্নী নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিতকার এ্যাডাম লিজেল রেমঁ, রেমেঁর অনুসরণকারী গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কর্মযোগিন্ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অরবিন্দের সহযোগী রামচন্দ্র মজুমদার এবং রামচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত অরবিন্দের মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্র। কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র সুকুমার মিত্র মূলতঃ রামচন্দ্র মজুমদারকেই অনুসরণ করেছেন। রামচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিকথা লিখেছেন ঘটনার ৩৫ বছর পরে এবং সুকুমার মিত্র স্মৃতিকথা লিখেছেন ৬২ বছর পরে যখন তাঁর বয়স প্রায় ৯০ বৎসর। রামচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "আমি জনৈক সি. আই. ডি'র নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে এবং খুব সম্ভবতঃ সামসুল আলমের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। ...সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমার বাবুর বাড়ী ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলাম। তিনি ধীরচিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া কর্মযোগিন্ অফিসে আসিলেন।" রামচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, এরপর অরবিন্দ ভগ্নী নিবেদিতার নির্দেশে আত্মগোপনের জন্ত প্রস্তুত হন এবং যাত্রার পূর্বে বোসপাড়া লেনে গিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেন।[১] সুকুমার মিত্র লিখেছেন, "ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে

গুজব উঠিল যে, অরবিন্দকে গভর্ণমেণ্ট পুনরায় গ্রেপ্তার করিবেন। একদিন প্রাতে রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, অরবিন্দকে পুনরায় এক মামলায় যুক্ত করা হইবে অথবা নির্বাসিত করা হইবে। কোন দুশ্চিন্তা না করিয়া অরবিন্দ যথারীতি আহারাদি সমাপনান্তে তাঁহার শ্যামপুকুরের কর্মযোগিন্ কার্যালয়ে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কর্মস্থলের সম্মুখে গোয়েন্দা পুলিশ যথারীতি বসিয়াছিল, যেমন থাকিত কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে গোলদীঘিতে দিবারাত্রি অপর একদল গোয়েন্দা। ঐদিন বৈকালে কর্মযোগিন্ অফিসের পিছনের দিকে দেওয়াল টপকাইয়া অরবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন শোভাবাজারের রাজগৃহের ভিতর দিয়া আহিরীটোলার গঙ্গাঘাটে যাইয়া নৌকাভাড়া করিয়া সারারাত্রি নৌকা বাহিয়া রাত্রিশেষে অন্ধকারের মধ্যে পৌঁছিয়া ডুপ্লে কলেজের প্রফেসার চারু রায়ের নিকট আশ্রয় চাহিয়া লোক পাঠাইলেন[২]।" রামচন্দ্র মজুমদার ও সুকুমার মিত্রের বিবরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, সুকুমার মিত্র দেওয়াল টপকিয়ে পলায়নের কথা লিখছেন, রামচন্দ্র মজুমদারের বিবরণে এই রোমাঞ্চকর উপকথার উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ, রামচন্দ্র লিখেছেন, ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শ অনুসরণ করে' এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করে' অরবিন্দ চন্দননগর যাত্রা করেন। সুকুমার মিত্রের বিবরণে ভগিনী নিবেদিতার প্রসঙ্গ আদৌ উল্লিখিত হয়নি। তৃতীয়তঃ, রামচন্দ্র মজুমদারের মতে অরবিন্দ বাগবাজার ঘাট হ'তে যাত্রা করেন, সুকুমার বিত্র লিখেছেন যে, অরবিন্দ আহিরীটোলা ঘাট হ'তে রওনা হন।

রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুকুমার মিত্র উভয়েই ১৯১০ সনে অরবিন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। সুকুমার মিত্র অরবিন্দের চন্দননগর যাত্রার কথা কিছুই পূর্বে জানতেন না, রামচন্দ্র মজুমদার জানতেন এবং তিনি অরবিন্দকে পথ দেখিয়ে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। উভয়েই দীর্ঘদিন পরে শোনা কথার উপর নির্ভর করে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সুকুমার মিত্র চন্দননগর যাবার কথা জানতেন না, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন। তিনি লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দের "অন্তর্ধানে আমরা যত না চিন্তিত হইয়াছিলাম গোয়েন্দা পুলিশ তাহা অপেক্ষা অধিকতর চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে খবর পাই যে তিনি চন্দননগর গিয়াছিলেন।"[৩] সুকুমার মিত্রের স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয় অরবিন্দের দেহাবসানের বাইশ বছর পরে। রামচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয় অরবিন্দের জীবদ্দশায়। তাঁর প্রতিবেদন সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "My old friend

Ramachandra Mazumdar congratutates himself on the strength of his memory in old age. His memory is indeed so strong that he not only recollects, very inaccurately, what actually happened, but recalls also and gives body to what never happened at all. His account is so heavily crammed with blunders and accretions that it may provide rich material for an imaginative and romantic biography of Sri Aurobindo in the modern manner but has no other value "[৪]

রামচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে অনেক ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। সুকুমার মিত্রের স্মৃতিকথাতেও একাধিক ভুল তথ্য প্রচারিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ-শিষ্য মতিলাল রায়কে স্মরণ করতে হবে। ১৯১০ হ'তে ১৯২১ পর্যন্ত মতিলাল ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গদের অন্যতম। সুতরাং মতিলাল প্রদত্ত বিবরণ অনেকেই সঠিক বলে মনে করেন। এমনকি, অরবিন্দ-গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীও বিনা প্রমাণে তাঁর কোন কোন বক্তব্যকে শিরোধার্য করেছেন। অতএব শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর আগমন সম্পর্কিত বক্তব্যের যাথার্থ্য যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। সংঘগুরু মতিলাল তাঁর "যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ" (১৩৭৬ পৃঃ ৩১-৩৪), "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী" (১৯৪৭, পৃঃ ৫৮-৫৯), "জীবনসঙ্গিনী" (১৯৬৮, পৃঃ ১০৪, ১২৮), "শতবর্ষের বাংলা (১৩৭৬, পৃঃ ২২৮) গ্রন্থে এবং মতিলাল-শিষ্য অরুণচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'Light to Super-light' (১৯৭২, পৃঃ ১৮৬) গ্রন্থে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা মোটামুটি এইরূপ :

(ক) সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হবার পরে ভগিনী নিবেদিতা জানতে পারেন যে, ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে উক্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়াবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। নিবেদিতা আচার্য জগদীশ বসুর সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করেন এবং উভয়ে স্থির করেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে আত্মগোপন করবার জন্য অনুরোধ করা হবে। স্বয়ং নিবেদিতা অরবিন্দের কাছে এই প্রস্তাব রাখেন। অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না, কিন্তু প্রায় একমাস পরে প্রত্যাদেশ পেয়ে আত্মগোপন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৫]

(খ) চন্দননগর যাবার অব্যবহিত পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন্ পত্রিকায়

An open letter to my countrymen শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অরবিন্দ যখন চন্দননগরে আত্মগোপন করে বাস করছিলেন তখন এই 'খোলা চিঠি' প্রবন্ধের জন্য প্রকাশক ও লেখককে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

(গ) চন্দননগর আগমনের পশ্চাতে পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনার কথা অরবিন্দ সুকুমার মিত্র এবং রামচন্দ্র মজুমদারকে জানিয়েছিলেন। যাত্রার সঙ্গী ছিলেন দু'জন বা তিনজন। সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং / অথবা বিজয় নাগ। চারুচন্দ্র রায়ের কাছে অরবিন্দের আগমনবার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

(ঘ) অরবিন্দ চন্দননগর যাত্রা করেন আহিরীটোলা ঘাট হতে এবং চন্দননগরে এসে উপস্থিত হন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী।

এখানে বলা প্রয়োজন এই যে, রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুকুমার মিত্রের মতো মতিলাল রায়ও শোনা কথার উপর নির্ভর করে ঘটনার সুদীর্ঘকাল পরে অরবিন্দ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। অরুণচন্দ্র দত্ত Light to Super-light গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৬) মতিলালের বক্তব্যই তুলে ধরেছেন।

এবার সংঘগুরু মতিলালের বক্তব্য বা সিদ্ধান্তগুলি বিচার করে দেখতে হবে।

(ক) ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কলকাতার হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে তরুণ বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের হস্তে সামসুল আলম নিহত হন। বীরেন্দ্রনাথ ধরা পড়ে এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯১০) তার ফাঁসী হয়। সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অরবিন্দকে জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ-বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের কোন কথাই হয়নি। আত্মগোপন করবার জন্য নিবেদিতা কোন পরামর্শও দেননি। চন্দননগরে অরবিন্দের আত্মগোপনের পূর্বে সেই সম্পর্কে নিবেদিতার কোন ধারণাই ছিল না, এ-বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না।[৬] অরবিন্দ চন্দননগর যাত্রা করেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। অরবিন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে (১৯৭২) দু' জায়গায় লিখেছেন দশ মিনিটের মধ্যে, অন্যত্র লিখেছেন পনেরো মিনিটের মধ্যে যাত্রা করেন। সুরেশ চক্রবর্তী তাঁর "স্মৃতিকথা" (১৯৬২) গ্রন্থে লিখেছেন আধঘণ্টার মধ্যে যাত্রা করা হয়। দেখা গেল যাত্রার পূর্বে কারো সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ ছিল না। সুতরাং স্বীকার করতে হবে শোনা কথার উপর নির্ভর করে মতিলাল বিভ্রান্ত

হয়েছেন। তিনি 'জীবন-সঙ্গিনী' (১৯৬৮, পৃঃ ১২৮) গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীঅরবিন্দ আত্মগোপনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তবে কথায় কথায় তিনি শুনেছিলেন যে, ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধেই অরবিন্দ শেষ পর্যন্ত আত্মগোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(খ) অরবিন্দ নিবেদিতার পরামর্শ অনুসরণ করে চন্দননগরে আত্মগোপন করেননি, তবে সামসুল হত্যাকাণ্ডের প্রায় ছয়মাস পূর্বে এবং চন্দননগরে আত্মগোপন করবার প্রায় সাত মাস পূর্বে ভগিনী নিবেদিতা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারেন যে, ইংরেজ সরকার অরবিন্দকে ভারতবর্ষ হতে নির্বাসিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগ্নী নিবেদিতা একবার অরবিন্দকে বৃটিশ-ভারত হতে সরে যাবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। অরবিন্দ নিবেদিতার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। পরিবর্তে অরবিন্দ কর্মযোগিন্ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি যদি একটা কর্মসূচী রেখে যান—যে কর্মসূচী তিনি নির্বাসিত হলেও দেশবাসী অনুসরণ করতে পারবে, তা হ'লে তাঁকে আর নির্বাসিত করবার প্রয়োজন সরকার অনুভব করবে না। তিনি কর্মযোগিন্ পত্রিকায় (৩১শে জুলাই, ১৯০৯) An open letter to my countrymen শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধটিকে অরবিন্দ তাঁর last will and testament বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে অরবিন্দের অনুমানই সত্য পরিণত হলো। ভগ্নী নিবেদিতা অরবিন্দকে জানান যে, তাঁকে নির্বাসিত করবার সিদ্ধান্ত সরকার পরিত্যাগ করেছে।[৭] উক্ত প্রবন্ধে অববিন্দ লিখেছেন—

"Rumour, that Calcutta Police submitted a case for my deportation to the Government. In case of my deportation and if I do not return from it, it may stand as my last political will and testament to my countrymen."

1. "Strict regard to law—self-help and passive resistance.
2. No Control, no co-operation.
3. United Congress.
4. Boycott—Political and economic.
5. Organisation of provinces.
6. Co-operation among the workers.

উপরিউক্ত খোলা চিঠির জন্ত অরবিন্দকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি, তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন। গোয়েন্দা দপ্তর খোলা চিঠিকে রাজদ্রোহাত্মক বলেই মনে করেছিল। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ্.এ.স্টুয়ার্ট। ১৯০৯ সনের ১৩ই আগষ্ট এক প্রতিবেদনে অরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা দায়ের করা যেতে পারে কিনা বড়লাটকে তা বিবেচনা করে দেখতে বলেন। বড়লাটের একান্ত সচিব তাঁর গোপন রিপোর্টে বললেন, খোলা চিঠি নিয়ে মামলা করলে সরকার জয়ী হতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণিত না হলে জনমানসের উপর অরবিন্দের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যাপক প্রচার লাভ করবে এবং এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অনেক বিচার-বিবেচনার পরে ১৯১০ সনের ২৭শে আগষ্ট বড়লাট অরবিন্দের বিরুদ্ধে খোলা চিঠির (৩১শে জুলাই, ১৯০৯) জন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "If Aurobindo is to be prosecuted at all I would base the prosecution on less guarded pronouncement than the 'open letter'. ।[৮]

১৯শে জুলাইয়ের খোলা চিঠি প্রকাশিত হবার প্রায় পাঁচ মাস পরে, শামসুল আলম হত্যার প্রায় একমাস পূর্বে, চন্দননগর যাত্রার প্রায় দুই মাস পূর্বে ১৯০৯ সনের ২৫শে ডিসেম্বর কর্মযোগিন্ পত্রিকায় অরবিন্দের দ্বিতীয় খোলা চিঠি—To my countrymen—প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সরকার এই রচনাটিকে রাজদ্রোহাত্মক বিবেচনা করে এবং অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। ১৯১০ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকালে অরবিন্দ যখন কর্মযোগিন্ অফিসে কর্মরত তখন রামচন্দ্র মজুমদার এসে বলেন, তিনি গোপনসূত্রে খবর পেয়েছেন যে, পরের দিন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১০) কর্মযোগিন্ কার্যালয়ে খানা তল্লাশি করা হবে এবং অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হবে। বিষয়টি নিয়ে অরবিন্দ যখন সহযোগী ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন সেইসময় অরবিন্দ হটাৎ প্রত্যাদেশ পান 'চন্দননগর যাও'। এই প্রত্যাদেশ পাবার অব্যবহিত পরেই অরবিন্দ চন্দননগর যাত্রা করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার পুলিশ অরবিন্দকে খুঁজে পেলো না। সম্ভবতঃ এইজন্ত কর্মযোগিন্ কার্যালয়ে খানা-তল্লাশি করা হয়নি[৯] এবং অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও জারি করা হয়নি। চন্দননগরে

আত্মগোপন করে থাকার সময় রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা করা হয়নি। এপ্রিলের প্রারম্ভে পণ্ডিচেরি পৌঁছবার পরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় প্রবন্ধের লেখক অরবিন্দের বিরুদ্ধে এবং প্রকাশক মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে। নিম্ন আদালতে মনোমোহন ঘোষের ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, কিন্তু উচ্চ আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণিত হয় না এবং তিনি বেকসুর মুক্তিলাভ করেন। অরবিন্দ বৃটিশ আইন ও আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে ফরাসী পণ্ডিচেরিতে আত্মগোপন করে থাকায় ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারেনি। শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় তাঁর Two Great Indian Revolutionaries (১৯৬৬, পৃঃ ৩১-৪০) গ্রন্থে লিখেছেন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হবার পরে অরবিন্দ চন্দননগরে চলে আসেন, একথা ঠিক নয়।[১০]

(গ) অরবিন্দের চন্দননগর আগমনের পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা ছিল না। দৈবাদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যাত্রা করেন, কাউকে কিছু বলবার সময় ও সুযোগ ছিল না। এই যাত্রা সম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্র মজুমদার, সুকুমার মিত্র বা অন্য কাউকে কিছু বলতে পারেননি বা বলেননি[১১]। সুকুমার মিত্র নিজেই বলেছেন চন্দননগর যাত্রা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। সুকুমার মিত্রের বক্তব্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অরবিন্দ পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে চন্দননগর যাননি, কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি "চন্দননগরের বিপ্লবকেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত" চারুচন্দ্র রায় এবং তাঁর অনুগামীদের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। চন্দননগরে উপস্থিত হয়েই তিনি তাঁর প্রতিনিধি বীরেন ঘোষকে চারুচন্দ্র রায়ের নিকট প্রেরণ করেন। চারুচন্দ্র রায় অরবিন্দকে আশ্রয় দিতে সাহস পেলেন না, কিন্তু তাঁর অনুগামী তরুণ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এবং মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়কে না জানিয়ে চন্দননগরে অরবিন্দের আত্মগোপনের ব্যবস্থা করেন। নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বারীন্দ্রনাথ-পরিচালিত মানিকতলা বিপ্লবকেন্দ্রের যোগাযোগ ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের "রক্ত-বিপ্লবের এক অধ্যায়" গ্রন্থ (১৩৬১) হতে জানা যায়, অরবিন্দ রাত্রেই চন্দননগরে এসে উপস্থিত হন, শ্রীশচন্দ্র রাত্রেই চারুরায়ের বাড়ী গিয়ে অরবিন্দের আগমন বার্তা পান, রাত্রেই শ্রীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে সব কথা বলেন। সেই সময় নরেন্দ্রনাথের মাতুলের আসবার কথা ছিল। এইজন্য নরেন্দ্রনাথ তখনই

অরবিন্দের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসুবিধা বোধ করেন। মাতুল কয়েকদিন পরে চলে যাবার পরে নরেন্দ্রনাথের পক্ষে অরবিন্দকে আশ্রয়দান করা সম্ভব ছিল। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র পরামর্শ করে স্থির করেন সাময়িকভাবে মতিলালের কাছে অরবিন্দকে রাখা সম্ভব হলে সেই ব্যবস্থাই হবে যুক্তিসঙ্গত। নরেন্দ্রনাথও শ্রীশচন্দ্র অনুসন্ধানের জন্য রাণীর ঘাটে যান এবং অনুসন্ধানে তথায় অরবিন্দের অবস্থানের কথা জানতে পারেন। ভোরে শ্রীশচন্দ্র মতিলালকে সংবাদ দেন, মতিলাল নৌকা হ'তে অরবিন্দকে নিজগৃহে নিয়ে আসেন (পৃঃ ৫৩-৫৪)। নরেন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে মতিলালের বক্তব্যের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। নরেন্দ্রনাথের 'রক্ত-বিপ্লবের এক অধ্যায়', বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিবেদন' এবং অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূমিকা' সহ প্রকাশিত হয় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের পূর্ণিমার দিন—৫ই বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৪)। গ্রন্থ প্রকাশের সময় মতিলাল বর্তমান ছিলেন। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের বক্তব্য মূলতঃ সঠিক বলে গ্রহণ করা চলে।

চন্দননগর যাত্রায় অরবিন্দের সঙ্গে কে কে সঙ্গী হয়েছিলেন এবং কে বা কারা অরবিন্দের আগমন বার্তা চারুচন্দ্র রায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তা নিয়ে মতিলাল সংশয় সৃষ্টি করেছেন। অরবিন্দের চন্দননগর যাত্রায় কে কে সঙ্গী হয়েছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে মতিলাল দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। কখনো বলেছেন অরবিন্দের সঙ্গে এসেছিলেন দু'জন, কখনো বলেছেন তিনজন। সঙ্গী হিসাবে তিনি নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং বিজয় নাগের নাম উল্লেখ করেছেন। নলিনীকান্ত এবং বিজয় নাগের মধ্যে অন্ততঃ একজন যে এসেছিলেন এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মতিলাল অনুমানের উপর নির্ভর করে বিভ্রান্ত হয়েছেন—নলিনীকান্ত বা বিজয় নাগ অরবিন্দের সঙ্গে আসেন নি, এসেছিলেন বীরেন ঘোষ এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সাক্ষ্য হিসাবে অরবিন্দের আত্ম-জীবনী (Sri Ahrobindo on Himself) এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর "স্মৃতি-কথা" (১৯৬২) গ্রন্থদ্বয়কে আহ্বান করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো চন্দননগরে উপস্থিত হয়ে কে বা কারা চারুচন্দ্র রায়ের কাছে অরবিন্দের সংবাদ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। মতিলাল একাধিকবার লিখেছেন যে, চারু রায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল সুরেশ চক্রবর্তীকে। সুরেশচন্দ্র তাঁর "স্মৃতি-কথা" গ্রন্থে বলেছেন, চারুরায়ের কাছে তিনি যান নি, চারুরায়ের কাছে অরবিন্দের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিলেন বীরেন ঘোষ। এই প্রসঙ্গে

অরবিন্দের জীবনীকার এ. বি. পুরাণীর প্রতিবেদন বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেছেন, চারুরায়ের কাছে অরবিন্দের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র এবং বীরেন ঘোষ। চারু রায় অরবিন্দকে আশ্রয় দিতে ভয় পেলেন। পরে কোন এক শিশির ঘোষ, মণি (সুরেন্দ্রচন্দ্র) ও বীরেনকে মতিলালের কাছে নিয়ে যান। প্রকৃত ঘটনা, চারু রায়ের কাছে একমাত্র বীরেন ঘোষই গিয়েছিলেন এবং কোন শিশির ঘোষ মতিলালের কাছে সুরেশচন্দ্র বা বীরেন ঘোষকে নিয়ে যান নি। মনে হয় পুরাণীর হাতে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ শিশির ঘোষে রূপান্তরিত হয়েছে (১২)।

(ঘ) ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের কোন্ দিন অরবিন্দ চন্দননগরে এসে উপস্থিত হন সে-কথা একমাত্র মতিলাল ব্যতীত অন্য কেউ-ই সঠিক-ভাবে বলতে পারেন নি। মতিলাল তাঁর একাধিক গ্রন্থে আনুমানিক সময় নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ১৯৫০ সনের ১৬ই-মে নগেন্দ্রনাথ গুহরায়কে এক পত্রে বলেন, অরবিন্দ সরস্বতী পূজার পরের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে আসেন (১২ক)। এর কিছুকাল পরে তিনি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে অরবিন্দ সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করেন। উক্ত রচনাই 'যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে এবং 'যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে মতিলাল জোরের সঙ্গে বলেন, অরবিন্দ ১৫ই ফেব্রুয়ারি নয়—২১শে ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে এসে উপস্থিত হন। মতিলাল কীভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা তিনি বলেন নি। তবে ঘটনার পারম্পর্য অরন্দিগ্ধভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারিরই নির্দেশ দেয়। অরবিন্দ যে ১৫ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ আছে। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুনের সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকা (২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১০) হতে জানা যায়, ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে নির্বাসিত নয় জন নেতা ১৯১০ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারি রবিবার মুক্তি লাভ করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং সতীশ চ্যাটার্জি রেঙ্গুন মেল ষ্টীমারে কলকাতায় আসেন। তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অরবিন্দ চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত ছিলেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারি সোমবার ছিল সরস্বতী পূজা। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে চারুচন্দ্র রায় চন্দননগরে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সারস্বত উৎসবে মতিলাল তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, চার পাঁচ দিন ঘর-সংসারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। উৎসব সমাপনান্তে মতিলাল পুনরায় সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মতিলাল লিখেছেন, "অতিশয়

উৎসাহের সঙ্গে সংসার ধর্মে মাতিয়া উঠিলাম। কেবল স্থির করিলাম—রবিবার অবসর থাকিবে। কেননা ঐ দিন আমার গৃহে যে সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা যাহাতে বন্ধ না হয়, ইহাই আমার লক্ষ্য ছিল (১৩)।" মতিলাল "যুগ পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ" (১৩৭৬) গ্রন্থে লিখেছেন, সারস্বত উৎসব সমাপনান্তে 'ফাল্গুনের প্রভাতে' চারুচন্দ্র রায় যখন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বিশ্রাম করছিলেন সেই সময় অরবিন্দ চন্দননগরে আসেন (পৃঃ ৩৪)। ২০শে ফেব্রুয়ারি ছিল রবিবার। মতিলাল তাঁর সাহিত্য সভার কাজ যথারীতি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন মনে করাই যুক্তিসঙ্গত—যদি বাধা পড়তো তা হলে মতিলাল নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করতেন। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, অরবিন্দ ২১শে ফেব্রুয়ারি সোমবার চন্দননগরে এসে উপস্থিত হন। (ক্রমশঃ)

পাদটীকা :

১. উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫২, পৃঃ ২৩০-৩১।
২. শ্রীঅরবিন্দঃ যেমনটি দেখিয়াছি জানিয়াছি (প্রবর্তক, আশ্বিন, ১৩৭৯, পৃঃ ২০১)।
৩. প্রবর্তক, আশ্বিন, ১৩৭৯, পৃঃ ২০১।
৪. Sri Aurobindo on Himself (১৯৭২), পৃঃ ৬১-৬২।
৫. 'যুগ-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সামসুল আলমকে হত্যা করা হয় ২৩শে জানুয়ারি। সঠিক তারিখ ২৪শে জানুয়ারি (১৯১০)। সংঘগুরু মতিলাল 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪) ২৪শে জানুয়ারিই নির্দেশ করেছেন। 'জীবন-সঙ্গিনী' গ্রন্থে (পৃঃ ১০২) সামসুল আলম পরিবর্তিত হয়েছে সামসুল হুদায়। মুদ্রণ প্রমাদ বলেই মনে হয়।
৬. Shri Aurobindo on Himself (১৯৭২), পৃঃ ৬২-৬৩।
৭. Sri Aurobindo on Himself (১৯৭২), পৃঃ ৬২।
৮. উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়ঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান (১৯৭২), পৃঃ ৪৩-৪৫।

৯. Aurobindo on Himself (১৯৭২) গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে অফিস খানাতল্লাসি করা হয় নি এবং ৫৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে খানা তল্লাসি করা হয়েছিল।

১০. Sri Aurobindo on Himself (১৯৭২), পৃঃ ৭১।

১১. Sri Aurobindo on Himself (১৯৭২), পৃঃ ৬৩।

১২. Life of Sri Aurobindo (১৯৬১), পৃঃ ১৫৩।

১২ক. নগেন্দ্রকুমার গুহরায় : মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ, পৃঃ ৯২।

কালের মন্দিরা

বিজয়কুমার দত্ত

সময়ের ভাষা আছে, ভাষ্য আছে নিহিত গোপনে
অবিকল মানবিক বোধ ও বোধির
পাপ-পুণ্য, নিষেধের ঘেরাটোপ, তারও বুকে থাকে—
তাকে বদলে দিতে পারে, একমাত্র কবি ও প্রেমিক
অতীতের ছায়া থেকে উঠে আসে নব-বর্তমান
বিন্দু থেকে সিন্ধু হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বীজ

শিল্পের অমেয় জাদুবিদ্যার সম্মোহে
ক্লাসিক সৃষ্টির মত, রাজন্যবন্দনা গান
গেয়ে উঠতে গিয়ে—
সময়ের কণ্ঠে বাজে জনগণ-মানস কোরাস।

আমি কবি, সময়কে নতুন কাঠামো দিতে চাই
সেই আমি প্রেমিক স্বভাবে
সে কাঠামো ভেঙে চুরে পুরনো বৃন্তের মধ্যে আনি
সময়ের মায়াবী কৈশোর

কবি ও প্রেমিক দ্বন্দ্বে আমি যত ধ্বংস হতে থাকি
সময় অনন্ত ভাষা ফিরে পায় শূন্য মহাকালে।

অকাল বসন্ত

শ্রীমতী প্রতীতি সরকার

'দখিনা বাতাস কি কথা কও ?'
'খেয়ালী জগতে খেয়ালী হও।'
অলস শীতের অলস মায়া
এখনো ধরিতে পারেনি কায়া।
এখনি তরীর বাঁধন ফেলে'
দাও তারে দাও উজানে ঠেলে।
এখনো নিজেকে বোঝনি তুমি,
কেন আছ গিরি শিখর চুমি।
এখনো অবুঝ ঘুমের মত
গহন বিজনে প্রহর যত—
তুহিন জড়তা দিতেছে ভাঙ্গি
আলোকে আকাশ উঠিল রাঙি।
নামো হে ঝর্ণা ঝরিয়া পড়ো
স্নেহরসে ধরা ধন্য করো।

খেয়ালী জগতে খেয়ালী হাওয়া
ভুল সবি তার আসা ও যাওয়া।
তবু কেন মিছে কান্না কাঁদি—
নিখিল ভুবন রাখিবে বাঁধি।
দেখ ঝরাপাতা ঝরিয়া পড়ে,
জাগে কিশলয় কলস্বরে,
মরুভূমি দেখ করিছে ধূ-ধূ
আকাশ চাহিয়া রয়েছে শুধু।
দেখ দেখি লোক কিভাবে বাঁচে !
এ ভাবে বাঁচার মূল্য আছে ?
তবুও বাজায় হৃদয় বীণা
কত অচেনারে হতেছে চিনা
তবু এ আকাশ মেঘ মেদুর
যেজন দয়দী সে যে নিঠুর।

ভাঙ্গিছে গড়িছে খেলিছে কত
হয়না কিছুতে মনের মত।
কোথায় উৎস কোথায় শেষ
চলি যে সবাই নিরুদ্দেশ।
খেয়ালী স্রোতের খেলায় মাতি
জীবন-মরণ মালিকা গাঁথি।

আছে হেথা আছে এইখানে

দিলীপ দত্ত

কখন যে সুন্দর আসে এ জীবনে, কী জানি ?
দিনের পর দিন শুধু তালিকাই বেড়ে চলে—
গ্লানি আর হতাশার, ধূ-ধূ মরু-শূন্যতার বোঝা।
সিগারেটের ধোঁয়ায় ছাই হয়ে যায় যত আবর্জনা,
পায়ের তলায় পিষে যাই প্রতিটি বর্তমানের শব,
তার অন্তিম-যাত্রায় আমরা কেউ অংশ নিই না।

সারাটা জীবন শুধু খুঁজেই গেলাম—
এ নয়, ও নয়, সে নয়,—অন্যতর কিছু।
কে যেন বলেছিলেন না, কবিতার লাইনে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে" !
প্রস্থতি ভর্তির লাইন থেকে বৈদ্যুতিক চুল্লীর ঘুমপুরী—
ক্লান্তির ঘামে ভেজা শুধু একটাই কথা—'নেই, সে সুন্দর নেই'।

সব কিছু পার হয়ে একসময় মন রিক্ত হয়ে আসে।
তাকাই পিছনে,—উপচিত গ্লানি আর আবর্জনার স্তূপে।
বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে পড়ে আছে শুধু রাশি রাশি ফুল—
রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে-সুরের যাদুতে স্বপ্নপুরী যেন।
আস্বাদ নিতে দিলে না কবি, (শুনতে কি পাচ্ছো তুমি !)
তোমার কথায় বিভ্রান্ত করে কবি প্রতি মুহূর্তের সুন্দরের স্বাদ !

হায় প্রতারক ছলনাময়, জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক !
বর্তমানকে চিতায় তুলে বলো না কবি, কী পেলে তুমি ?
আমি তো কবি নই, আমার কথা কেই বা শুনবে ?
পারো না কি একবার, আর একবার আমাদের কাছে এসে
তোমার কবিতার লাইন সংশোধন করে লিখে দিয়ে যেতে—
'হোথা নয়, সেথা নয়,—আছে হেথা, আছে এইখানে' !

আলাপচারী স্যামুয়েল জনসন

দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস

আলাপচারীরূপে ডঃ জনসনের প্রসিদ্ধি কালজয়ী ; তাঁর ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অবদানকে তা ছাপিয়ে গেছে। বাক-চাতুর্য্যে তাঁর প্রতিভা সক্রেটিস, প্লেটো, মার্টিন লুথার, কোলেরিজের সমপর্যায়ের। এর দুটো কারণ। প্রথমতঃ তাঁর জীবনীকার বস্‌ওয়েলের অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা, দ্বিতীয় কারণ তদানীন্তন সাংস্কৃতিক পরিবেশ। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে Stuart রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর, ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র আর রাজসভায় সীমাবদ্ধ রইল না ; ছড়িয়ে পড়ল মহানগরী লন্ডনের মনীষীদের মধ্যে। এঁরা Tavern ও Coffee house-এ নানা বিষয়ে আলোচনারত থাকতেন ; নানা হাস্যরসিকতায় মজলিশ সরগরম থাকত। ক্রমে বাক-চাতুর্য্যে জনসন আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চলত ; Mitre Inn, Literary Club নানা Tavern—সেকালের সাংস্কৃতিক তীর্থস্থান। বিশ্বকবি সেকস্‌পীয়রের জীবন, আমাদের কাছে ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন ; কবি তাঁর সৃষ্ট নাটক ও অভিনয় নিয়ে মেতেছিলেন। এক আধটুকুই যা জানা যায়—যেমন ফুলার লিখে গেছেন—একবার বিশ্বকবি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেন জনসনের সঙ্গে বাক-যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন ; তাঁর বিস্ময়কর প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ও সুদূর প্রসারী কল্পনা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। আশ্চর্য হবার কিছু নেই : হ্যামলেট পরপর সব সভাসদদের—বৃদ্ধ পোলোনিয়স থেকে শুরু করে অস্‌রিক, রোজেনক্রান্ট, গিলডেনষ্টার্ন—সবাইকে কথার মারপ্যাঁচে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। —কিন্তু নাটকের বাইরে বিশ্বকবিকে আমরা সামান্যই জানি। যেমন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'থামখেয়ালীর আসরে' কি কথা বলতেন, আমাদের কাছে অজ্ঞাত। শুধু শেষজীবনের কিছুটা রসাত্মক বাক্যালাপ রাণী চন্দ লিখে রেখেছেন তাঁর 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' পুস্তিকায়। কিন্তু এ তো বাক্যালাপ নয়, সুরের বা সানাইয়ের মনোমুগ্ধকর আলাপ। রাণীচন্দ বা সচিব অনিলচন্দ উপলক্ষ্য মাত্র, কবি একাই কথা বলে যাচ্ছেন—তখন সাহিত্যসৃষ্টি বন্ধ—কথাই সাহিত্য।

ডঃ জনসনের ক্ষেত্রে অবস্থাটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; তাঁকে বাক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হোত ; তদানিন্তন মনীষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন তিনি ; কখনও

Tavern-এ, কখনোও বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে। সঙ্গীরা এক একজন বিভিন্ন দিকে দিকপাল, যেমন বার্ক, বস্তুয়া রেনল্ড, গোলড্‌স্‌মিথ, ডঃ অ্যাডামস, ডঃ পার্সি, ডঃ মাসগ্রেভ, ডঃ রবার্টসন, আরো অনেকে। প্রতিটি মজলিশে ডঃ জনসনের স্থান সর্বাগ্রে। মেধা, বিদ্যা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি বাক-চাতুর্য তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন রাখত। এ বিষয়ে তিনি নিজেও সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। একবার এক Tavern-এ টেবিলের পুরোভাগটা fireplace এর অতি নিকটে থাকায় জনসন ঘেমে উঠছিলেন আগুনের উত্তাপে ; কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না—শ্রেষ্ঠ আসনটি ত্যাগ করা চলবে না ; আর কেউ ঐ আসনে বসবে এটা তাঁর অসহ্য। তাঁর মনও সব সময় তৈরী ; সবাইকে যুক্তিতে, কথার ঝিলিকে হকচকিয়ে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য : একবার জনসন কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন ; এ অবস্থায় খবর পেলেন বার্ক আসছেন দেখা করতে ; হঠাৎ খবরটা পেয়ে আঁৎকে উঠলেন ; বললেন এখন যদি বার্কের সম্মুখীন হ'তে হয়, তাহ'লে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য—That fellow will kill me। অর্থাৎ বার্ক কী শ্রেণীর প্রশ্ন করতে পারেন, সম্ভাব্য আলোচনা আগেভাগে ভেবে রাখতে হবে। বাক-চাতুর্য একটা আর্ট ; শুধু প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই যথেষ্ট নয় ; এজন্য রীতিমত কসরত করতে হয় ; কল্পনার প্রসারতায়, উপমার প্রাচুর্যে কিস্তিমাৎ করতে হবে। কথার মারপ্যাঁচ অনেকটা কুস্তির কৌশলের মত—বাচনভঙ্গীকে সুষমামণ্ডিত করা সহজসাধ্য নয়। Wit শব্দটির যথার্থ বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নেই ; কবি পোপ এর একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—That which has been so often thought, but never so well expressed। অনেক কিছুই তো আমরা ভাবি, কিন্তু সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারি কি ? জনসনের প্রকাশ ভঙ্গিমা ছিল অনবদ্য ; আগে থেকেই মনে মনে তর্জমা করে রাখছেন ; এরও প্রমাণ আছে। একবার ল্যাংটন সাহিত্যিক অ্যাডিসনের বাক-চাতুর্যের একটা উদাহরণ দিচ্ছিলেন : 'I have nine pence in my pocket, but I can draw for a hundred pound'। আমার ট্যাঁকে অর্থ না থাকলে কি হয়, বাজারে credit যথেষ্ট। উক্তি শুনে জনসন বলে উঠলেন ; এটি আগে থেকে ভেবে রাখা কথা ; প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নয়। ল্যাংটন বসওয়েলের দিকে চোখ টিপে হেসে বলে ফেললেন ; A fine surmise. Set a thief to catch a thief ! চোর ধরতে চোরকে লেলিয়ে দিতে হয়। জনসনের আগে থেকে ভেবে রাখা অনবদ্য

সব তীক্ষ্ণ উক্তি দৈববাণীর মত শোনাত। বিষয়টি যতই তুচ্ছ হোক না কেন, শেষ কথাটা তিনিই বলতেন।

তাঁর বাক-প্রতিভা সক্রেটিসের ঠিক উল্টো ধরনের ; গ্রীক দার্শনিক দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার মাধ্যমে প্রাঞ্জল করে তুলতেন। ডঃ জনসন অতি সাধারণ কথাকেও দার্শনিক স্তরে তুলে ফেলতে পারতেন। কথা হচ্ছিল দিনপত্রী রাখা সম্পর্কে—প্রতি দিনের অতিসাধারণ ক্রিয়াকর্মকে লিপিবদ্ধ করা ঠিক কিনা—এটাই প্রসঙ্গ। ডঃ জনসন বলে চললেন : There is nothing, Sir, too little for so little a creature as man. It is by studying little things that we attain the great art of having as little misery and as much happiness as possible. কত ছোট সব ঘটনা জীবনের সান্ত্বনাস্থল হয়ে ওঠে, কত বিরাট ব্যক্তিত্ব সাধারণ ঘটনার মাধ্যমে অমর হয়ে থাকে। কথাকে ঘুরিয়ে তীর্যক, তীক্ষ্ণ করে তোলার উদাহরণ জনসনের কথায় অফুরন্ত। প্রথম দর্শনেই বস্‌ওয়েল জনসনের তীক্ষ্ণ উক্তিতে হকচকিয়ে ওঠেন। স্কটদের প্রতি এঁর বিরূপ মনোভাব—অনেকটা ল্যাম্বের মত—বসওয়েল আগে থেকেই জানতেন। তাই স্কটল্যাণ্ড তাঁর দেশ একথাটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁর এক বন্ধু মজা করার জন্য এ তথ্যটি ফাঁস করে দেন। সলজ্জভাবে বসওয়েল বললেন—I come from Scotland ; I cannot help it. জনসন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : That, Sir, I find, is what a great number of your Cuntrymen cannot help. এই হচ্ছে জনসনের সরস, তীক্ষ্ণোক্তির ধরণ। অনেকে লেখায় নানা বক্রোক্তি করে থাকেন ; যেমন বর্তমানকালের প্রবাসী বাঙ্গালি-লেখক নীরদ সি. চৌধুরী তাঁর 'আত্মঘাতী বাঙ্গালী' প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন তেজস্বী সরস উক্তি করেছেন। কিন্তু লেখা, আর কথার-পিঠে কথা বলা, সম পর্যায়ের কৃতিত্ব নয়। লেখকরূপে গোল্ডস্‌মিথের খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখনও তাঁর কথোপকথনে ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি নিজেও অতিমাত্রায় সজাগ ছিলেন। একবার শুধু জনসনকে জব্দ করেছিলেন—কিন্তু ঐ একবারই। কবি বলে যাচ্ছিলেন Aesop's Fable-এর গল্প নিয়ে— জন্তু জানোয়ারদের ঠিক ঠিক ভাষায় কথা বলতে পারলে কত সুন্দরই না হোত। জনসন নানা অঙ্গভঙ্গি করে, হেসে কথাটা উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ কবি বলে উঠলেন—'Why, Dr Johnson, this is not so easy as you think ; for if you were to make little fishes talk, they would talk like

whales। জনসনের প্রতিটি উক্তি এই ধরনের সরস এবং ধারালো। স্কটল্যাণ্ডবাসী রবার্টসন একবার জনসনকে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি আমাদের দেশে কখনও গীর্জায় যেতেন না ; অথচ আমরা—ওদেশবাসীরা, ইংল্যাণ্ডে এসে প্রতি রবিবার গীর্জায় গিয়ে থাকি ; আপনার কী যুক্তি ? জনসন : Why, sir, that is not extraordinary ; the King of Siam sent ambassadors to Louis XIV, but Louis the fourteenth sent none to the King of Siam। কথা হচ্ছিল Thomas Sheridan-এর সাহিত্য-সৃষ্টি নিয়ে। জনসন : মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও বেড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ; কিন্তু সেরিডানের ক্ষেত্রে হয়ছে উল্টো।—তার মূর্খতা ক্রমেই বেড়ে গেছে : Such stupidity is not in nature। কে একজন বলে উঠেছিলেন যে, ইংরাজী ভাষা প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জনসন : Sir, it is burning a farthing candle at Dover to show light to Calais। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে জনসন বলেছিলেন—এঁরা হচ্ছে Moons of literature ; they shine with reflected light, with light borrowed from the ancients. Greece appears to be the fountain of knowledge, Rome of elegance. পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার হচ্ছে গ্রীস, রোম হচ্ছে সুরুচিতায়। সুইফ্‌ট্‌ আধুনিক সমালোচনা সাহিত্য সম্পর্কে আরো কটূক্তি করেছিলেন : এইসব সমালোচকরা আগেই বইয়ের পেছনটা অর্থাৎ Bibliography পড়ে থাকে। শেষটুকু পড়ে লেখকদের আক্রমণ করেন, যেমন ছেলেরা পায়রা ধরতে গিয়ে লেজে সুন ছিটিয়ে পায়রাদের কাহিল করে ফেলে।

উইনষ্টন চার্চিল সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন, বলাই বাহুল্য। একবার বক্তৃতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন : Who speaks, এইটাই সবচেয়ে বড়কথা ; তারপর আসবে পর্যায়ক্রমে—How he speaks ? এবং সবশেষে What he speaks ? এই উক্তিটি ডঃ জনসন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বাচনভঙ্গিমা ছাড়াও, এই তেজস্বী ব্যক্তিটিকে সবাই শ্রদ্ধা করত। শৈশব থেকেই জনসন আত্মাভিমানী—কোন কিছুতেই মাথা নত করেননি। Lichfield-এ পাঠশালায় পাঠরত অবস্থায় ইনি পূজ্য সতীর্থের কাঁধে চড়ে পাঠশালায় যেতেন, কারণ ভালো হাঁটতে পারতেন না। একদিন বাহকদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে নিজেই খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিলেন ; পথে তাঁর এক শিক্ষিকা এই করুণ অবস্থা দেখে এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্য করতে। সাহায্য

নেওয়া দূরে থাক, শিক্ষিকাকে আক্রমণ করলেন শিশু জনসন—নারীর সাহায্য নেবেন না, কিছুতেই। পরে Oxford-এ পড়তে গিয়ে যখন চরম অর্থকষ্ট চলছিল, জুতো ছিঁড়ে গেছে, নতুন জুতো কেনার সামর্থ্য নাই, গোপনে তাঁর কোন অনুরাগী বন্ধু এক জোড়া নতুন জুতো দরজার পাশে রেখে গিয়েছিল —জনসন জুতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়েছিলেন : ডিগ্রি নেওয়া তাঁর হয়নি। তাঁর পৌরুষ কোন কিছুতেই নতি স্বীকার করেনি : এমনকি প্রেমিকাকেও বিয়ের দিনে কাঁদিয়েছিলেন। ঘোড়ার পিঠে চেপে দুজনে গীর্জায় যাচ্ছিলেন। প্রেমিকা কখনও বলছিল, জনসন অতি দ্রুত যাচ্ছেন, আবার মন্থরগতিতে চললেও আপত্তি করছিল। আদতে রোমান্টিক উপন্যাস পড়ে পড়ে মহিলার ধারণা জন্মেছিল প্রেমিককে কুকুরের মত চালিয়ে নিতে হবে। কিন্তু জনসন প্রেমিকার হাতের ক্রীড়নক হতে নারাজ। হঠাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে গীর্জায় পৌছে গেলেন—অনেক পরে সাশ্রুনয়না প্রেমিকা এসে হাজির। Lord Chesterfield-এর কাছে অভিধান ছাপাবার অর্থের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন জনসন ; ব্যর্থ হয়ে নিজেই অভিধান ছাপা প্রায় যখন শেষ করে এনেছেন, তখন Chesterfield এগিয়ে এসেছিলেন অর্থ সাহায্য করতে। জনসন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে' যে চিঠিখানা লিখে-ছিলেন, তা ইংরাজী সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ ;—বিশেষ করে' Patron বা পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে জনসনের সংজ্ঞা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে :

'Is not a Patron, my lord, one who looks with unconcern on a man struggling for life in the water, and when he has reached ground encumbers him with help ?'

কী অসাধারণ জোরালো ভাষা, কত নিপুণ সূক্ষ্মতা! বন্ধুমহলে ডঃ অ্যাডাম্‌স্ বলছিলেন Chesterfield লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ; নিশ্চয়ই ডঃ জনসনের উপস্থিতির কথা তিনি জানতে পারেননি। জনসন বললেন—Chester-field ভীষণ অহঙ্কারী, the proudest man alive। বন্ধু ছাড়বার পাত্র নন, বলে বসলেন, একজন অন্ততঃ এঁর চেয়েও অহঙ্কারী ব্যক্তি আছেন, ইনি জনসন স্বয়ং। জনসন : But mine was defensive pride। এভাবেই কথার মোড় ঘুরিয়ে কথায় নতুন ব্যঞ্জনা এনে দিতেন। এই হচ্ছে জনসনের অনবদ্য bon-mots। খুব কমলোকেরই এই প্রতিভা আছে। Defensive pride বা আত্মরক্ষামূলক দম্ভের আরো উদাহরণ মেলে জনসনের জীবনীতে। যশুয়া রেনল্‌ডকে সঙ্গে করে জনসন একবার ঐ যুগের প্রখ্যাতা মহিলা

Duchess of Argyle-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। সসম্ভ্রমে এই মহিলা এঁদের আপ্যায়ন করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ আরেকজন বিশিষ্টা মহিলা এসে পড়ায় তাঁর সঙ্গে আলাপে মশগুল হয়ে পড়লেন Duchess। নিজেদের উপেক্ষিত মনে করে জনসন তখন উচ্চৈঃস্বরে জওয়া রেনল্ডকে বলতে লাগলেন —How much do you think you and I could get in a week if we were to work hard? উদ্দেশ্য আগন্তুককে বুঝিয়ে দেওয়া যে তাঁরা দিনমজুর শ্রেণীর লোক অথচ Duches-এরই সঙ্গী।

বিস্মিত হ'তে হয় এই তেজস্বী মানুষটি আবার কত স্নেহপরায়ণও ছিলেন, এইকথা ভেবে। ডঃ লেভেটকে শুধু আশ্রয়ই দেননি; তার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন; এমনকি ভৃত্যের জন্যও উইল করে গিয়েছিলেন। বজ্রাদপি কঠোরানি, মৃদুনি কুসুমাদপি। বজ্রের চেয়ে কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল—শাস্ত্রের এই প্রবচন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

মজলিশে নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হ'ত; কারণ সবাই শুনতে চাইত এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির অভিমত। দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কথা হচ্ছিল: স্ত্রীদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে জনসনের মত ছিল অত্যন্ত কঠোর ও আপোষহীন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী সত্যিই মারাত্মক: সন্তানের জনক সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর: confusion of progeny constitutes the essence of the crime। প্রসঙ্গক্রমে বসওয়েল প্রশ্ন তুলেন—কোনো স্বামীকে তার স্ত্রী যে দুশ্চরিত্রা তা বলে দেওয়া উচিত কি না? বরং Othello-র নির্দেশ ঠিক নয় কি:

> He that is robbed, not wanting what is stolen, Let him not know't and he is not robbed at all.

দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন জনসন: নিশ্চয়ই বলা উচিত; এখানে মানসিক যন্ত্রণা থেকেও বড় প্রশ্ন রয়েছে যে—বংশ কলুষিত হবার প্রশ্ন। এভাবেই নৈতিক প্রশ্নে জনসনের মনোভাব ছিল অনমনীয়। অভিনেত্রীরা এক একজন 'ডিলাইল্যা'; এদের প্রলোভনে পড়েছিলেন বার্ণাড শ', চেকভ, চার্লি চ্যাপলিন, আরো অনেকে। শেক্সপীয়রের যুগে কিশোররা নারীর অভিনয় ক'রত। তবু বিশ্বকবি Dark Lady-র মত এক ব্যভিচারিণীর পাল্লায় পড়েছিলেন। জনসনের নাটক *Irene* যখন মঞ্চস্থ হচ্ছিল, তখন গ্যারিকের থিয়েটারের green room-এ তাঁকে যাতায়াত করতে হ'ত। কিছুদিনের মধ্যেই গ্যারিককে তিনি বলেছিলেন—'I will come no more behind

your seenes, David ; for the silk stockings and white bosoms of your actresses excite my amorous propensities.'

ডেভিড গ্যারিকের কথা মনে পড়ায়, অভিনেতাদের সম্পর্কে জনসনের বিরূপ মনোভাবের প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। এঁদের ইনি বাঁদর ও কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন—এরা কেবল শেখানো মুখস্থ করা বুলি সুর করে আউড়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—গ্যারিক ও গিফোর্ড উভয়েই ঐ যুগের নামকরা অভিনেতা। এঁদের জব্দ করার জন্য তিনি বাইবেলের নবম নির্দেশ : Thou shalt not bear false witness agaist thy neighbour—আবৃত্তি করতে বলেছিলেন। উভয়েই ভুল stress দিলেন, অথচ জোর দিতে হবে Not ও False witness-এর উপর। বসওয়েল তর্ক করছিলেন—

But Sir, you will allow some players are better than others।
জনসন : Yes, Sir, some does dance better then others।

নাছোড়বান্দা বসওয়েল তবু বলছিলেন ; স্বীকার করছি গ্যারিক দর্শক প্রতি এক শিলিং নিয়ে থাকেন, তেমন তো আইনজীবীরাও মোটা ফি নিয়ে থাকেন। জনসন : তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে? Only a lawyer is worse than a player। প্রসঙ্গতঃ বসওয়েল নিজেও আইনজীবী ছিলেন। তর্কে হেরে নিজের গলাতেই দড়ি পরাচ্ছিলেন বসওয়েল—যেমন Swift-এর The Tale of a Tub-এর Jack করেছিল। সাহিত্য জনসনের নখদর্পণে ; প্রয়োজন মত প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রজ্ঞা, কল্পনার প্রসারতা, এবং সর্বোপরি তাঁর বাচন-ভঙ্গিমা বাকযুদ্ধে তাঁকে জয়ী করত। একবার তিনি বিখ্যাত অভিনেতা Kembleকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি মনে করেন, অভিনেতা নাটকের চরিত্রের সঙ্গে সাময়িকভাবে একাত্ম হয়ে যায়? 'Are you, Sir, one of those enthusiasts who believe yourself, transformed into the very character you represent?' Kemble উত্তর দিলেন, তা ঠিক তাঁর মনে হয় না। জনসন : 'To be sure not, Sir, the thing is impossibe. And if Garrick really believed himself to be that monster Richard the third,he deserved to be hanged everytime he performed it.'

ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে Queen's Library-তে সাক্ষাৎ হয়েছিল ডঃ জনসনের। নানা কথার প্রসঙ্গে রাজা জিগ্যেস করেছিলেন

যে তিনি কী লিখছেন। বিনীতভাবে জনসন উত্তর দিলেন—যা বলার বলে ফেলেছি, এবার লেখার উপাদান ফুরিয়ে গেছে। রাজা বললেন—I should have thought so if you had not written so well। জনসন নির্বাক থাকেন : পরে বলেছিলেন : I would not bandy civilities with my sovereign। রাজার সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বিনিময় করার মানে হয় না। যেমন সম্ভ্রমবোধ তেমনি বলিষ্ঠ কাণ্ডজ্ঞান। The master of eloquence was also the master of silence.

আলাপচারীরূপে কবি গোলড্‌স্‌মিথ যতই নিষ্প্রভ হোন না কেন, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার জনসন মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। কবির মৃত্যুর পর তাঁর কবরে কোন্ ভাষায় স্মৃতিফলক লেখা হবে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। জনসন স্মৃতিফলক ল্যাতিন ভাষায় লিখে Literary Club-এর সদস্যদের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সদস্যদের সবার আপত্তি ভাষা নিয়ে। কবি ইংরেজীতে লিখতেন ; ইংরেজী তাঁর মাতৃভাষাও বটে, সুতরাং ইংরেজীতেই স্মৃতিফলক লেখা উচিত। সবাই স্থির করলেন—জনসনকে আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখবেন। চিঠি লেখা ত হ'ল, কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল কে প্রথম সই করবে, কার এতটা সাহস জনসনকে প্রতিবাদ করবে? শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল Round Robin system-এ বৃত্ত এঁকে, বৃত্তের সবদিকে ঘুরিয়ে সই করা হবে। জনসন এই অভিনব পন্থা দেখে যতই খুশী হন না কেন; যুক্তিতে তিনি অনড়। ইংরেজী অভিধান-প্রণেতা ভালোই জানতেন যে ইংরেজী জীবন্ত ভাষা, পরিবর্তনশীল। শব্দের অর্থ যুগে যুগে বদলাচ্ছে—যেমন বাইবেলের অনুবাদে একটি বাক্য আছে—Prevent us, O Lord in all our doings। Prevent-এর প্রকৃত অর্থ এখানে Go before—পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ; বর্তমান অর্থ তার উল্টো। Westminister Abbey-তে এই ভাষা থাকা চলবে না—অর্থের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হ'লে ল্যাটিন ভাষাই প্রযোজ্য, —secured of classical stability। শেষ পর্যন্ত এই অকাট্য যুক্তি সবাই মেনে নিয়েছিলেন। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য—ডঃ জনসনের প্রতি সে যুগের মনীষীদের গভীর শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা ও অনবদ্য বাচন ভঙ্গিমার সাহায্যে। এই ছিলেন ডঃ জনসন ; —'When comes such another'?

———

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার পাঠান্তরভিত্তিক আলোচনা

দেবকুমার ঘোষ

১৩০৭-এর ৩২ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবারে, স্নানযাত্রার পরের দিন, অর্ধশতাব্দীর সমান বয়সী রবীন্দ্রনাথ তাঁর চামড়ায় বাঁধানো পকেটবুকের[১] ৫৭ পাতায় পেনসিলে লেখেন একটি কবিতা। শিরোনামহীন এই কবিতার প্রথম পংক্তি : 'মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে'। পকেটবুকে লেখা অধিকাংশ কবিতার মতই এই কবিতাটি 'ক্ষণিকা'-কাব্যে স্থান পায়। মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থে কবিতাটির নাম কবি দেন 'খেলা'।[২] কবিতাটির মধ্যে সমাগতপ্রায় আষাঢ়ের বর্ষণকে অবলম্বন করে কবিমন নস্‌টাল্‌জিয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে—ছেলেবেলার কোন সুদূর থেকে কবির মনে কী পৌঁছেছে—তুলেছে প্রথম বয়সের স্মৃতি গুঞ্জরণ। ছেলেবেলার একটি আষাঢ়ের দিনের কথা কবির মনে পড়েছে। 'খেলা' হল স্মৃতির মণিকোঠা খুলে ছেলেবেলার দিনগুলিকে পরম মমতায় ছুঁয়ে দেখার কবিতা, পুলকিত হয়ে খেলার সূত্রে সেকালের নিরিখে একালকে দেখার কবিতা। হারিয়ে যাওয়ার বেদনা নয়, হারিয়ে পাওয়ার ক্ষণিক আনন্দ চিরন্তন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আস্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এর মধ্যে। ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থ এই কারণেই সম্ভবত এর বাসভূমি।

এই কবিতায় সেকাল ও একালের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে কবিতার যেসব অনুষঙ্গ ও তাৎক্ষণিক মুহূর্ত, কবি সেইসব অনুষঙ্গ ও মুহূর্তগুলিকে কবিতায় কিভাবে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী করে তুলেছেন তা অনুধাবন ও উপলব্ধির জন্য, অর্থাৎ কবিতার কর্মশালায় হৃদয়বৃত্তির আবেগময় উপাদানকে কবি কিভাবে সচেতন বৌদ্ধিক বৃত্তিজাত প্রচেষ্টায় জারিত করে শিল্পসংহতি বা শিল্পিত স্বভাব দান করেছেন, তা জানার ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই কবিতার পাণ্ডুলিপির পাঠের সঙ্গে ছাপা কবিতার পাঠের তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই অভিজ্ঞানও লাভ করতে পারি কবি কিভাবে তাঁর ভাবকে উপযুক্ত রূপলোক দান করছেন। শুধু এইটুকুই নয়, কবিতা রচনা পর্বে কবির মধ্যে কবিতার পক্ষে যেসব অনুকূল ও প্রতিকূল অনুভূতির আনাগোনা চলে সে সবের পরিচয়ও পাণ্ডুলিপির কবিতার সঙ্গে ছাপা কবিতার পাঠের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য থেকে ধরা পড়ে। কবির

মধ্যে স্রষ্টা এবং বোদ্ধা—এই দুই সত্তাই যে রয়েছে এবং এই দুই সত্তার মধ্যে বিযুক্তি ও সংযুক্তির ফলেই যে একটি সার্থক কবিতা রচিত হতে পারে—এই তত্ত্বটিও পাণ্ডুলিপির ও মুদ্রিত গ্রন্থপাঠের তুলনামূলক বিচার-বিবেচনার মধ্যে থেকেই সত্যতর অভিব্যক্তি লাভ করে থাকে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, কবি যখন পাণ্ডুলিপিতে প্রথম বারের জন্য কবিতা লেখেন, তখন সৃষ্টির আবেগই মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু লেখা হয়ে গেলে যখন কবিতাটি তিনি পড়েন, তখন সেই আবেগ সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং কবির বৌদ্ধিক সত্তাটিই প্রবলতর হয়ে পড়ে। এই সত্তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায় আবেগমুখ্য প্রকাশনার অপূর্ণ দিকটি। তখনই কবি পরিশীলিত করেন তাঁর কবিতাকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই পরিশীলন চলে ততক্ষণই যতক্ষণ না কবি একে শিল্পঋদ্ধ করে তুলতে পারেন। এই পরিশীলনের সময় পরস্পর বিযুক্ত দুই সত্তা সংযুক্ত হয়ে যায়।[৩] অবশ্য প্রতিটি কবিতার ক্ষেত্রেই এই বিযুক্তি ও সংযুক্তির প্রক্রিয়া চলে না, কারণ কোন কোন কবিতা রচনার পর্বে কবির স্রষ্টা ও বোদ্ধা সত্তাদুটি—একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে সেই সব কবিতার পাণ্ডুলিপির পাঠই হয় শিল্পঋদ্ধ পাঠ এবং সেই পাঠই স্থান পায় কাব্যগ্রন্থে[৪]। 'খেলা' কবিতায় চলেছে সেই দুই সত্তার বিযুক্তি ও সংযুক্তি 'এবং শেষ পর্যন্ত একীকরণ —interpenetration তথা union।

'খেলা' কবিতার পাণ্ডুলিপির পাঠে অর্থাৎ পকেট বুকের পাঠে বিস্তৃত পাঠ পরিবর্তনের চিহ্ন রয়েছে। কবিতার প্রথম পাঠ যা কবি প্রথম বার লেখার সময় লিখেছিলেন, তার সঙ্গে ছাপা পাঠের ব্যবধান রয়েছে অনেক। পাণ্ডুলিপিতেই কবি কবিতাটিকে পরিশীলিত করে তুলেছেন। কেন এইসব পরিশীলন ঘটেছে, কিভাবে ঘটেছে, তা নির্ণয় করা সম্ভব হলেই কাব্যপ্রক্রিয়ার ও কবিসত্তার গতি প্রকৃতির পরিচয় যেমন পাওয়া সম্ভব হয়, তেমনি বোঝা যায় কবি কিভাবে একটি কবিতাকে অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত 'খেলা' কবিতার প্রথম স্তবকেই আছে কবির নস্টাল্‌জিক মনোভাবের স্পর্শ। এই স্তবকটি থেকেই অনুভব করা যায় আষাঢ়ের বৃষ্টিপাতের অনুষঙ্গ সেকাল ও একালের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে দিয়েছে। কাব্যগ্রন্থের কবিতায় ছেলেবেলার স্মৃতিগুঞ্জরণেই কবিতার শুরু—

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা,

নালায় জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতায় ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবস রাতি
ছিল না কেউ খেলার সাথী,
একলা বসে পেতেছিলাম
সাধের খেলা।
নালায় জলে ভাসিয়েছিলেন
পাতায় ভেলা।

আষাঢ় এবং আষাঢ়ের বৃষ্টিই কবির স্মৃতিদুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পঞ্চাশ বছরের কবি তাৎক্ষণিকভাবে ফিরে গেছেন তাঁর ছেলেবেলার রাজ্যে। কবির বর্তমানের নিঃসঙ্গতাই ছেলেবেলার সাথীহীন রবীন্দ্রনাথের কথাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রৌঢ়ত্বের নিঃসঙ্গতাকে তিনি ছেলেবেলার খেলার স্মৃতির আসঙ্গে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন বৃষ্টিকাতর দিনটিতে। ফলে ছেলেবেলার সেই বিশেষ দিনটি রূপে-রসে ভরে উঠেছে কবিতায়। কিন্তু চাওয়ার তীব্রতাতেই পকেটবুকে লেখা কবিতার প্রথম চারটি পংক্তি, যা লেখা হয়েছিল ছাপা কবিতার প্রথম স্তবকের আগেই, তা কেটে পকেটবুকেই বর্জন করেছেন কবি। মনে হয় এই চারটি পংক্তি লিখে, তা পড়ার সময় কবি দেখেছেন এর মধ্যে বাল্যস্মৃতি এবং আষাঢ় প্রত্যক্ষভাবে নেই ; যে-নসটাল্‌জিয়ায় তাঁর মন আচ্ছন্ন, তার প্রকাশ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং এর ভাষা যেন তাঁর দার্শনিকসুলভ মনটিকে ব্যক্ত করছে। ছাপা কবিতার প্রথম স্তবকের পাঠ লেখার আগে কবিতা লিখতে শুরু করেই কবি যে চারটি পংক্তি মনের আবেগে লিখে আবার কেটে দিয়েছিলেন তার পাঠ—

যে আছে ঐ পারের ঘাটে
তারে চিনিস কেউ ?
সকাল থেকে আপন মনে
শুনচে বসে ঢেউ ![১১]

এই চারটি পংক্তিতে কথিত 'ঐ পার' নিঃসন্দেহে কবির ফেলে আসা ছেলেবেলা। ঘাটে যে মানবীয় অস্তিত্ব বর্তমান তাও বালক রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু এই চারটি পংক্তি পাঠ করে এ বিষয়ে পাঠক কখনোই নিঃসংশয় হতে পারবেন না। বরং 'ঐ পারের ঘাটে', 'শুনচে বসে ঢেউ' ইত্যাদির মধ্যে জীবনের কোন গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে বলে পাঠকের মনে হতে পারে। কবিতা

রচনা পর্বে কবি-পাঠক যিনি স্ব-কাব্য আস্বাদন করতে চান, তিনিও অনুরূপ উপলব্ধির মুখোমুখি হয়েছিলেন। ফলে কবি-পাঠক, যিনি ভাবকে উপযুক্ত রূপলোক দেবার জন্য উন্মুখ থাকেন, তিনি আবেগপ্রবণ স্রষ্টা কবির সৃষ্টির প্রাথমিক রূপটিকে বর্জন করে নতুন করে কাব্যপাঠ নির্মাণ করেছেন সন্তোজত চারটি পংক্তিকে কেটে দিয়ে। এই নব-পাঠই অক্ষত আছে পকেটবুকে এবং ১ম স্তবকরূপে রক্ষিত হয়েছে মুদ্রিত ক্ষণিকায়। পকেটবুকের ৫৭ পাতায় এই সব পাঠ রয়েছে।

৫৭ পাতায় ছাপা-কবিতার ১ম স্তবক লেখা শেষ করে' ৫৮ পাতায় কাব্য-পাঠ রচনায় সময় কবির পেনসিল সাময়িকভাবে থেমেছে। কিন্তু সেই ক্ষণিকের বিরতিও সম্ভবত কবির ভাবাবেগের প্রবাহটির গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। সেই রুদ্ধতা থেকে মুক্তির অভিলাষে কবি নিজের নামের মনোগ্রাম তৈরির খেলায় মেতেছেন। পেনসিলের আঁচড় বারবার টেনেছেন। এর মধ্যে ভাবাবেগ স্তব্ধ হওয়ার জন্য উদ্ভূত যে মানসিক অস্থিরতা তারই প্রকাশ দেখা গেছে। রুদ্ধ ভাবাবেগ মুক্ত হলে পকেটবুকের ৫৮ পাতায় কবি লিখেছেন ছাপ কবিতার দ্বিতীয় স্তবক। স্তবকটি পাঠ করলেই বোঝা যায় পেনসিলের আঁকিবুকি কাটতে কাটতে কবি স্মৃতির পাতা ওলটাচ্ছিলেন অন্য একটি উজ্জ্বল ছবির সন্ধানে। ৫৮ পাতার পাঠে সেই ছবিটিই কবি আঁকলেন কবিতার ছন্দোবদ্ধ ভাষায়[১২]—

হঠাৎ আকাশ ছেয়ে গেল
ঝড়ের মেঘে,
হঠাৎ বৃষ্টি এল কখন
দ্বিগুণ বেগে !
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগল পারা
পাতার ভেলা ডুব্‌ল নালায়
তুফান লেগে,—
হঠাৎ বৃষ্টি এল যখন
দ্বিগুণ বেগে।

পকেটবুকে উপরের এই পাঠ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কবিতাটি প্রথম বারে লেখার সময়। পকেটবুকের ৫৮ পাতায় এই পাঠ শুরু ও শেষ হয়েছে। ৫৯ পাতায় কবি লিখেছেন ছাপা কবিতার তৃতীয় স্তবকের ৪র্থ থেকে ১০ম পংক্তির

এবং ৪র্থ স্তবকের শেষ ছয় পংক্তির পাঠ। পাণ্ডুলিপিতে কবির লেখার ধারা ও গতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় একেবারে কবিতা শেষ করে' কবি থেমেছেন। থামার পরেই কবিতাটি পড়ার সময় সক্রিয় হয়ে উঠেছে কবির সচেতন ও সহৃদয় পাঠক মন। তাঁর অনুভবে ধরা পড়ে গেছে স্রষ্টা কবির আবেগময় প্রকাশের বিবিধ অপূর্ণতা। তাই পাঠ পরিবর্তন করতে হয়েছে স্রষ্টা ও পাঠক সত্তার সম্মিলিত প্রেরণায় ও প্রয়াসে। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে, পরিবর্তন হয়েছে বেশ কিছু সময়ের পরে, কবিতা ছাপতে দেবার আগে, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার প্রাক্‌কালে। আর সেই পরিবর্তন হয়েছে পকেটবুকেই। পরিবর্তিত পাঠই স্থান পেয়েচে কাব্য গ্রন্থে। পকেটবুকে প্রথমে লেখা দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকের পাঠভেদগত প্রতিতুলনা থেকেই জানা যায় কবি কোথায় কি ধরণের পরিবর্তন করেছেন।

(১) পকেটবুকে প্রথমবারে লেখা দ্বিতীয় স্তবক, প্রথম পংক্তির পাঠ

হঠাৎ আকাশ ছেয়ে গেল[৫]

পকেটবুকেই পরিবর্তন করে তাকে করা হয়েছে—

হঠাৎ হল দ্বিগুণ আঁধার

এই পাঠই রক্ষিত হয়েছে কাব্যগ্রন্থে। কবি যখন আবেগের বশে লিখছেন, তখন হঠাৎ ঝড়ের মেঘে আকাশ ছেয়ে যেতে দেখেছেন। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে ঝড়ের মেঘ। আকাশ হারিয়েছে তার গুরুত্ব। সেই আকাশ বর্ষার আকাশ। অথচ তা সেকালে ও একালে বালক ও প্রৌঢ় কবির মনে ছায়া ফেলে যায়। কবি ছেলেবেলার যে স্মৃতিকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে চান, সেখানে আকাশের গুরুত্বও কম নয়। তা বর্ষার আকাশ বলেই ঘন কালো রঙের মাধ্যমে কবির বালক মনে দাগ কাটতে পারে। তাই পাঠ পরিবর্তন করে 'আকাশ' কে আড়াল করে আকাশের ঘন কালো রঙকে মূল্য দিলেন কবি। 'দ্বিগুণ আঁধার' বলায় আকাশও সমান গুরুত্ব পেল ঝড়ের মেঘের পাশে। উপরন্তু বর্ণ যোজনা এক দৃশ্যগত আবেদনও নিয়ে এল বিষয়ে। বিষয় আর বিবৃতি মাত্র থাকল না। কবির শিল্প চিত্তও জাগ্রত হল এতে—পরিবর্তিত পাঠে 'আকাশ' অনুপস্থিত থেকেও আকাশের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হওয়ায়[৬]। শুধু এইটুকুই নয়, কবির সঙ্গে যখন শিল্পী এসে যোগ দেয় তখন সৃষ্টির মধ্যে অতি সাধারণ বিষয়ও যেন অসাধারণ হয়ে যায়। কবি 'ছেয়ে গেল' এই ক্রিয়াপদটিকে বর্জন করেছেন। ছেয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন

একটা প্রক্রিয়া আছে, যার মধ্যে আকস্মিকতার এফেক্টটা অনেক কম। কিন্তু বর্ষার আকাশ হঠাৎই ঘন কৃষ্ণবর্ণ হতে পারে। তাই রঙ দিয়ে আকস্মিক পরিবর্তনের মেজাজটা ধরা যায় ভালো। যখন স্রষ্টার আবেগের সঙ্গে পাঠকের বৌদ্ধিক বৃত্তি একত্রিত হয়, তখন সৃষ্টি বা কবিতা কেবল আবেগপ্রসূত হৃদয়বৃত্তির ফসল হয় না, সচেতন নির্মাণে ভাবকে উপযুক্ত রূপগত সংহতি দান করে নিয়ে যায় নান্দনিক সিদ্ধির স্তরে। প্রথম পংক্তির এই পরিবর্তন সেই নান্দনিক সিদ্ধির স্তরে পৌছানোর প্রক্রিয়াটিকে সুনির্ণীত করে দিতে পারে।

(২) দ্বিতীয় স্তবক তৃতীয় পংক্তির প্রথম বারের পাঠ—

হঠাৎ বৃষ্টি এল কখন[৫]

পকেটবুকে পরিবর্তনের পরে এবং ছাপা কবিতায় ঐ পাঠ—

হঠাৎ বৃষ্টি নামল কখন

এখানে পরিবর্তন কেবল ক্রিয়াপদে। কাব্যপংক্তির বাহ্য কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবল ক্রিয়াপদটিকে পরিবর্তন করলেন কবি। 'আসা'র পরিবর্তে 'নামা'। আকাশে জমা ঝড়ের কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে। উপর থেকে নিচে নামার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হল এতে। এখানে অর্থের পরিবর্তন ঘটল, যা আগের কন্‌টেক্‌স্ট অনুযায়ী সঠিক। পথ দিয়ে আসা আর আকাশ থেকে নামা—এই ধারণা কবিমানসে ক্রিয়াশীল। কবির বৌদ্ধিক মানসের প্রভাব রয়েছে এর মধ্যে, যাকে পাঠক সত্তাও বলা যায়। এই সত্তাই যে প্রকট হয়ে কবিকে পাঠ পরিবর্তনে বাধ্য করিয়েছে তা বোঝা যায় তখনই, যখন কবি এই পরিবর্তনের মাধ্যমে পংক্তিতে ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধন করেন। এতে কবিতার পংক্তিগুলিতে মাত্রাগত সমতা কিন্তু বজায় থাকেই। (৩) পকেটবুকের ৫৮ পাতার পাঠের নবম পংক্তিতেও কবি আগের পাঠের মতই পাঠ পরিবর্তন করেছেন। তবে এখানে পরিবর্তন হয়েছে দুইবার। প্রথমবার—এল> নাবল, দ্বিতীয়বার—'নাবল'-এর 'ব'-এর উপরেই পেনসিল বুলিয়ে 'ম' করেছেন কবি, ফলে পাঠ হয়েছে 'নামল'। অর্থাৎ এল>নাবল>নামল। অর্থাৎ পাঠ পরিবর্তনের পথটি হল যথাক্রমে—

(ক) হঠাৎ বৃষ্টি এল কখন[৫]

(খ) হঠাৎ বৃষ্টি নাবল যখন[৫]

(গ) হঠাৎ বৃষ্টি নামল যখন

এই পরিবর্তনের মধ্য স্তরটি সম্ভবত কবির ভ্রান্তিজাত। কিম্বা প্রচলিত শব্দকে কবি অসতর্কভাবে ব্যবহার করে ফেলেছেন বলেই মনে হয়।

কাব্যগ্রন্থের কবিতার তৃতীয় স্তবকটি হল—

সেদিন আমি ভেবেছিলাম
মনে মনে
হত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে
ঝড় এল যে আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে,
আর কিছু তার ছিল না কাজ
ত্রিভুবনে।
হত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে।

এই স্তবকটি পকেটবুকের ৫৮ পাতায় লিখতে শুরু করে ৫৯ পাতায় শেষ করেছেন কবি। প্রথমবার লেখার সময় পঞ্চম পংক্তিটিতে তিনি লিখেছেন—

ঝড় এসেছে আচম্বিতে,[৫]

কিন্তু পরে, সম্ভবত কবিতা রচনার শেষে, তা পরিবর্তন করে, অর্থাৎ 'এসেছে' কেটে 'এল যে' লিখে, অর্থগত ব্যবধান তিনি গড়ে তুললেন। পরিবর্তিত পাঠে এমন ভাব গড়ে উঠল যাতে মনে হয় ঝড় আসতে দেখেই কবি লিখলেন কবিতার পংক্তিটি। এর মধ্যে 'এক্ষুনি এল' এমন একটা ভাব আছে। কিন্তু 'এসেছে'-এর মধ্যে 'এক্ষুণি আসা'-র প্রতিক্রিয়ার তীব্রতাটুকু অনুপস্থিত। কবি কাব্যপাঠে সেই তীব্রতার ব্যঞ্জনাই সঞ্চার করতে চেয়েছেন। ফলে কবিতার মধ্যে যে স্মৃতির স্রোত সঞ্চারিত তা কিছুটা নাটকীয়তায় মণ্ডিত হতে পেরেছে, জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। মনে হয় স্নানযাত্রার পরের দিনটি, যে দিনে কবিতাটি লেখা হচ্ছে, সেই দিনের বর্ষামুখর প্রেক্ষাপটকে কবি কেবল 'এল যে' এই শব্দটির মাধ্যমে ধরে রাখতে চাইছেন। অথচ এমন ভাবে ধরে রাখছেন যাতে মনে হচ্ছে স্মৃতি থেকে উঠে আসা একটি দিন যেন কবির চোখের সামনে (সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চোখের সামনেও) প্রত্যক্ষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে।[৮] কবির এই কবিতা রচনার প্রক্রিয়া গোপনেই থেকে যায় যদি না পকেটবুকের পাঠ পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনা আমাদের জানিয়ে দেয়, স্মৃতির আবেগবিহ্বল কবি-সত্তার পাশেই আর একটি

সত্তার উপস্থিতির খবর। দ্বিতীয় এই সত্তার ক্রিয়াই কবির আবেগ মথিত প্রকাশকে সংহত শিল্পপ্রাণ দান করে। এই সত্তা কবির ভিতরের সচেতন সহৃদয় পাঠক সত্তা। এই সত্তা কেবল কবিতাই আস্বাদন করে না, কবিতাকে যথার্থ কবিতা করে তোলার জন্ত সততই ব্যাকুল হয় এবং এরই ফলে 'ঝড় এসেছে আচম্বিতে' —এই পাঠটি হয়ে ওঠে, ঝড় এল যে আচম্বিতে। স্মৃতির এই আসঙ্গ কবিমানসকে বর্তমানের নিঃসঙ্গতায় এইভাবে ভরিয়ে তুলতে পারে কবির দুই সত্তার অন্তঃস্পন্দন বা interpenetration-এ।

পকেটবুকের ৫৯ পাতায় কবি কবিতার শেষ স্তবকের প্রথম দুটি পংক্তি লিখেছেন। কিন্তু ছাপা পাঠের সঙ্গে এই প্রথমবারে লেখা প্রথম চার পংক্তির পাঠের বিস্তর অমিল রয়েছে। পকেটবুকেই দু-দুবার এই পাঠ পরিবর্তন করে কবি পৌঁছেছেন ছাপা পাঠের মধ্যে। অবশ্যই এই পরিবর্তন হয়েছে কবিতা লেখা শেষ হয়ে যাবার পরে। প্রথমবারে কবি লিখেছেন—

আজ আষাঢ়ে কাটল বেলা
একলা ঘরে
মনে মনে বিধির সাথে
বিবাদ করে ![৫]

এই পাঠের ১ম পংক্তির প্রথম দুটি শব্দ অক্ষত রেখে বাকিটুকু কেটে দিয়ে কবি দ্বিতীয়বারে লিখেছেন—

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাটল বেলা
ভাবতেছিলেম এতদিনের
জীবন খেলা।[৫]

ছাপা পাঠে এই চার পংক্তির প্রথম তিনটি রক্ষিত হয়েছে। কবি, সম্ভবত অনেক পরে, শেষ পংক্তিটির 'জীবন' শব্দটি কেটে দিয়ে লিখেছেন 'নানান'। এই পরিবর্তন অনেক পরে হয়েছে—একথা বলার কারণ এই পরিবর্তন হয়েছে কালিতে। সমস্ত কবিতায় এই একটি ক্ষেত্রেই পেনসিলের পরিবর্তে কলম ব্যবহার করেছেন কবি। এই পরিবর্তনের ফলে পকেটবুকের ৪র্থ স্তবকের পাঠ (যা কাব্যগ্রন্থে পাঠ্য হয়েছে)—

আজ আষাঢ়ের একলা ঘরে
কাটল বেলা
ভাবতেছিলেম এতদিনের
নানান খেলা।

ভাগ্য 'পরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ
পড়ল মনে নালার জলে
পাতার ভেলা
ভাবতেছিলেম এতদিনের
নানান খেলা।

এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও কবি-স্রষ্টার আবেগমথিত সত্তা এবং শিল্প-সচেতন পাঠকসত্তা সক্রিয়। কারণ কবি কবিতা শেষ করার পরে, তা পড়তে গিয়ে দেখলেন তৃতীয় স্তবকে তিনি বিধির সঙ্গে বিবাদের কথা বলেছেন (হত বিধির যত বিবাদ / আমার সনে)। সেই বিবাদ ছেলেবেলার স্মৃতিপুঞ্জে উজ্জ্বলতা নিয়ে থাকলেও, একালেও তার আমেজটি সুরক্ষিত থেকেছে। কবি বলেছেন—'দিতেছিলেম বিধিরে দোষ'। কিন্তু সেকালে বা ছেলেবেলায় কবি কেবলই বিধিকে দোষারোপ করেছিলেন, এখন সংযুক্ত হয়েছে ভাগ্যও—ভাগ্য 'পরে করিয়া রোষ / দিতেছিলেম বিধিরে দোষ।' সেকাল ও একালের কবি-ভাবনার এই ব্যবধান উপযুক্ত মূল্য পেত না, যদি তিনি প্রথমবারে লেখা চারটি পংক্তির পাঠ রক্ষা করতেন। এই ভাবগত তাৎপর্য কবির সচেতন পাঠকসত্তার অন্তরেই ধরা পড়ে। তাই এই পরিবর্তন। কিন্তু এই পরিবর্তনের রূপগত তাৎপর্যও রয়েছে। ৪র্থ স্তবকের ৮ম পংক্তি (পাতার ভেলা) ও ১০ম পংক্তি (নানান খেলা) এই মিলকে সুরক্ষিত রাখতে হবে কবিকে—সনগ্র কবিতায় বিধৃত মিলের দিকে তাকিয়ে। কবির পাঠকসত্তা তা লক্ষ্য করেছে। ফলে ১ম পংক্তির 'কাটল বেলা' স্থান পেয়েছে ২য় পংক্তিতে, ১ম পংক্তিতে স্থানান্তরিত হয়েছে দ্বিতীয় পংক্তির 'একলা ঘরে' শব্দবন্ধটি। কবি ভাবগত তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে যেমন প্রথমবারে লেখা 'মনে মনে বিধির সাথে / বিবাদ করে' পংক্তি দুটি বর্জন করেছেন, তেমনি সেই শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করেছেন 'ভাবতেছিলেম এতদিনের / জীবন খেলা' এই পংক্তি দুটি লিখে। কবি যে ছেলেবেলার স্মৃতিপুঞ্জে বিমোহিত হয়েছিলেন, একথা এই পরিবর্তনের মধ্য থেকে বোঝা সম্ভব হয়। তিনি বিমোহিত ভাবটিকে কবিতায় ধরে রাখতে চাইলেন যেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কবির আবেগবিহ্বল স্রষ্টা রূপটির সঙ্গে সচেতন পাঠকের সত্তাটি একাত্ম হয়ে ক্রিয়া করে বলেই, 'দিতেছিলেম'-এর সাদৃশ্যে যেমন 'ভাবতেছিলেম' লিখলেন কবি, তেমনি ৮ম, ১০ম পংক্তির অন্ত্যমিলটির

শেষ বজায় রাখলেন 'জীবন খেলা' লিখে।[৯] তবে দেখা গেল 'জীবন-খেলা'-র 'জীবন' শব্দটি তিনি কাটলেন আবার। কাটলেন এইজন্যই যে প্রতি স্তবকেই ১০ম পংক্তির পাঠে ৪র্থ পংক্তি রক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও 'জীবন খেলা' বললে খেলার পরিবর্তে জীবনই গুরুত্ব পায়। কবি তো জীবনেরই কথা বলেছেন, খেলার মাধ্যমে জীবনকেই দেখাচ্ছেন। তাই বর্জিত হল 'জীবন' শব্দ—এটিই এই পরিবর্তনের ভাবগত তাৎপর্য। এখানে যে কবির অন্তঃস্থ সচেতন পাঠক-সত্তা সক্রিয়—একথা বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে প্রথমবার পরিবর্তনের সময়েও তো এই সত্তা সক্রিয় ছিল, তাহলে কেন কবি আবার একবার পাঠ পরিবর্তন করলেন। সম্ভবত সেক্ষেত্রে দুই সত্তা যখন একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল, তখন পাঠক সত্তা কোনোভাবে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। ফলে স্রষ্টা কবির আবেগপ্রবণ সত্তাটি প্রবলতর হয়ে কবিতার সুষ্ঠু প্রকাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এবং কবিকে ছেলেবেলার স্মৃতির আসঙ্গ থেকে দূরবর্তী করে দেয়। কিন্তু কবিমন সেই আসঙ্গ পায় প্রৌঢ়ত্বের নিঃসঙ্গতার মধ্যে, তাই আসঙ্গের কামনাতেই কবিকে আরেক প্রস্থ পাঠ পরিবর্তিত করতে হয়েছে—কেবল একটি শব্দের (জীবন→নানান) ক্ষেত্রে।[১০]

কবি পকেটবুকে কবিতা শেষ করেছেন, কবিতা রচনার দিনক্ষণ নির্দেশ করেছেন, কিন্তু কবিতার নাম দেন নি। পরে সম্ভবত ছাপতে পাঠানোর জন্য যখন প্রেস কপি তৈরী করেছেন, তখনই নামকরণ করেছেন : কেবল এই একটি কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার ক্ষেত্রেই এই কথাটি সত্য। কবিতার নাম কবি রচনার পরে দিচ্ছেন—এই তথ্য থেকে বোঝা যায় কবি নির্দিষ্ট একটি বিষয় ও ভাবকে তাঁর কবিক্রিয়ায় ফুটিয়ে তুলছেন না। বরং কবিক্রিয়ায় বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত প্রকাশের পরে একটি সামঞ্জস্য সূত্র কিংবা বিষয় অনুসন্ধানের পরে কবিতার নামকরণ করেছেন। এর মধ্যেও এক সচেতন বুদ্ধিবৃত্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে, যা পাঠক কবির বৈশিষ্ট্য নির্দেশক। 'খেলা' কবিতার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। কবি আষাঢ়ের একটি দিন, ছেলেবেলার একটি দিনের স্মৃতি ইত্যাদি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তেমন কোনো নামে কবিতাকে চিহ্নিত করছেন না। আষাঢ়ের দিনে কবির পাতার ভেলা ভাসানোর খেলা নিয়ে যে ঘটনা ও প্রৌঢ় জীবনের প্রেক্ষাপটে সেই খেলার যে মূল্য তা নির্ধারণ করে তাঁর কবিতার নাম দিচ্ছেন 'খেলা'। এখানে চারটি স্তবকে ঘটনা, অনুভব সবই বিক্ষিপ্ত। কিন্তু বিক্ষিপ্ততার মধ্যে ভাবাবেগ সঙ্গতি সূত্র রচনা করেছে খেলার সূত্রেই। কবি তা লক্ষ্য করেছেন। এই

লক্ষ্য করার মধ্যে রয়েছে সচেতন সহৃদয় পাঠকের বৃত্তি। এর প্রকাশে কবিতার নাম হয়েছে 'খেলা'। এই নামের বন্ধনেই কবিমনের ভাবময় স্মৃতিপুঞ্জ ও প্রৌঢ়ত্বের বিশেষ অনুভূতি পেয়ে গেছে একত্রিত ও সম্মিলিত হবার মত রূপগত সঙ্গতি।

পাদটীকা :

১. পাণ্ডুলিপি : ক্ষণিকা (১৯০০) ; অধিগ্রহণ সংখ্যা : ১২০ ; রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার, শান্তিনিকেতন।
তথ্যাবলী : (ক) কালো চামড়ার বাঁধানো মলাট। ছোট পকেট বুক। চারপাশে পিতলের বন্ধনী।
(খ) পৃষ্ঠা : ৫২ পাতা লেখা
(গ) বিষয় : একদিকে 'এখন ভুলিব সকল কর্ম', অন্যদিকে miss Dr Bose'।
(ঘ) তারিখ : ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।
(ঙ) স্থান : রেলগাড়ি, দার্জিলিং পথে।

২. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৩ ; পঃ বঃ সরকার, জুলাই ১৯৮০।

৩. প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে কোলরিজের একটি উক্তি ও কিছু কথা :
There must be not only a partnership, but a union ; of interpenetration of passion and of will ; of spontaneous impulse and of voluntary purpose—অর্থাৎ, অর্থ ও ধ্বনির, আবেগ ও ইচ্ছার, চেতন ও অচেতন ইত্যাদির মধ্যে কেবল সমন্বয় নয়, একেবারে একাত্মতাই হল কবিকৃতির যথার্থ ভূমিকা। একটি কবিতার বিভিন্ন পাঠভেদ ঘটে থাকে এই যথার্থ ভূমিকাটিতে কবিকৃতির অধিষ্ঠিত হওয়ার যে অন্তঃপ্রেরণা, তা থেকেই। সৃষ্টি প্রকরণের মূলতত্ত্বই হল integration। আর এরই পরিণতি যে কবিতা তা হল unity of manifold।

৪. সেসব ক্ষেত্রে কবিতার ভাষা একেবারেই হয়ে ওঠে, কীট্‌সের মতে, the true voice of feeling।

৫. পংক্তিগুলি অদ্যাবধি অপ্রকাশিতই থেকে গেছে।

৬. প্রসঙ্গত মনে পড়ে কবিশেখরের জবানিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—কবিতা 'বোঝবার জন্ত নয় বাজবার জন্ত'। কবিতার ভাষা বোঝায় না, বাজে। এর আবেদন মনের বৌদ্ধিক স্তরের অপূর্ণতাকে অতিক্রম করে চেতন অচেতন সব স্তরেই সঞ্চারিত হয়, অনুরণন জাগায়। এই অনুরণন জাগে না পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়ার পাঠে—'আকাশ' শব্দের প্রয়োগে।

৭. এই পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে যেন এলিয়ট কথিত auditory imagination সম্পর্কিত ভাবনা। এলিয়ট বলেছেন—What I call the 'auditory imagination' is the feeling for syllables and rhythm, penetratiog far below the conscious levels of thought and feeling, invigorating every word.

৮. এলিয়ট বলেছেন auditory imagination 'works through meanings, certainly, or not without meaniug in the ordinary sense, and fuses the old and obliterated and the trite, the current, and the new and surprising, the most aucient and the most civilized mentality'. এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও auditory imagination-এর এই ক্রিয়া লক্ষ্য করা যেতে পারে।

৯. কারণ মিল কবির ভাবের অগ্রসরণের পথে লণ্ঠনের আলো—বলেছেন বোদলেয়র (অনুবাদ : শিশির কুমার দাস—কবিতায় মিল ও অমিল)। ক্লোদেল বলেছেন : মিল অলঙ্কারমাত্র নয়, প্রসাধন নয়, কাব্যের সঙ্গে জৈবিক ঐক্যে বাঁধা (অনুবাদ : প্রাগুক্ত)। আলোচ্য অংশেও বেলা-ভেলা-খেলা, ভাবতেছিলেম-দেখতেছিলেম—এই মিলগুলি গড়ে উঠেছে যদিও সচেতন কবি-প্রয়াসের ফলে, তবুও লক্ষ্য করলে দেখা যায় এখানে একটি শব্দ যেন আরেকটিকে আহ্বান করেছে অন্তত স্বাভাবিক ও সহজভাবে। ফলে পাঠপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে অন্ত্যমিল গড়ে উঠেছে তা যেন হয়েছে কবি-প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ মাত্র। তাই তারা ভাবে অগ্রসরণের পথের আলো এবং কাব্যের সঙ্গে জৈবিক ঐক্যে বাঁধা।

১০. এই পরিবর্তনের ফলে দুটি পংক্তি অর্থগত তাৎপর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে

যে রূপ ধারণ করলো তার ধ্বনিগত বিন্যাস এইরকম—পাতার ভেলা→ প্+আ+ত্+আ+র্ ভ্+এ+ল্+আ, নানান খেলা→ন্+আ+ন্+আ+ন্+খ্+এ+ল+আ, স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য রয়েছে দুটি পংক্তিতেই। বলা বাহুল্য এই বিন্যাস গড়ে তুলেছে ধ্বনিরূপ এবং অর্থের মধ্যে এক সামরস্য। এলিয়টের কথায় একে বলা যেতে পারে—the complete consort dancing together !

১১. রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড : প্রশান্তকুমার পাল ; ২৮৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এই চারটি পংক্তির প্রথম পংক্তিটির পাঠ—'যে আছে ঐপারের ঘাটে'। 'ঐপার' আর 'ঐ পার'-এর মধ্যে অর্থগত ব্যবধান আছে। শ্রদ্ধেয় রবিজীবনীকার পাণ্ডুলিপির পাঠসংগ্রহের ক্ষেত্রে মনঃসংযোগ হারিয়েছেন। পাণ্ডুলিপিতে পাণ্ডুলিপির প্রাসঙ্গিক পংক্তিটির পাঠ—'যে আছে ঐ পারের ঘাটে'।

১২. পাণ্ডুলিপি চিত্র (রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন-এর সৌজন্যে)।

গল্প

চুম্বক

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

যমুনা প্রায় পনেরো বছর আগে প্রথম এই কলকাতা শহরে এসেছিল। গ্রাম থেকে কলকাতায় সে সখ করে আসেনি। প্রাণের দায়ে এসেছে। সে বছর তার স্বামী একটা গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। যমুনা বলে সে শুধু নিজে মরেনি ; তাকেও মেরে রেখে গেছে। তার বড় ছেলেটি তখন দু'বছরের, ছোটটি পেটে। যমুনার দেওর ভাসুর যারা ছিল, তারা আঁতুর না পেরোনো পর্যন্ত যমুনাকে দেখে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের হাত গুটিয়ে নেয়। দুটি শিশু এবং তার নিজের দু'বেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান তার ঘরে ছিল না। তখন তার ননদ হরিদাসী তার খুব উপকার করে। সে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসে।

হরিদাসী প্রথমে কবে কলকাতায় আসে, তার স্পষ্ট মনে আছে। যেবার দুর্ভিক্ষ হয়, সেইবার। সেও একটি মেয়ে কোলে নিয়ে বিধবা হয়। তার

ভাইরা ছিল। কিন্তু এই বিপদের দিনে তারা তাকে আশ্রয় দেয় নি। মাসীকে দেখিয়ে দেয়। এই মাসী কলকাতায় একটা হাসপাতালে কাজ করত। আজকের তুলনায় তখন চাইলে কাজ পাওয়া যেত। হরিদাসীও পেয়েছিল। কিন্তু সেই হাসপাতালে সে বেশিদিন টিকতে পারেনি। তখন তার কাঁচা বয়স। সেই বয়সে হাসপাতালের হরেকরকম লোকের মধ্যে বসবাস করতে তার ভয় হত। এখানে যারা কাজ করে, আসে যায়, তাদের কেউ কেউ প্রেম ভালবাসা বোঝে না। যা বোঝে, তাতে হরিদাসীর মন সায় দেয়নি। তাই মাসী তাকে দক্ষিণ কলকাতার একটি পাড়ায় ঝিয়ের কাজ জুটিয়ে দেয়। সেই থেকে চল্লিশ বছরের উপর হরিদাসী সেই পাড়াতেই আছে। সে সাত-আট বাড়ি কাজ করে। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে সিঁড়ির নীচে শোয়। পাঁচ বাড়ী পাত কুড়িয়ে নিজের খাওয়া চালিয়ে নেয়। টাকাটা যা পায়, প্রায় সবই বাঁচে। এই টাকা আবার সে সুদে খাটায়। প্রতি মাসে প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা সুদ। কোন লেখাপড়া নেই, বন্ধকের ব্যাপার নেই। মুখের কথায় বিশ্বাস করে সে টাকা ধার দেয়। কেউ কেউ তাকে ঠকায়। তবে বেশির ভাগই ঠকায় না। কেননা, একবার ঠকালে পরে দরকার হলে, তার চাওয়া মাত্র টাকা পাবে কোথায়। তাই হরিদাসীর টাকা, সুদে-আসলে, গর্ভস্থ ভ্রূণের মত, ধীরে ধীরে বাড়ে। এই টাকা থেকে সে তার গ্রামের বাড়ী মেরামত করে, সুবিধেমত জমি কেনে, একটা ঘর পাকা করার, এবং ছোট একটা পুকুর কাটার কথা ভাবে। হরিদাসীর নিজের ছেলে নেই, তবে অনেকগুলি নাতি-নাতনী এবং একটা অপোগণ্ড জামাই আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে হরিদাসী এতসব করে।

যমুনা অতসব ভাবে না। সে ভাবে ছেলে দুটি বড় না হওয়া পর্যন্ত সে ঝিয়ের কাজ করবে। পরে আর করবে না। ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে গ্রামের বাইরে এসেছে, কিন্তু গ্রাম ছাড়েনি। রোজ সকালের গাড়ীতে অন্য অনেকের সঙ্গে সে কলকাতায় আসে। আবার বিকালে বাড়ী ফিরে যায়। সকালে এসে কাজ করতে হলে, তাকে রোজ রাত তিনটেয় ঘুম থেকে উঠতে হয়। ষ্টেশন থেকে তার বাড়ী অন্তত দু মাইল। এতটা পথ রাতের অন্ধকারে সে একা আসতে পারে না। তাই দলের সঙ্গে আসে। গ্রামের রাস্তায় আলো নেই। তাই নিয়ে আসতে হয়। কেরোসিনের দাম তারা ক'জন পালা করে দেয়। বাড়ী ফিরতে এমনিতে তার সন্ধ্যা, শীতের দিনে রাত হয়ে যায়। মাত্র ক'ঘণ্টার জন্ত রোজ রোজ বাড়ি গিয়ে

লাভ কি তোমার, একথা বললে যমুনা বলে, না গিয়ে উপায় কি। এখানে কোথায় থাকব। এই বয়সে তো দিদির মত যেখানে সেখানে রাত কাটাতে পারব না। তাছাড়া দুবেলা খেতে দেবে কে? যদি বলা যায়, এখানে থাকা-খাওয়ার একটা কাজ জুটিয়ে নিলেই পার, তাহলে যমুনা বলে, তা হবে না, বাবু। বাড়ি না গেলে ঘরদোর সামান্য যা আছে, কিছু থাকবে না। এমনিতেই থাকে না। কী হয় জানো। মাঝে মাঝে পাড়া-পড়শিরা রাত্রে হামলা করে। খুঁদকুঁড়ো, কাপড়-চোপড়, ছেঁড়া কাঁথা, ছাগলটা, মুরগীটা যা পায় নিয়ে যায়।

তুমি কি কর তখন?

কী আর করব। চুপ করে সহ্য করি।

কেন, তোমাদের ওখানে থানা পুলিশ নেই?

ক' মাইল দূরে আছে। কিন্তু থানা-পুলিশ করলে কি আর গ্রামে টেকা যাবে। এখন চুরি করে চলে যায়। তখন ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

তাই পনেরো বছর ধরে যমুনা একই ভাবে যাওয়া-আসা করছে।

কলকাতায় সে তিন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। বাসন বাজে, কাপড় কাচে, কল থেকে খাওয়ার জল, বুথ থেকে হরিণঘাটার দুধ আনে, মাছ কাটে, বাটনা বাটে। সপ্তাহে একদিন বাবুদের রেশন তুলে দেয়।

সোমনাথের বাসায় তাকে এসব করতে হয় না। সেখানে সে শুধু রান্না করে। সোমনাথের কাছে যখন আরও লোক ছিল, তখন সে রোজ দুবার আসত। একবার দুপুরে, আর একবার বিকেলে। সোমনাথ এখন একা থাকে। যমুনা তাই দুপুরে একবারই আসে। রাত্রির খাওয়ার ব্যবস্থা সে তখনই করে যায়। তাই বিকেলে সে আর আসে না। রান্নাও তাকে অনেক রকম করতে হয়না। সোমনাথ সব জিনিষই সেদ্ধ খায়। সঙ্গে শুধু একটা ঝোল থাকে। তাছাড়া ঘি আছে, দই আছে। এতেই তার বেশ চলে যায়। সোমনাথের বাসায় যমুনার কাজ তাই অনেক কমে গেছে। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে তার সব কাজ শেষ হয়ে যায়। আগে সময় লাগত এর ডবল। যমুনার এখন কাজ কম। কিন্তু সেজন্য সোমনাথ তার মাস মাইনে কমায় নি। যমুনা ও-দিকটা বুঝতে চায় না। প্রায়ই বলে, মাইনে বাড়াও। জিনিষপত্রের যা দাম, তাতে এই টাকায় চলে নাকি কারও। সোমনাথ বলে, সময় হলেই মাইনে আগেও বাড়িয়েছি, এখনও বাড়াব। কিন্তু তা দিয়ে কি

তোমার অভাব ঘুচবে, যমুনা ? পার তো তোমার বড় ছেলেকে একটা কাজে ভিড়িয়ে দাও।

যমুনা বলে, ও কী কাজ করবে বাবু। লেখাপড়া জানে না। সোমনাথ বলে, সবাই কি আর লেখাপড়া জানে। তবুও তো কোন না কোন কাজ করে।

যমুনা বলে, সকলে করে না, করতে পায় না। কেউ কেউ করে। পেলে, আমার আমার ছেলেও করবে। কিন্তু পাচ্ছে কোথায় ?

সোমনাথ বলে, তোমরা যে কী রকম। ছেলে কিছু করে না। অথচ সাত তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে দিলে। এরপরে ছেলেপিলে হবে। তাদের কে দেখবে, যমুনা।

যমুনা বলে, বিয়ে আমি দিইনি। ওর জ্যাঠারা দিয়েছে।

সোমনাথ বলে, জ্যাঠারা বিয়ে দিল। এবার তার রোজগারের ব্যবস্থা করে দিক।

যমুনা বলে, তাদের একথা বলছে কে। আর বললেই তারা দিচ্ছে কোথা থেকে।

সোমনাথ বলল, তোমার ছেলেকে যারা মেয়ে দিল, তারা কী দেখে দিল ?

যমুনা বলল, কী আর দেখবে। মেয়ে বড় হয়েছে, তাই বিয়ে দিয়ে দিল। তারপরে অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

সোমনাথ বলল, অদৃষ্টে যা আছে, সে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ছেলে-বৌয়ের জন্য খাটতে খাটতে তোমার জানপ্রাণ কয়লা হয়ে যাবে।

যমুনা বলে, তার কি বাকি আছে বাবু।

সোমনাথ জানে, তার বিশেষ বাকি নেই। যমুনা প্রায়ই অসুখে ভোগে। রোজ কাজে আসতে পারে না। মাসে তিন চারদিন কামাই সে করবেই। সোমনাথের এতে অসুবিধা হয়। সে যা কোনদিন করেনি, তাকে তাই করতে হয় তখন। গ্যাসের উনুনে যেমন পারে, তাকে দুটো ভাত সেদ্ধ করে নিতে হয়।

তবুও যমুনাকে সে বিশেষ কিছু বলে না। মেয়েটি বিশ্বাসী। কোন জিনিষ এদিক-ওদিক করে না। কাজকর্মও মোটামুটি পরিষ্কার। তাছাড়া তাকে ছাড়িয়ে অন্য একজনকে রাখলে সে যে আরও বেশি কামাই করবে না, কে বলতে পারে। তাই সে ভাবে, যা চলছে, চলুক। সে একা একা থাকবে, অথচ গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, তা হয় না।

রোজ বেলা এগারোটা আন্দাজ যমুনা সোমনাথের বাসায় ঢোকে। সোজা রান্নাঘরে চলে যায়। সোমনাথ রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন কি রান্না হবে, মোটামুটি বলে দেয়। যমুনা কোন আপত্তি করে না। সে নম্র গলায় বলে আচ্ছা।

সেদিন বাসায় ঢুকে যমুনা সোমনাথের ঘরের দিকে তাকাল। বলল, লোকটা চলে গেছে ?

সোমনাথ বলল, কোন লোকটা ? যমুনা বলল, সেই যে, কাল এখানে এসেছিল। যার জন্যে আমি বেশি করে চাল নিলাম। যার সঙ্গে তুমি খেলে, গল্প করলে, সেই লোকটা।

সোমনাথ বলল, ও আমার বন্ধু। ছোটবেলায় আমরা একসঙ্গে পড়াশুনা করেছিলাম।

যমুনা বলল, বিশ্বাস হয় না। ওকে কেমন চাষা-চাষা দেখতে লাগে।

সোমনাথ বলল, ও কথা বলতে নেই।

যমুনা বলল, তোমাকেও তো দেখছি। তোমার সঙ্গে ওর কোন মিল নেই।

সোমনাথ বলল, হাতের পাঁচটা আঙুল কি একরকম হয়। ওর গায়ের রঙটাই যা কালো। কিন্তু চোখ দুটো কী বড় দেখেছো ?

যমুনা বলল, দেখেছি। চোখদুটো শুধু বড়ই নয়। লাল টকটকে। দেখলে ভয় করে। ডাকাত মনে হয়।

সোমনাথ বলল, ও একসময় তো ডাকাতই ছিল।

যমুনা অবাক হয়ে সোমনাথের দিকে তাকাল। ডাকাত তোমার বন্ধু. বাবু !

সোমনাথ বলল, ও কি সাধারণ ডাকাত ছিল ? দেশের জন্যে ডাকাতি করত একসময়। সে অনেকদিন আগের কথা। দেশ তখন স্বাধীন হয়নি।

যমুনা বলল, ডাকাতি করত কেন ? সোমনাথ বলল, সে সময় অল্প বয়সের অনেক ছেলেমেয়েই ডাকাতের দলে ভিড়েছিল।

যমুনার চোখ কপালে উঠল। বল কি বাবু ? মেয়েরাও ছিল ?

ছিল বৈকি। তবে তারা গুণতিতে খুব বেশি ছিল না। তোমাদের গ্রামে যারা চুরি-ডাকাতি করে, ওরা তাদের মত ছিল না। ওরা ডাক লুঠ করত, পুলিশের রিভলভার চুরি করত। ভাবত, এইসব করে একদিন সাহেবদের এদেশ থেকে তাড়াতে পারবে।

যমুনা বলল, পুলিশ কিছু বলত না ?

সোমনাথ বলল, বলত না আবার। ধরে নিয়ে যেত। মারধোর করত। জেলে দিত। আমার বন্ধুটি কতবার জেলে গেছে।

যমুনার মনে হল, তার স্বামীও একবার প্রতিবেশীর ছাগল চুরি করে ক'দিনের জন্য হাজতে গিয়েছিল। সে বলল, লোকটা যা রোগা। ও এসব করত কী করে।

সোমনাথ বলল, 'লোকটা' বল না। বল, ভদ্রলোক। আর রোগা হলে কী হবে। ওর ভিতরই আগুন ছিল।

যমুনার মনে হল, ওর স্বামীও খুব রোগা ছিল। কিন্তু পান থেকে চুণ খসলে, বিশেষত নেশা করে এলে সে যখন তাকে মারধোর করত, তখন কেউ তাকে ঠেকাতে পারত না। সে জিজ্ঞাসা করল, ও কোথায় থাকে, বাবু ?

সোমনাথ বলল, সে জায়গা তুমি চেন না। বর্ধমানের একটা গ্রামে।

যমুনা বলল, বর্ধমানে তো দামোদরের ক্যানেল গেছে, তাই না ?

সোমনাথ বলল, তুমি এত খবর রাখ ? হ্যাঁ, তা গেছে।

যমুনা বলল, তাই সেখানে বছরে দু-তিনটে ফসল হয়। শুনেছি কামিনদের পেটের মত, ওখানে জমি কখনও খালি পড়ে থাকে না।

যমুনার অশালীন তুলনা সোমনাথের রুচিকে আঘাত করল। সে শুধু বলল, তা হবে।

যমুনা সহজে ছাড়বে না। ও বলল, ওদিককার বেশিরভাগ মানুষই তো চাষবাস করে, চাষী।

সোমনাথ বলল, কিন্তু সকলে চাষবাস করে না। সবাই চাষী নয়।

যমুনা আবার আগের কথায় ফিরে গেল। তোমার বন্ধুকে কিন্তু চাষী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

সোমনাথ জানে, যমুনার স্বভাবই এইরকম। সে একবার যা ধরবে, তা সহজে ছাড়বে না। সোমনাথ তাই অর্ধেকটা ত্যাগ করে বাকি অর্ধেক বাঁচাতে চেষ্টা করল। বলল, আমার বন্ধু নিজে চাষী নয়, কিন্তু সে চাষীদের সঙ্গে থাকে।

যমুনা বলল, তাই বল। তখনই বলেছিলাম না। চাষী না হলে কারও অমন চেহারা হয়।

সোমনাথ যমুনাকে আবার বোঝাতে চেষ্টা করল। বলল, ও চাষীদের সঙ্গে থাকে। তাছাড়া আমরা অনেকেই তো একসময় চাষবাস নিয়ে,

চাষীদের নিয়ে থাকতাম। এখন অবস্থার চাপে শহরে এসে জুটেছি।

যমুনা বলল, চাষীদের সঙ্গে থেকে ও কী করে।

সোমনাথ বলল, তাদের বোঝায়, সাহস দেয়। বলে, জমিদার-জোতদারের অন্যায় অত্যাচার মাথা পেতে নিও না। একজোট হও। নিজেদের পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রান্তিতে আদায় করে নাও। দল বাঁধো।

যমুনা বলল, এক কথায় লোক ক্ষ্যাপায়।

সোমনাথ বলল, হয়ত তাই।

যমুনা এবারও সহজে ছাড়বে না। সে বলল, হয়ত নয়। ওরা তাই করে। আমাদের গ্রামেও দেখেছি কিনা।

কি দেখেছ?

তুমি যা বললে, তাই আমার স্বামীও এই কাজ করত। সে নিজে এতটা পারত না। যারা পারে ও তাদের সঙ্গে থাকত।

সোমনাথ বলল, তুমি থাকতে না?

যমুনা বলল, থাকতে চাইলেই কি থাকা যায়। আমার সংসার ছিল। কোলে বাচ্চা ছিল।

সোমনাথ বলল, আমার বন্ধুর তো ছেলেপিলে নেই। পিছুটান নেই। তাই ও পারে।

ছেলেপিলে নেই কেন? বিয়ে করেনি?

করেছিল। কিন্তু ছেলেপিলে হয়নি। দুঃখের কথা তোমাকে কি বলব যমুনা, ওর বৌ-ও নেই।

যমুনা বলল, তোমার মত ওরও বৌ মরে গেছে? এমন না হলে আর বন্ধু।

সোমনাথ বলল, বৌ মারা যায়নি। ওকে ছেড়ে গেছে। সে এখন অন্যের সঙ্গে থাকে।

যমুনা বৌটির পক্ষ নিল। স্বামী যদি সন্তান না দিতে পারে, তাহলে অনেক মেয়ে ও-রকম করে।

সোমনাথ বলল, তোমার যদি সন্তান না হত, তাহলে তুমিও তাই করতে?

যমুনা বলল, আমার তো হয়েছে। না হলে কী করতাম, বলতে পারিনা।

সোমনাথ বলল, আমি বলতে পারি। তুমি তোমার স্বামীকে ছেড়ে যেতে না।

কেন ?

কেননা, তুমি তাকে ভালবাসতে।

যমুনা বলল, স্বামীকে সব মেয়েই ভালবাসে।

যে মারধোর করে, তাকেও ?

হ্যাঁ, তাকেও। বাইরের লোক শুধু মারধোরই দেখে। স্বামীর আদর-ভালবাসা তো দেখানো যায় না, তাই দেখে না। কথা যখন উঠল, তখন বলি, ওকে আমি এখনও ভালবাসি।

এখনও ?

হ্যাঁ, এখনও। তা না হলে পাড়ার লোকজন আমাকে এতদিন কাক-চিলের মত ঠুকরে খেত।

সোমনাথ যুবতী যমুনার দিকে একবার তাকাল। যমুনা বলল, আমি সবাইকেই ভালবাসি। ভালবাসাই আমার স্বভাব।

সোমনাথ জানে, এই স্বভাব যমুনার নয়, ওর বয়সের। মুখে সে সেকথা বলল না। বলল, জানি, তুমি যে আমার জন্ত পরিপাটি করে রান্না কর, সে শুধু টাকার জন্ত কর না। আমাকে ভালবাস বলে কর।

যমুনা কোন কথা বলল না। সে উনুনে মাছের ঝোল চাপিয়েছিল। সেদিকে মন দিল।

সোমনাথ বলল, আমার বন্ধু, যাকে তুমি এতক্ষণ গালমন্দ করলে, তাকেও তুমি ভালবাসতে চাইছো।

যমুনা বলল, তা এমন দুঃখী মানুষের কথা শুনলে, কার মন না গলে বল।

সোমনাথ বলল, তুমি ওকে যতটা দুঃখী ভাবছ, ও কিন্তু ততটা দুঃখী নয়। চাষাভুষোদের নিয়ে ও দিব্যি আছে।

যমুনা বলল, বাইরে থেকে তাই মনে হয়।

সোমনাথ বলল, বাইরে ছাড়া ভিতরের কথা আমি কী করে জানব।

যমুনা বলল, তোমার বন্ধু, তুমি জানবে না তো কে জানবে। আমি তো ওর কেউ নই। আমিও বুঝতে পারি।

কী বুঝতে পার ?

বুঝতে পারি যে, ওর মনে খুব দুঃখ। জান তো, অন্ত সব দুঃখ রাখার জায়গা আছে, কিন্তু মনের দুঃখ রাখার জায়গা নেই। তোমার বন্ধু তাই এমন অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

সোমনাথ বলল, আমার বন্ধুর যখন সব ছিল, তখনও সে তাই করত।

যমুনা বলল, হয়ত করত। আমার স্বামীকেও তাই করতে দেখেছি। তবে তোমার বন্ধু তখন নিশ্চয়ই নিজেকে এমন আগাপাশতলা চাষী করে তোলেনি।

সোমনাথ আর কথা বাড়াতে চাইল না। বলল, তা হবে।

যমুনার কাজও শেষ হয়ে এসেছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, উনি আবার কবে আসবেন ?

সোমনাথ বলল, তার কি কিছু ঠিক আছে। ওর যেদিন খেয়াল হবে, চলে আসবে।

যমুনা বলল, এবার উনি যেদিন আসবেন, সেদিন তুমি কিছু বলবে না। আমি নিজের ইচ্ছেমতো রান্না করে ওঁকে খাওয়াবো। সেদিন হতচ্ছেদ্দা করেছি। আর করব না।

সোমনাথ বলল, বেশ তো।

যমুনা এতক্ষণ যা করেনি. এবার তাই করল। সে আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছল।

পশ্চাতের কোলাহল হতে

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

॥ ৬ ॥

এইবার আমার পিতৃপরিচয় এবং পিতৃব্য পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কারণ আমি নামক এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কারণরূপে বাবা-কাকা এই উভয় ভ্রাতাকে একসঙ্গে টানতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা মৈমনসিং জেলারই ছিলাম না। আমাদের পিতৃপুরুষ ছিলেন ঢাকা জেলা মানিকগঞ্জের মিতড়া গ্রাম নিবাসী, এই মিতড়ার ভট্টাচার্য বংশ দুটি মূল শাখায় বিস্তৃত হয়। মূলশাখা মানিকগঞ্জে, অন্য শাখা টাঙ্গাইলে। অন্য দিকে দুটি প্রখ্যাত সাধনাসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশ ছিল প্রায় সমসাময়িক—(১) আদিতে পাবনা পাকুড় থেকে আসে—শ্রুত উচ্চারণে নির্গলিত পাকড়াশীদের পূর্বপুরুষ পূর্ণানন্দ। তিনি কি কারণে জানিনে, পরে মৈমনসিংহ সদরে কাটিয়াল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। খুব বড় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন তিনি। কিছুদিন পর প্রব্রজ্যা নিয়ে চ'লে যান

কামরূপ কামাখ্যায়। (২) কুমিল্লা জেলায় মেহের গ্রামের প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ সর্বানন্দ। সঙ্গে 'সর্ববিদ্যা সর্বসুন্দর' এইগুণ-পরিচায়ক প্রত্যয় সর্বদাই যুক্ত হতো। আমাদের আদি পিতা এবং আদি মাতা ছিলেন ঠাকুর রাঘবানান্দ এবং অর্বকালী দেবী। এই তিন ঠাকুরবংশের সন্তানরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। পরে বৈবাহিক ভেজালে গৌর-শ্যাম-কৃষ্ণের তেভেজাল হয়েছে—হওয়াও স্বাভাবিক।

টাঙ্গাইলে অধ্যুষিত "বেহুবির", অপভ্রষ্ট বেথইর, গ্রামের কৃষ্ণরাম সার্বভৌম অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সন্তান ছিল না। তিনি প্রায় আড়াইশো বছর আগে মানিকগঞ্জ থেকে দুটিপুত্রসহ শ্রীকালীনারায়ণ ভট্টাচার্যকে এনে তাঁরই বেথইর গ্রামের অনতিদূরে বিক্রমহাটীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কালীনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র নীলকণ্ঠ আমাদের পূর্বপুরুষ। কনিষ্ঠপুত্র গৌরী-শঙ্করকে কৃষ্ণরাম সার্বভৌম দত্তক গ্রহণ করেন। বেথইর জমিদারীর নাম হলো, স্টেট্ গৌরীশঙ্কর। আমরা হীনবল ক্ষুদ্র ভৌমিক মাত্র। গৌরীশঙ্কর কেমন ছিলেন জানিনে, কিন্তু আমাদের নীলকণ্ঠ শুনেছি নীলকণ্ঠের মত পঞ্চমুখেই শাস্ত্রবিচার করতেন। তাঁর শ্রীহস্ত-লিখিত 'তন্ত্রসার' খানা আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে দান করেছি। 'তন্ত্রসার' প্রায় সব তান্ত্রিকের ঘরেই আগে থাকতো। কিন্তু আমাদের নীলকণ্ঠের হস্তাক্ষর দেখবার মত। আমি আজও সে মুক্তাপংক্তি স্মরণ করি।

নীলকণ্ঠের পর আমাদের গৃহে যে কারণেই হোক বিদ্যামান্দ্য ঘটেছিল। আমার মনে হয় সামান্য তালুক এবং সামান্য ক-বিঘা জমিতে সচ্ছল অবস্থা নিশ্চয়ই ছিল না। নীলকণ্ঠের পুত্র রামলোচনের কথা জানিনে। তাঁর পুত্র আমার পিতামহ চন্দ্রনাথ নিজপুত্র, আমার পিতৃদেব, ভৈরবকে কিছুদিন 'বানিয়াফইর' টোলে দিয়েছিলেন। পরে অপরিণত বয়সে পিতামহ ক্ষুদ্র দুটি নাবালক পুত্র রেখে সংসার থেকে চির বিদায় নিয়েছিলেন। আমার বাবা এবং কাকা—ভৈরব-মহেশ, বহু কষ্টে মানুষ হতে থাকেন। কাকা অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বৃত্তির টাকায় মৈমনসিং হাডিঞ্জ ইস্কুলে পড়তেন। তিনি তাঁর মেধার পুরস্কাররূপে একটি রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন। আমার জ্ঞানোন্মেষের পর মাত্র ৫ বছরের মত পিতৃ-সহবাস কতকগুলি সুন্দর দৃশ্য এবং সুন্দর গানে ধন্য হয়েছিল। বাবার অতিপ্রত্যূষে উচ্চারিত শয্যাত্যাগের মন্ত্রগুলিই আমার কানে সুধাবর্ষণ করতো। সর্বশেষে যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে বলতেন—বাবা চন্দ্রনাথ, মা শিবসুন্দরী। উপভোগ্য দৃশ্য ছিল, লোহার

আলমারি খুললেই প্রথমে কাকার রৌপ্যপদক মাথায় এবং বুকে ঠেকাতেন। পরে তাঁর হাত কাগজপত্রে এবং টাকা পয়সায় পড়তো।

এইবার ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে আমাদের কিছুটা বড় হওয়ার পালা। আমাদের বেথইয়ের পিসিমাদের রূপের প্রসিদ্ধি ছিল। একটি পিসিমার নাম ছিল "ত্রিপুরা সুন্দরী"। তাঁর বিয়ে হলো হাইকোর্টের তৎকালীন প্রসিদ্ধ আইনজীবী এবং সম্পন্ন জমিদার মোহিনীমোহন রায়ের সঙ্গে। ভবানীপুর বহুবাজারের সংলগ্ন মোহিনী মোহন রায় ষ্ট্রীট আজও বর্তমান। পাশেই ছিল তাঁর বন্ধু স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ। পিসিমা স্নেহপরবশ হয়ে ছোট ভাই মহেশকে ভবানীপুরে নিয়ে স্বামীর হাতে দিলেন। মোহিনী-মোহন বালকের বুদ্ধি এবং গুণপনা দেখে তাঁকে নিজের জমিদারী খুলনার ছোট জেলা-কাছারীতে পাঠালেন। কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রথম নায়েব এবং পরে ম্যানেজারী পদে বহাল করলেন। ক্রমোন্নতি এবং মর্যাদা এবং সাধু ব্যবস্থাপনার পরিচয় পেয়ে কাকার উপর তাঁর স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকলো। সেই থেকে বাবা রইলেন টাঙ্গাইল বিক্রমহাটী মানিকগঞ্জের মালিক। আর কাকা হলেন খুলনায় অর্জিত এবং ক্রমবর্ধমান বিস্তীর্ণ সম্পত্তির মালিক। কিন্তু দাদা ভাই অবিভক্ত এবং চিরদিন ছিলেন স্নেহ-সংবদ্ধ। কাকা বাড়ীর দুর্গোৎসবে, খুলনার কাজের দুরন্ত চাপে প্রায়শই আসতে পারতেন না। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রেরিত চিঠি খানা আসতো প্রায় ৩০।৪০ পৃষ্ঠার। মেজদা পূর্বাহ্নে চিঠি খানা মাথায় ঠেকিয়ে রেখে যেতেন। বিকেলে বাবা আমাদের দুই সরকার এবং ভাইদের নিয়ে পড়তেন দীর্ঘ একঘণ্টা ধরে। বিষয়বস্তু, পূজো কিভাবে করতে হবে তার নির্দেশনামা। কাকা ছিলেন নিখুঁত ব্যবস্থাপক। কাকার প্রিয় লেখক ছিলাম আমি, কারণ একটি পোস্টকার্ডে শতাবধি লাইন আর কেউ লিখতে জানতো না। কাতর কণ্ঠে বলতাম কাকা! আর ধরে না। বলতেন—সে বাপু ওরই মধ্যে গুঁজে। শেষে নামসই হতো কোনরকমে 'মহেশ ভট্টাচার্য'র স্থান মিলতো না।

এইবার পিতৃদেব। দুঃখে মানুষ হয়েছিলেন, নিজে কর্মবীর এবং ভ্রাতার ভক্তিভাজন চিরদিন। সব সমন্বিত হয়ে বাবা হয়েছিলেন কেনারাম। ভোগীরাম হননি। বেচারামদের কাণ্ডকারখানা তাঁরই শুভাদৃষ্টে দেখতে হয়নি। বাবার পুণ্যাহের হালখাতায় অক্ষয়া তৃতীয়া দিবসে লিখিত হতো, বৈধ সীলমোহর নিয়ে, এক বিস্তৃত পরিচয়—

"ব্যবসা শুরুতা, তালুকদারী, জোতদারী, তেজারতী ও মহাজনী।"

এর সঙ্গে 'কাষ্ঠ ব্যবসায়ী' লেখা থাকলে পিতৃপরিচয় সম্পূর্ণ হতো। বর্ষায় আনতে হতো আসামী বৃহৎ শাল কাঠের চালান। বাড়ীতে করাতীরা চিঁড়ছে। বারমাসে মাইনেকরা মুকুন্দ সূত্রধর চৌকী (তক্তপোষ), বেঞ্চ, টুল ইত্যাদি তৈরী করছে। বাবার ব্যবসা চলছে। বর্ষায় পূর্ববঙ্গ জলে ভাসে। তখন দেখেছি বড় মেজ ছোট ৫।৬ খানা নৌকো ঘাটে বাঁধা। বৃহৎ ছই-ছাপরে মজবুত তিন কামরার নৌকো বর্ষায় সরকার, পেয়াদা নিয়ে জলে ভাসতো। পূজোর প্রাক্‌কালে ফিরে আসতো—আদায় তহশিলের টাকা এবং নিজ মহালের সোনামুগ, সরুচাল নিয়ে। বাবার একটি কার্যে আজও আমি ধিক্কার দিই। প্রাতর্ভ্রমণ করতেন। ক্রমশ সেবক ও সঙ্গী জুটতো, ফিরতেন দলবলসহ। তখনকার দিনে এ-গ্রামে, সে-গ্রামে দুস্থরা তাদের গাছ বিক্রী করতো। বাবা তড়িৎ ঘড়িৎ দাম দিতেন। কিন্তু সেই ক্রয় করা গাছগুলো আনতেন খুবই দেরী করে—তাদের জোর তাগিদ সত্ত্বেও। দু টাকার গাছ ক্রেতার বাড়ীতেই ১৫।২০ টাকার মাল হতো। তার পর নিজস্ব কাষ্ঠ বহনের নৌকোতে বর্ষায় বাড়ীতে আসতো। আমার মেজ সহোদর দেবীদাস বাবার এই দুর্গুণ পেয়েছিলেন। গ্রামের বলাই শেখের বাড়ীর দশ টাকার তেঁতুল গাছ থেকে ছাল কেটে কেটে অন্তত দশ বছর পূজোর কাঠের ব্যবস্থা করে একাদশ বছরে করাতি দিয়ে কাটিয়ে বাড়ী আনলেন। তখন দাম অন্তত একশো টাকা। বাবা সুদের ব্যবসা করতেন—কিন্তু অত্যন্ত সংযত সুদ। বাদ রেহাই দিতেন পার্টি বুঝে। কাঁচা ধানই অভাবে মানুষ দু টাকা মণ দরে সাপটে নিয়ে যেতো। ওজন হলে বাবা নিজে দুহাতে আঁজলা ভরে তাদের দিয়ে দিতেন তিনবার। আবার তাদের বস্তা থেকে তিন চিমটি ধান তুলে নিতেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন—শুধু দানে লক্ষ্মী বিরূপ হয়, সেইজন্ত তিন চিম্‌টি লক্ষ্মী ঘরে রেখে দিলাম। এদিকে অর্জনে প্রবল আগ্রহ, কিন্তু চৈত্র-বৈশাখে বছরে অন্তত দশ গ্রামে দশটি কূপ করিয়ে দিতেন। তাঁর অর্জন ও বিসর্জনে সামঞ্জস্য থাকতো। মেজদাদার (ভ্রাতৃব্য) আমলে শুধু বিসর্জন চলেছিল এবং মালিক পক্ষরাই চৌর্য ও প্রবঞ্চনায় মেতে উঠে বিক্রমহাটীকে পরিণামে সারশূন্য করে তুলেছিল। বাবা নিজে মিতব্যয়ী এবং সর্ববিষয়ে সংযমী ছিলেন। বিশেষ বিশেষ তিথিতে কারণ পান করতেন। কিন্তু কোনদিন বেচাল তাঁকে দেখেনি কেউ। তবে বাড়ীতে জাঁকজমকপূর্ণ ইষ্টপূজায় তান্ত্রিকদের সংযত করতে পারতেন না। তখন ঘনঘন সাইকেলে টাঙ্গাইল যাচ্ছে লোক এবং এক এক বোতল

ইংলণ্ডেশ্বরী আনছে। বাবা বিলিতি ছাড়া কখনো ধেনো খেতেন না। শেষ বয়সে আফিংয়ে আসক্ত হ'য়েছিলেন। সরষে পরিমাণ থেকে ছোট মটর পরিমাণে উঠেছিলেন। দীর্ঘাকৃতি ঋজুদেহ এবং বলশালী ছিলেন। প্রভাতে (সকাল ৭টা) স্বল্প পরিমাণ চাল চিবিয়ে জল খেতেন। বেলা ১০টা থেকে তৈলমর্দন পরিচারকের হাতে। ১১টা মধ্যেই আহার। দুবেলায় একছটাক খাঁটি গব্যঘৃত এবং ভালো জালের দুগ্ধ দুবেলায় ১½ সের। আমাদের দুধের সের ছিল ৯৬ তোলায়। মাছ, ডাল, তরকারি সামান্য। বৈকালিক আহার দুধের সর এবং ডাবের জল। সেদিকে কাকার আহার জমিদারী. ১০/১২টা বাটী চাই। বাবার তা ছিল না। উভয় ভ্রাতাই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। আমি বাবার কনিষ্ঠ পুত্র বলেই খুব প্রিয় ছিলাম। মা মেরেছেন, কিন্তু বাবা গায়ে হাত তোলেন নি। প্রত্যেক দিন আমাদের অতিথি আসতোই। অতিথি কিন্তু আত্মীয়স্বজন নয়—সম্পূর্ণ অপরিচিত পথচারী—ক্লান্ত, শুধু বিশ্রাম ও ভোজনার্থী। কখনো কখনো ব্যবসাদারও আসতো। তাতে বাবার বিরক্তি ঘটতো। তাঁর আসনে উপবিষ্ট হয়ে আমার হাতে পরিবেশন করাতেন। এতে সদ্‌গুণের উন্মেষ হয়—তাই তিনি বলতেন। দেখতাম অতি সাধারণ অবস্থার মুসলমানরাও 'সেলাম' জানালে বাবা উত্তরে সেলাম বলতেন। আমি বাবাকে তুমি বলতাম। কোন দাদারা সাহস করতো না। বলতাম, বাবা তুমি সেলাম বলো কেন? ভাবটা ছিল বাবাকে ওরা প্রণাম জানাচ্ছে,- বাবা প্রণাম জানাবে কেন? বাবা বোঝাতেন—বাবা, ওটা বলতেই হয়, ওটা ওদের এবারাৎ বা দস্তুর। রমজান মাসে গ্রামের রোজাদার মুসলমানদের স্ত্রী-পুরুষে মিলে শতাবধি ধর্মসাধকদের আমাদের কোন মুসলমান প্রজার বাড়ীতে সন্ধ্যার পর ভূরিভোজন করাতেন। ওদের অন্নে তুষ্টি—তিন তরকারী খাওয়া ওরা পছন্দ করতো—ডাল, তরকারী, মাছ, অম্বল ও পায়েস হতো ওদের অনভিপ্রেত উপরি পাওনা। ওরা সন্ধ্যার নমাজের পর আমাদের ভাইদের মাথায় কোরাণের সূরা পড়ে ফুঁ দিতেন। আমাদের মনে হতো—আমাদের সবকিছুর শান্তি হলো। এই পরিবেশে আমরা মানুষ হয়েছিলাম।

কাকা ১৯৩০ সালে তাঁর ছোট ছেলে ডাক্তার নরেন্দ্রনাথকে এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আমার মধ্যম সহোদর দেবীদাসকে, একসঙ্গে বিয়ে দিলেন। বোধ হয় দর্শনের সূক্ষ্ম অনুভূতি আসন্ন বিদায়ের ছবি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখাতো। ঐ সময়টায় তিনি বিক্রমহাটীতে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ মুসলমান চাষীকে

আমাদের জমিগুলির পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তাঁর হুকুমে জমিগুলির বীজ নির্বাচন এবং বপন হ'তো। এটা হলো কর্মচারীদ্বয় থেকে ক্ষমতা অপহরণ। তারপর দু'ভাইকে সান্ত্বনা দিতেন—বৃদ্ধ হ'য়েছ নন্দলাল, দ্বারকানাথ। তোমাদের কিছুটা কাজ কমানো দরকার। কাকার ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। বাড়ীতে বিবাহাদির ভোজ কলকাতার স্টাইলে হতো। এ-বিবাহে কাকা একটা অপূর্ব ফরমান দিলেন।—ভোজ মিটে গেছে—এখন বৌদের, আত্মীয়াদের, তোমরা একদিনের বিশ্রাম দাও। দিন নির্দিষ্ট হ'লো। সেদিন আমরা সব ভাই এবং আত্মীয় মিলে, পুরুষ সহচর নিয়ে সব কাজ করলাম—মায় জলতোলা, মসলা বাঁটা, রন্ধন এবং পরিবেশন। মেয়েরা খেলেন, হাসি তামাসা করলেন, পান দোক্তা চিবোলেন এবং আরাম করলেন। প্রত্যেক কোজাগরী পূর্ণিমার অক্ষক্রীড়ায় রাত্রি জাগরণ রাত্রি ১২টা পর্যন্ত। তারপর লটারি খেলা শুরু হতো সমগ্র গ্রামের পুরুষ মহিলা নিয়ে। অন্তত ৫০টি লট সুগন্ধি সাবান, আতর এসেন্স নানাবিধ সংসারী দ্রব্য নিয়ে। টিকেট বিক্রীর টাকাতে জিনিসগুলোর দাম উঠে আসতো। এক এক জনের ভাগ্যে দুই তিনটিও পুরস্কার জুটতো। কাকার আনন্দ, স্ফূর্তি, বিধিব্যবস্থার নৈপুণ্যের সীমা ছিল না। এরপর কাকা খুলনা বাড়ীতে চলে গেলেন এবং অসুস্থতা শুরু হলো।

১৯৩২ সালের জুলাই মাস। আমি সসম্মানে বি, এ, উত্তীর্ণ। আমার সুদীর্ঘকালের অভ্যস্ত জীবন ও তার প্রেক্ষাপট মৈমনসিং ছেড়ে কলকাতা প্রবাসে আসতে হলো। প্রথমেই মনে হলো খুলনায় গিয়ে কাকাকে প্রণাম করে এবং আশীর্বাদ নিয়ে আসি। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ভবানীচরণ সামান্য কারণে কয়েকমাস পূর্বে চিঠিতে কাকার মনে আঘাত দিয়েছিলেন। কাজটা আমার বিচারে অনুচিত এবং নির্দয় মনে হয়েছিল। আমি বরিশাল এক্সপ্রেসে সন্ধ্যায় খুলনার বাড়ীতে পৌঁছে শুনলাম—কাকা ডাক্তার-দাদার চেম্বার-সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে আছেন। ঠিক হলো রাত্রি যাপন করে প্রভাতে কাকার কাছে যাব। তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে জীবনে আমার এই প্রথম দেখা হবে।

আমি কেমন করে তাঁকে আজ আপনাদের সম্মুখে আনব? কিন্তু আনতে যে হবেই। আত্মগুপ্তির জন্য আমার এই আত্মপ্রকাশের প্রেরণা আসেনি। আইনজীবীরাই বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং বিশ্ব দর্শনের আংশিক দর্শনে কৃতার্থ হন—আমি তো সামান্য হবু শিক্ষক। তবুও ঈশ্বর আমাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতায়

ধন্য করেছেন। চল্লিশের দশকে ঢাকার একজন অত্যন্ত সাধু এবং আত্মজয়ীর ক্রন্দন শুনেছিলাম। তাঁর একমাত্র পুত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তিনি কেঁদেছিলেন—আমি কত পুত্রশোকাতুর পিতাকে শাস্ত্রবচন দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছি—আজ আমাকে সান্ত্বনা দেবে কে? শুধু চোখের জলে ভেসে বুঝতে পারছি অপ্রতিহত কালস্রোতকে রুদ্ধ করতে কেউ পারে না। আমি বুঝতে পারছি আমি কালস্রোতে ভাসমান এক ক্ষুদ্র তৃণ। আমার কোন শক্তিই নেই। কথা তো জীবনভোর কত বলেছি। এখন বুঝতে পারছি কথার চেয়ে ঘটনার শক্তি অনেক বেশী।

চন্দননগরে অত্যন্ত কৃতী বিদেশে লব্ধকীর্তি ডাক্তারকে ধনী বিদেশিনী ভার্যাসহ দেশে প্রত্যাগত হ'য়ে পূর্ব প্রেমিকার প্রেমে পুনশ্চ আবদ্ধ হয়ে কাঁদতে শুনেছি—Ethics, Jurisprudence আমাকেও পড়তে হয়েছিল, আজ আমি নিরুপায়। এতদিন বহুজনকে বহুতর উপদেশ দিয়ে কঠিনতম বন্ধনে পড়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি—কিছুই কিছু নয়। রক্ত মাংসের ধর্মে মস্তিষ্কের অজ্ঞেয় কোষগুলি দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। ধর্মবিধি, শাস্ত্র সব নিস্ফল হয়ে যায়। তাঁর পূর্বপ্রেমিকা ছিলেন তাঁরই সঙ্গে পাশ করা এম্. বি।

দীর্ঘ বাচালতা করব না। আমার কাকীমা শুনেছি চিররুগ্না ছিলেন। প্রভূত বিত্ত ব্যয়ে সকল চিকিৎসা নিস্ফল করে সবাইকে কাঁদিয়ে কাকাকে ফাঁকি দিয়ে কাকীমা চলে গেলেন। কাকা তখন মূলঘর ছোট জেলা কাছারীর সার্বভৌম শাসক। বিপত্নীক কাকা তাঁর কনিষ্ঠ দুই পুত্র এবং আমার বড় দুই সহোদরকে নিয়ে খুলনা গেলেন কিন্তু মূলঘর সন্নিহিত তাঁর কাঁটালতলা গ্রামের বাড়ীতে, সংসার পরিচালনায় বিব্রত হয়ে, একটি কায়স্থ কন্যাকে Governess বা সংসার সংরক্ষিকা নিযুক্ত করলেন। তিনি বিধবা এবং অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, এমন গল্প আমি শুনেছিলাম। সেদিনের প্রভাতে পরিণত প্রৌঢ়ার রূপ দেখে সেটা আমি সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। শুনেছি বাবা তাঁর প্রাণাধিক ছোট ভাইটির জন্য খুব ছোট করে' হুঁ, হুঁ করতেন। আমি আজ ভাবি, বাবার এই অব্যক্ত ধ্বনিও অনুচিত হয়েছে। চারটি ছেলের রক্ষণ এবং অবেক্ষণ করে কে? বিমাতা করতেন না। তিনি—সেই কায়স্থ কন্যা,—মাতৃস্নেহ নিয়ে সন্তান পালন করেছেন। বিত্ত, বৈভব, লোকজন, গৃহশিক্ষক, পাচক, ভৃত্য কিছুরই কাকার অভাব ছিল না। অভাব ছিল বালক ও শিশুর জন্য সত্যকার মাতৃস্নেহ—তা সার্থক হয়েছিল। এ আমি জ্যেষ্ঠদের মুখে শুনেছি।

আজ ১৯৩২ সালের শুভ প্রভাতে সস্নাত, কৃতাহ্নিক, কুলধর্মে অবিচল, রক্ষণশীল, অনতি-উনবিংশ বৎসরের তরুণ পুত্র, এই অধম, চললো তার পিতৃব্য দর্শনে। আমার মনের মধ্যে আসন্ন অপরিচিতার পরিচয় অনিশ্চিত এক ভাবাবেগ সৃষ্টি করে চলেছে। ক্রমশ অগ্রসর হ'য়ে চলেছি অদূরে অবস্থিত কাকার বাসগৃহের দিকে। আমি চিরকালই ভাবপ্রবণ, কঠিন-প্রাণ বিচার বুদ্ধিতে সুদৃঢ় মানুষ নই। এ দুর্বলতা এখন অনুভব করি। ভাবের ভুবনে ভ্রমণ আমার ভালো লাগে। এই জন্ত আমার অধ্যাপকরা বলতেন—এ গাধাটা politics বোঝে না, Poetics বোঝে ভাল। ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগ ভালই বুঝতাম। Wordsworth আর Keats তাঁদের কল্পনা নিয়ে আমাকে জাগর-স্বপ্নে বিভোর করে রাখতো। আজ প্রভাতে আমাকে ঋষি কবি Wordsworth খুব দোলা লাগিয়ে চলেছে। তাঁর সমগ্র জীবনটাই আজ আমার কাছে আবার জেগে উঠলো। পাপ? তার কোন নিশ্চিত সংজ্ঞা আছে? Wordsworth সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পুণ্যভূমি দর্শনের জন্ত ফরাসীদেশে গেলেন। সেখানে তাঁর সহজিয়া প্রেরণা এক ফরাসী মহিলার গর্ভে এক কানীন কন্যার জন্ম দিয়েছিল। বিপ্লবের ডামাডোলে কবি তাঁর দেশে ফিরে এলেন। ইংলণ্ডে ফিরে এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে বিবাহিত হ'য়ে পত্নীর সেবা ও প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রশস্তি গাইলেন—'She was a phantom of delight', এই উদারহৃদয়া পত্নীর অনুমতি নিয়েই বহুদিন পর কবি আজ চ্যানেল অতিক্রম করে আবার তাঁর প্রথমা প্রিয়া ও আজ একটু বড় হয়ে ওঠা মেয়েটির সম্মুখে দাঁড়ালেন ফরাসীদেশে। বালিকা জননীর হাত ধরে ধরে আছে। তিনি তাঁর দুটি চোখে তাঁর সমগ্র সত্তা টেনে এনে সেই স্বর্গীয় ছবি দেখলেন। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে আসছে। সেই স্থির গম্ভীর সন্ধ্যায় ভাবের আলোকে তাঁর কন্যা ও তাঁর জননীর মুখ দুটি বার বার দেখলেন—Beauteous evening—Calm and free, মনে মনে বলেছিলেন—Dear Child! dear girl! that walkest with me here; If thou appear untouched by solemn thought, thy nature is not therefore less divine: Thou liest in Abraham's bosom all the year.

আমি সেদিন পিতৃব্যের পাশে উপবিষ্টার মধ্যে হঠাৎ একটা আলোক দেখে ফেললাম। সে আলো আমাকে মনে মনে বলল—Thou bearest Sarah's bosom all the year. Sarah ছিলেন Abraham-এর পত্নী।

যে বালক পিতৃব্যের পিতৃহৃদয় এতদিন দেখে এসেছে সে এই সেবাপরায়নার মধ্যে মাতৃহৃদয় কেন দেখবে না? আমার মনের দোলা ততক্ষণে থেমে গেছে, কারণ আমি একটি মহাসত্য দর্শন করে ফেলেছি।

হাঁ, কাকার ঘরে প্রবেশ করলাম। প্রথম প্রশ্নই তিনি করলেন—আয়, বোস। তোর খাওয়া হ'য়েছে? আমার অনুরোধ,—শুনেই এতো সহজে এ প্রশ্নের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করবেন না। আমি অশীতিপর বৃদ্ধ হতে চলেছি। এমন প্রশ্ন গর্ভধারিনী জননী আর সহধর্মিনীর মুখে ছাড়া কারো মুখে শুনতে পাইনি। ঠিক সেই মুহূর্তে পার্শ্ববর্তিনী সেবিকা একখানা তোয়ালে দিয়ে কাকার মুখ মুছিয়ে দিলেন। কাকার গৌরকান্তি মুখখানা সেই স্পর্শে হঠাৎ তাম্রাভ হয়ে গেল। তাৎপর্য বোঝার বয়স আমার হয়েছিল। আমি যে কাকার পুত্রাধিক পুত্র।

আমিই প্রথম কাকার সেবিকার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। "আপনার কথা কত গল্প শুনেছি। আপনি আমার দাদাদের মানুষ করেছেন।" আনন্দে হেসে দ্বিগুণ সুন্দর হ'য়ে তিনি বললেন, "তোমার মুহের ছাঁদ টুয়ের মত আসে, আসেও না।"—অবিকৃত খুলনার চলিতকথা, মানে তোমার মুখের আদল টুকুর মত। আমার মেজ সহোদর দেবীদাস ছেলেবেলায় টুকটুকে ফর্সা ছিল বলে ডাক নাম হয়েছিল টুকু। তাঁর কথার লহরী চললো—একদিন টুয়ে হারিয়ে গেলে, খুঁজে পাইনে, চারদিকে লোক খুঁজতে পাঠালাম। দুপের গড়িয়ে গেল, নাতি পারিনে, খাতি পারিনে। তারপর ছেলেরে কাঁধে করে পেল্লাদে হাঁসতি হাঁসতি আল। আমি রাগে টুয়ের পিঠে মারলাম দশাসই এক চড়। আমার পাঁচ আঙ্গুল কচি পিঠে ফুটে উঠেছিল।···আমি তাঁর সোহাগ ভরা শাসন আস্বাদন ক'রে চলেছিলাম। চোরা চাহনিতে দেখি আমার কাকার মুখে হাসি ফুটেছে। আবার তাঁর মুখ সুবর্ণ কান্তি ধারণ করেছে।

কাকা আমার মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদ করলেন। বললেন—তুই আমার সকল সাধ পূর্ণ করেছিস। বৃত্তি পেয়ে মেডেল পেয়ে পাশ করেছিস। তোর কলকাতায় পড়ার খরচ খুলনা থেকে যাবে। আমি যদি মরেও যাই—টাকা বন্ধ হবে না। এটা ১৯৩২ জুলাই মাসের কথা। ওঁর জ্বর যাচ্ছিল না। ডাক্তার দাদা ১৯০৩ সালের প্রথমেই মেডিকেল কলেজে ডক্টর U. N. Roy Choudhuri Ward এ কাকাকে ভর্তি করালেন। দুঃসাধ্য Cellulitis. তিনমাসের বেশি মেডিকেল কলেজের ক্যাবিনে সর্বপ্রকার

সেবা শুশ্রূষায় রেখে আমরা কিছুই করতে পারি নি। কাকা অন্ন কারও হাতে খান নি। তাঁর অভিলষিত ব্যঞ্জন আমার তত্ত্বাবধান রান্না করিয়ে প্রত্যহ আমি নিজ হাতে খাইয়েছি। ১৯৩৩ সালের শুক্লা তৃতীয়ার—দোল-পূর্ণিমার পর তিন দিনের দিন, আমাকে শূন্য করে কাকা চলে গেলেন। আমি পিতৃহীন হয়েছিলাম ১০ বৎসর বয়সে আর ২১ বছর বয়সে পিতৃব্যহীন হ'লাম। কাকার ছেলেদের সঙ্গে এই ভাগ্যহীন ছেলেও ১১ দিন মহাবিষ্ণু পালন করেছে। আমাদের শাস্ত্র পঞ্চপিতার উল্লেখ করেছে—(১) অন্নদাতা (২) ভয়ত্রাতা, (৩) যস্তকন্যা বিবাহিতা, (৪) জনিতা, (৫) চোপনেতা চ—পঞ্চেতে পিতরং স্মৃতাঃ। কাকা আমার অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পিতা।

পিতৃসম পিতৃব্য পরিচয়ে একটু দীর্ঘ সময় নিয়েছি। টুকরো টুকরো ঘটনায় নানা মনস্তত্ত্বের উঁকিঝুঁকি আছে। সে বিশ্লেষণ পণ্ডিত পাঠকরা করবেন। আমি ঘটনার সংযোজক বা ঘটকের বেশি সম্মান দাবী করিনে। তথাপি একটা স্পর্ধিত উক্তি করতে চাই। মানুষ তো জ্ঞানাধার মস্তিষ্ককোষ ও হৃৎস্পন্দনের রক্তস্রোতে স্পন্দিত নাড়ীচক্রের যন্ত্রমানব ভিন্ন কিছু নয়। স্পন্দনের বেগে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় "বিচিত্র" জন্ম নেয়। ওই সব ক্রিয়া বিক্রিয়ায় এক দুর্দম ভাবাবেগে কিছু উদ্‌গিরণ করলাম। এ উদ্‌গিরণে লোহা, তামা, সীসা—যা কিছুই উঠেছে তা' আমি মনে করি ভস্মস্তূপ নয়। আর আমি নিজেও অশুচি হাতে কিছু পরিবেশন করিনি। আপনারা স্বস্তি বলে আমার পরিবেশিত বস্তু গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। (ক্রমশঃ)

লা-রোশফুকোর প্রবচনমালা

তীর্থরেণু দাস

ফরাসী সাহিত্যে বেশ কিছু অদ্ভুত গোত্রের বই মেলে, যার ঠিক অনুরূপ অন্য কোনো সাহিত্যে মেলে না : যেমন, 'জুর্নাল', 'পাঁসে', 'ম্যাক্সিম' ইত্যাদি। আমিয়েল-এর 'জুর্নাল' বা স্বগত লিখনমালা—যাকে ডায়েরি বললে সবটা বলা হয় না—ফরাসী তথা বিশ্বসাহিত্যের একটি বিশ্রুত 'ক্ল্যাসিক, যার উৎকর্ষের কালজয়িতা সর্বস্বীকৃত। তেমনি পাস্কাল-এর 'পাঁসে' (Pensees) বা স্বগতচিন্তনরাজি আরেকটি মহৎ বিশ্ব-ক্ল্যাসিক। তেমনি লা-রোশফুকোর Maxims বা প্রবচনমালাও বিশ্বসাহিত্যের একটি সমাদৃত ক্ল্যাসিক। এই ম্যাক্সিমগুলি বা প্রবচনমালা স্বগত-চিন্তন হলেও, ঠিক 'পাঁসে' জাতীয় নয়, এগুলি লেখকের বহু চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঘনীভূত নির্যাস এবং তার উচ্চারণও বিশেষ সযত্ন পরিশীলিত। 'পাঁসে' সেদিক দিয়ে, মোটের উপর অযত্নসিদ্ধ চিন্তাপ্রবাহ, তার বিন্যাসে ও পরিচর্যায় সচেতন শিল্পিতার প্রয়াস নেই। কিন্তু এই সব ম্যাক্সিম অতিশয় সযত্নরচিত,—শব্দচয়নে ও বয়নে এবং উচ্চারণের তীক্ষ্ণতায় বহু আয়াসসাধ্য শিল্পিতা এখানে লক্ষণীয়। সমাজ ও জীবন সম্পর্কে লেখক তাঁর বিবিধ ভূয়োদর্শনকে অল্পকথায় গেঁথে এই বাণীগুচ্ছের মধ্যে স্মরণীয় বাঙ্ময়তা দান করতে প্রয়াস করেন, যা গদ্যে নিবদ্ধ হলেও বাকসংহতির কারণে কেলাসিত ঔজ্জ্বল্যে ঝকমক করবে। মনন, প্রাবীণ্য ও শিল্পিত প্রকাশ—এই তিনের সাযুজ্য এদের চিহ্নিত করে।

নবীন প্রবীণ সব সাহিত্যেই, চারিত্রনৈতিক উপদেশমালার সূত্রগুচ্ছে বা শ্লোকগুচ্ছে নিবদ্ধ রূপ অসুলভ নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে চাণক্যশ্লোক বা নীতি-মঞ্জরী এর বিশিষ্ট নিদর্শন। গ্রীক ষ্টোইক দার্শনিক সেনেকার ম্যাক্সিম এবং এপিকটেটাসের উপদেশমালাও গদ্যে নিবদ্ধ চারিত্রনীতিমূলক প্রবচন।

কিন্তু লা-রোশফুকোর এই ম্যাক্সিম বা প্রবচনমালা মোটেই উপদেশমূলক নয়, মানুষের চারিত্রনীতিও তার মুখ্য বিষয় নয়। এগুলিতে যা আছে তা হোল, মানুষের হৃদয় মন স্বভাব ও আচরণের অন্তর্নিহিত সত্যস্বরূপটির উদ্ঘোটন। মানুষের যেসব মনোভাব ও আচরণের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত—তার আপাতরম্য রূপের আড়ালে যে অনতিরম্য বাস্তব সত্যটি বিদ্যমান, তাকে উন্মোচিত করাই এ প্রবচনমালার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। যেন কোনো

মানসিক শল্যচিকিৎসক তার নিপুণ ব্যবচ্ছেদী ছুরিকা চালিয়ে মানবমনের সব দূষিত কোষতন্তুগুলিকে অনাবৃত করে দেখাচ্ছেন এখানে—জিজ্ঞাসুদের কাছে।

লা-রোশফুকো দেখেছেন এবং তাই তিনি দেখাতেও সচেষ্ট যে, মানুষের আত্মপ্রেম—যাকে তিনি বলেছেন amour propre—তার সব হৃদয়বৃত্তি ও আচার-আচরণের মধ্যে সংগুপ্ত থেকে তাদের সর্বদাই প্রভাবিত করছে এবং নিজেকে চরিতার্থ করবার জন্য নানাবিধ ভেক ধারণ করেও চলেছে। যা আপাতদৃষ্টিতে মহৎ বা উচ্চ আদর্শ প্রণোদিত বলে মনে হয় এবং আমরা নিজেরাও মনে করি, ঐরূপ মহৎ ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বুঝি কোনো ত্যাগ স্বীকার করছি, তারও পেছনে আমাদের অন্তর্গূঢ় আত্মপ্রীতি ও স্বার্থবুদ্ধিই অলক্ষিতে কাজ করে চলেছে—আমাদের অজ্ঞাতেই।

মানুষের স্বভাবের এমন নির্মম নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ এবং তার সব আত্মতুষ্টি নস্যাৎ করে' তার প্রকৃতির অসুন্দর স্বরূপটি তার নিজের কাছে তুলে ধরবার এমন অধ্যবসায়ী প্রয়াস এর আগে আর দেখা যায় নি। ফলে, লা-রোশফুকোর এই প্রবচনরাজি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আজও তার সেই খ্যাতি অম্লান।

অবশ্য মানবচরিত্রের নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ ও বিকলন ব'লেই কোনো রচনা কালজয়ী সাহিত্য হয়ে ওঠে না। এ প্রবচন মালার প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি বাক্য অতিশয় শিল্পসংস্কৃত। ভাস্কর বা তক্ষণশিল্পী যেমন তার তক্ষণী দিয়ে অসীম ধৈর্যে পাথর থেকে শিল্পিত মূর্তি কুঁদে বের করে, ঠিক তেমনি লা-রোশফুকোর এই প্রবচনগুলির বাণীরূপ বহু আয়াস ও নিরলস শিল্পপরিচর্যার ফসল। তাদের সুমিত সংহত সুতীক্ষ্ণ-উচ্চারণের পেছনে লেখকের অনেক শ্রম ও অতিসতর্ক শিল্পবিবেকের নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপৃতি যে কাজ করেছে তাতে ভুল নেই। মানবসত্যও স্মরণীয় উচ্চারণের মধ্যেই সর্বজনগ্রাহ্যতা লাভ করে, অন্যথা নয়। শ্রোতব্য হলেই তবে তা প্রবচন হবে, অমোঘতা লাভ করবে। লা-রোশফুকো তাই তাঁর এই সব ভূয়োদর্শনকে স্মরণীয় বাক্‌সংহতি দান করেছেন।

তাঁর এই উক্তিরাজিকে নীতি-প্রবচন আখ্যা দিতে লা-রোশফুকোর অনীহা ছিল—যেহেতু এদের গোত্র কিছুটা ভিন্ন জাতীয়। অথচ মানবচরিত্র সম্বন্ধী এই উক্তিমালাকে অন্য কোন্ নামেই বা অভিহিত করা যায়? অনেক ভেবে লা-রোশফুকো এদের ভিন্ন গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যের আভাস দিলেন বইটির নামটাকে

একটু বিস্তৃত করে। নাম দিলেন: *Reflexions ou Sentences et Maximes Morales*—যা ইংরাজী করলে দাঁড়ায়, 'Reflections or Aphorisms and Moral Maxims'. বাংলায় বলা চলে: বিচিন্তা, স্থক্তি (সু-উক্তি) ও নীতি প্রবচন। খুব সরল ও সংহত নাম নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এ-রচনার গোত্রবৈশিষ্ট্য অন্য ভাবে স্পষ্ট করাও যায় না। পরবর্তীকালে কিন্তু লোকের মন থেকে ঐ লম্বা নামের অনেকখানিই ঝরে' গেছে, শুধু Maxims নামেই এরা পরিচিত। লা-রোশফুকোর Maxims বা প্রবচন।

এখন এই স্থক্তিমালার কিছু নমুনা দেওয়া যাক্। বাংলায় তাদের 'এপিগ্রাম'-সুলভ তীক্ষ্ণতা ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ইংরাজী অনুবাদেও যে অধিকাংশত হয়নি, তা প্রায় সব অনুবাদকই কবুল করেছেন। ইংরেজী থেকে করা এই বাংলা অনুবাদ মূল থেকে আরেকটু যে দূরবর্তী হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।—

১। আমাদের নৈতিক সদ্‌গুণাবলি প্রায়শঃই ছদ্মবেশী চারিত্রদোষ মাত্র। (ইং—Our virtues are usually only vices in disguise.)
[দ্রঃ এই প্রবচনটি অন্য সকলের শিরোভাগে অভিজ্ঞানরূপে মুদ্রিত।]

২। আত্মপ্রীতিই শ্রেষ্ঠ চাটুকার। [প্রবচনমালায় ২ সংখ্যক প্রবচন]

৩। আমাদের রুচির সমালোচনাতেই আমাদের অভিমান বেশী আহত হয়—আমাদের মতামতের সমালোচনার চেয়ে। [প্রবচন সংখ্যা ১৩]

৪। অপরের দুর্দশা সইবার ক্ষমতা আমাদের সকলেরই প্রচুর পরিমাণে আছে। [প্রবচন—১৯]

৫। আমাদের নিজেদের দোষত্রুটি যদি না থাকতো অপরের দোষত্রুটি দেখে এত আনন্দ পেতাম না। [প্রঃ ৩১]

৬। আমরা প্রতিশ্রুতি দিই আমাদের প্রত্যাশার অনুপাতে এবং তা রাখি আমাদের আশঙ্কার অনুপাতে। [প্রঃ ৩৮]

৭। আমাদের স্বার্থবুদ্ধি অনেক সুরে কথা বলে, অভিনয়ও করে—এমনকি নিঃস্বার্থপরতারও। [প্রঃ ৩৯]

৮। আগাগোড়া বিচারবুদ্ধি অনুসরণ করে চলব, সে-শক্তি নেই আমাদের। [প্রঃ ৪২]

৯। ভাগ্য আমাদের যা দেয় আমরা আমাদের প্রকৃতি অনুসারে তার মূল্য স্থির করি। [প্রঃ ৪৭]

১০। সত্যিকার সুখ নির্ভর করে রুচির উপর, উপকরণ সামগ্রীতে নয়। যা আমরা স্বয়ং উপভোগ করি তা পাওয়াতেই সুখ, অপরে যা উপভোগ্য মনে করে তাতে নয়। [প্রঃ ৪৮]

১১। মানুষের সুখ বা দুঃখ যতোটা ভাগ্যের দানের উপর নির্ভর করে, তার বেশী করে তাদের প্রকৃতি ও মেজাজের উপর। [প্রঃ ৬১]

১২। নিরাবরণ হৃদয়ই প্রকৃত আন্তরিকতা। খুব অল্প লোকের মধ্যেই এর দেখা মিলবে ; যা সচরাচর দেখা যায় তা হোল, অন্যের বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যে অকপটতার ভান। [প্রঃ ৬২]

১৩। দেহের ক্ষেত্রে যা সহজ লাবণ্য মনের ক্ষেত্রে তাই সহজবুদ্ধি। [প্রঃ ৬৭]

১৪। সমাজজীবন বেশীদিন টিকতো না, যদি না পরস্পরের ছলনা আমরা মেনে না নিতাম। [প্রঃ ৮৭]

১৫। নরনারীপ্রেমের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন ; তবে বলা চলে যে, সত্তার গভীরে অন্য একজন মানুষের উপর নিজের আধিপত্য স্থাপনের এ এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা, মনের স্তরে এটা পারস্পরিক সহমত্য, এবং দেহের ক্ষেত্রে এটা প্রণয়ীকে বহু আচার উপচার ও রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ সহকারে সম্পূর্ণতঃ অধিকার করবার ঈষৎ উচ্চারিত বাসনা। [প্রঃ ৬৮]

১৬। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ প্রেম যদি থাকেই, তবে তা হৃদয়ের এত গভীর অন্তর্লোকে সংগুপ্ত থাকে তার হদিশ আমরা নিজেরাও জানি না। [প্রঃ ৬৯]

১৭। ভালবাসাকে কোনো আবরণেই আড়াল করা সম্ভব নয়—আর যেখানে তা নেই কেউ তার সফল অভিনয় করতে পারে না। [প্রঃ ৭০]

১৮। বাইরের লক্ষণ দিয়ে বিচার করলে প্রেমকে বন্ধুত্বের চেয়ে ঘৃণারই কাছাকাছি বলে ঠেকে। [প্রঃ ৭২]

১৯। প্রেম ঠিক আগুনের মতো, ক্রমাগত ইন্ধন না যোগালে বাঁচে না—এবং আশা ও ভয় ফুরিয়ে গেলেই নির্বাণ লাভ করে। [প্রঃ ৭৫]

২০। আমাদের আত্মপ্রীতিই আমাদের বন্ধুবান্ধবদের গুণাবলি কখনো বাড়িয়ে কখনো কমিয়ে দেখে আমাদের ভালো লাগার মাপকাঠিতে। আমরা তাদের মূল্য যাচাই করি, তারা আমাদের সঙ্গে কতটা মানিয়ে চললো, তাই দিয়ে। [প্রঃ ৮৮]

২১। প্রত্যেকেই আপন হৃদয়ের প্রশংসায় মুখর, কিন্তু কেউ তার নিজের মনের প্রশংসা করতে সাহসী হয় না। [প্রঃ ৯৮]

২২। মনের সৌজন্য হোল সদয় ও সুকুমার ভাবনা পোষণ। [প্রঃ ৯৯]

২৩। যারা নিজের মনকে বোঝে তারাও অনেকে নিজের হৃদয়কে বোঝে না। [প্রঃ ১০৩]

২৪। মস্তিষ্ক সর্বদাই হৃদয়ের কাছে নাকাল হয়। [প্রঃ ১০২]

২৫। অন্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ হওয়া যতো সহজ নিজের ক্ষেত্রে ততোটা নয়। [প্রঃ ১৩৪]

২৬। উপদেশ দিতে যতো আমরা মুক্তহস্ত তেমন আর কিছুতেই নয়। [প্রঃ ১১০]

২৭। আমরা যদি নিজের গুণ এতো বড় করে না দেখতাম, সংসারে অতি অল্প সুখই অবশিষ্ট থাকতো। [প্রঃ ১২৩]

২৮। মস্তিষ্ক বেশীক্ষণ হৃদয়ের অভিনয় করতে পারে না। [প্রঃ ১০৮]

২৯। মানুষের মনের দোষগুলি বয়সের সাথে সাথে বেড়ে চলে, আমাদের মুখাবয়বের ত্রুটির মতোই। [প্রঃ ১১২]

৩০। দুর্বলতাই একমাত্র দোষ যা আমরা কিছুতেই সংশোধন করতে পারি না। [প্রঃ ১৩০]

৩১। মানুষ যেভাবে উপদেশ চায় ও দেয় তার চেয়ে কাপট্য আর হয় না। যে চায়, সে দেখায় যে, বন্ধুর সদিচ্ছার প্রতি তার খুব শ্রদ্ধা, যদিও তার একমাত্র উদ্দেশ্য হোল নিজের ইচ্ছাটাই তাঁকে দিয়ে অনুমোদন করানো এবং নিজের কাজের দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো। এবং যিনি উপদেশ দেন, তিনিও তাঁর প্রতি ন্যস্ত আস্থার প্রতিদান দিয়ে চলেন অশ্রান্ত উদ্যমের সঙ্গে—যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত উপদেশ তাঁর আপন স্বার্থ আর সুনামের পরিপোষক হবে, সেটাই উদ্দেশ্য। [প্রঃ ১১৬]

৩২। সব চেয়ে সূক্ষ্ম. ধূর্ততা হোল, আমাদের জন্য পাতা ফাঁদে না বুঝে পা দিচ্ছি এইটে সার্থকভাবে ভান করা ; লোকে তখনই বেশী করে ফাঁদে পড়ে যখন অন্যকে ফাঁদে ফেলতে ব্যস্ত। [প্রঃ ১১৭]

৩৩। আমরা অন্যকে ছলনা করতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে অবশেষে নিজের কাছেই নিজে ছলনা করে চলি। [প্রঃ ১১৯]

৩৪। আমরা নিজেদের বাড়িয়ে দেখতে ভালবাসি বলেই বাঁচার সুখ পাই। [প্রঃ ১২৩]

৩৫। অন্যের চেয়ে নিজেকে বেশী ধূর্ত মনে করাই হোল অন্যের দ্বারা প্রতারিত হবার নিশ্চিত উপায়। [প্রঃ ১২৭]

৩৬। আমরা নিজেদের নিন্দা করতেও গররাজী নই, নিজের সম্বন্ধে কিছু না-বলার চেয়ে তাও সুখকর। [প্রঃ ১৩৮]

৩৭। কাউকে যখন আমরা বেশী প্রশংসা করি তার মধ্যেও তার যোগ্যতার চেয়ে নিজের মতামতের গৌরবই বেশী উচ্চারিত হয়;—অন্যকে প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে নিজের প্রতি অন্যের প্রশংসা কাড়ার ইচ্ছেটাই কাজ করে। [প্রঃ ১৪৩]

৩৮। প্রায়শঃই প্রশংসিত হবার জন্যই আমরা অন্যের প্রশংসা করে থাকি। [প্রঃ ১৪৬]

৩৯। প্রশংসা অস্বীকারের মধ্যে দ্বিগুণ প্রশংসা লাভের বাসনা কাজ করে থাকে। [প্রঃ ১৪৯]

৪০। আমাদের সত্যকার যোগ্যতা প্রাজ্ঞদের প্রশংসা অর্জন করে, সাধারণ্যের প্রশংসা অর্জন করায় ভাগ্য। [প্রঃ ১৬৫]

৪১। আমাদের সব সদ্‌গুণই স্বার্থসাধনে অবসিত হয়, যেমন সব নদীই অবসিত হয় সমুদ্রে। [প্রঃ ১৭১]

৪২। আমাদের চারিত্রগুণাবলীর মধ্যে চারিত্রদোষেরও স্থান আছে—ঔষধের মধ্যে যেমন বিষের স্থান। আমাদের শুভবুদ্ধি উভয়েরই মিশ্রণ ও সাম্য ঘটায় এবং দুর্দৈব এলে যথাপ্রয়োজন তাদের ব্যবহার করে। [প্রঃ ১৮২]

৪৩। আমাদের দোষগুলি যখন আমাদের ছেড়ে চলে যায়, আমরাই তাদের জয় করেছি বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। [প্রঃ ১৯২]

৪৪। শুধু সদ্‌গুণের হাত ধরে বেশীদূর এগোনো যায় না—অহঙ্কার যদি না সঙ্গে থাকে। [প্রঃ ২০০]

৪৫। যথার্থ ভদ্রব্যক্তি কোন কিছুতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেন না। [প্রঃ ২০৩]

৪৬। শ্রেষ্ঠ বীরত্ব তা-ই, যা বিশ্ববাসীর চোখের সামনেও যেমন, সাক্ষীবিহীন অবস্থাতেও ঠিক তেমনি আচরণ করে। [প্রঃ ২১৬]

৪৭। ভণ্ডামি হোল সেই রাজকর যা চারিত্রদোষ প্রদান করে চারিত্রগুণকে। [প্রঃ ২১৮]

৪৮। কৃতজ্ঞতা হোল ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশ্বাস বজায় রাখার মতো : এর দ্বারা ব্যবসা ভালো চলে—ঋণ শোধ করাটা কর্তব্য বলে নয়, এর দ্বারা অপরের কাছে আরো ঋণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সুগম হয়। [প্রঃ ২২৩]

৪৯। আমাদের দুঃখকষ্টের যে অজুহাতই খুঁজি না কেন, তাদের উৎস অধিকাংশতই আমাদের স্বার্থবুদ্ধি আর অহঙ্কারের মধ্যে নিহিত। [প্রঃ ২৩২]

৫০। আমাদের বন্ধুস্বজন দুর্ভাগ্যে পড়লে সান্ত্বনা লাভে আমাদের দেরী হয় না—এ সময়ে তাদের প্রতি আমাদের প্রীতি প্রদর্শনের সুযোগ হয়। [প্রঃ ২৩৫]

৫১। কেউ তার ভালোত্বের জন্য তবেই প্রশংসনীয় গণ্য হতে পারে যদি তার চরিত্রে মন্দ হবারও সমান শক্তি থাকে। অন্য সব ভালোত্বই প্রায়শ জাড্য ও ইচ্ছাশক্তির অভাব থেকে প্রসূত। [প্রঃ ২৩৭]

৫২। কোনো কিছুর যথার্থ মূল্য-জ্ঞানই প্রকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা। [প্রঃ ২৪৪]

৫৩। স্বার্থবুদ্ধি আমাদের স্বভাবের সমস্ত দোষগুণের মধ্যেই গতিসঞ্চার করে। [প্রঃ ২৫৩]

৫৪। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ এক এক প্রকার ব্যক্তিত্ব ও আচরণের ভেক নিয়ে চলে, যার নিহিত উদ্দেশ্য, লোকে তাকে ঐরূপই ভাবুক। সমাজজীবন এইরূপ নানা ব্যক্তিত্বের মুখোশেরই মেলা বলাটা খুব ভুল হবে না। [প্রঃ ২৫৬]

৫৫। খুব অল্পলোকই সেরূপ তীক্ষ্ণদর্শিতার অধিকারী যে নিজের কাজের সব কুফল অনুধাবন করতে সক্ষম। [প্রঃ ২৬৯]

৫৬। যাদের শ্রদ্ধা করি না তাদের ভালবাসা কঠিন ; তবে যাদেরকে আমাদের নিজেদের চেয়ে খুব বেশী শ্রদ্ধা করি তাদেরকেও ভালবাসা কম কঠিন নয়। [প্রঃ ২৯৬]

৫৭। যাদের সঙ্গ ক্লান্তিকর ঠেকে তাদের আমরা অনেক সময় ক্ষমা করি, কিন্তু যারা আমাদের ক্লান্তিকর মনে করে তাদের কখনো ক্ষমা করি না। [প্রঃ ৩০৪]

৫৮। দুর্বলরা কখনো আন্তরিক হতে পারে না। [প্রঃ ৩১৬]

৫৯। আমরা অন্যের কাছে আমাদের ছোট ছোট দোষত্রুটি উদারভাবে

স্বীকার করি, আমাদের বড় কোনো দোষ নেই এই বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। [প্রঃ ৩২৭]

৬০। আমরা কখনো কখনো ভাবি যে আমরা চাটুকারিতা পছন্দ করি না, কিন্তু সেটা প্রায়শঃই চাটুবাদের রকমটা—বস্তুটা নয়। [প্রঃ ৩২৯]

৬১। প্রেম এলে ছলাকলা বর্জিত হয়ে যায়—এটাই প্রেমের অলৌকিক মাহাত্ম্য। [প্রঃ ৩৪৯]

৬২। এটা সবাই স্বীকার করে যে, নিজের স্ত্রীর বিষয়ে যতো কম আলোচনা করা যায়, ততোই শোভন: কিন্তু প্রায় লোকেই বোঝে না যে, নিজেকে নিয়ে আরও কম আলোচনা করা উচিত। [প্রঃ ৩৬৪]

৬৩। অতি সাধারণ মাপের মন যাদের, তারা নিজেদের সাধ্যের বাইরে সব কিছুরই নিন্দা করে' থাকে। [প্রঃ ৩৭৫]

৬৪। আমাদের চারিত্রের অবনতির সঙ্গে আমাদের রুচিরও অবনতি ঘটে। [প্রঃ ৩৭৯]

৬৫। যে ব্যক্তি মনে করে, সে একটি মেয়েকে শুধু তারই জন্য ভালবাসে, সে খুবই ভ্রান্ত। [প্রঃ ৩৭৪]

৬৬। আমরা যে এখনো অবাক হই, এটাই একমাত্র অবাক হবার কথা। [প্রঃ ৩৮৪]

৬৭। বোকাদের স্বভাবে ভালো হবার মতো যথেষ্ট উপাদান থাকে না। [প্রঃ ৬৮৭]

৬৮। আমাদের অহঙ্কারকে আঘাত করে বলেই অপরের অহমিকা আমাদের অসহ্য ঠেকে। [প্রঃ ৩৮৯]

৬৯। যোগ্যতার সঙ্গে মর্যাদাবোধ না থাকতেও পারে, কিন্তু মর্যাদাবোধ আছে অথচ কোনো যোগ্যতা নেই, এটা অসম্ভব। [প্রঃ ৪০০]

৭০। আমাদের সব মহৎ কৃতির জন্য আমরা লজ্জিতই হতাম, যদি বিশ্বজগৎ তাদের পিছনের উদ্দেশ্যগুলি জানতে পারত। [প্রঃ ৪০৯]

৭১। বৃদ্ধ হবার কৌশল অনেকেই জানে না। [প্রঃ ৪২৩]

৭২। সুরুচি আসে বিচার থেকে, বুদ্ধি থেকে নয়। [প্রঃ ২৫৮]

৭৩। দৃষ্টান্তের মতো সংক্রামক আর কিছুই নেই, এবং আমাদের প্রতিটি ভালো ও মন্দ কাজ অনুরূপ কাজের প্রেরণাদায়ক হয়। আমরা ভালো কাজের অনুকরণ করি সমকক্ষতা অর্জনের জন্য আর মন্দকাজের

করি, আমাদের স্বভাবনিহিত দুষ্ট প্রবণতার জন্য, যা এতদিন দৃষ্টান্ত অভাবে লজ্জাশাসিত ছিল, এখন বাধামুক্ত হোল। [প্রঃ ২৩০]

৭৪। যিনি বহু সদ্‌গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর চরিত্রের একটি সুনিশ্চিত লক্ষণ হোল, ঈর্ষারাহিত্য। [প্রঃ ৪৩০]

৭৫। যাঁরা একদা প্রবল সংরাগে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, পরবর্তী জীবনে সেই প্রক্ষোভ উত্তরণের স্মৃতি তাঁদের যুগপৎ আনন্দিত ও ব্যথিত করে। [প্রঃ ৪৮৫]

৭৬। সাধারণতঃ আমাদের আক্রোশের পিছনে বিদ্বেষ অপেক্ষা অহমিকাই বেশী কাজ করে। [প্রঃ ৪৮৩]

৭৭। দেহ অপেক্ষা আমাদের মনের অলসতাই বেশী। [প্রঃ ৪৮৭]

৭৮। প্রেম অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে কেউ প্রেমে প্রত্যাবর্তন করে না। [প্রঃ ৪৮৯]

৭৯। অনেকেই ধার্মিক হতে চায় কিন্তু বিনয়ী হতে খুব কম লোকই রাজী। [প্রঃ ৫৩৪]

৮০। বিলাসব্যসন এবং অত্যধিক সুসজ্জিতি রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের সুনিশ্চিত পূর্বলক্ষণ : কারণ যেখানে সকলেই আপন আপন স্বার্থসুখ-অন্বেষী হয়, সেখানে রাষ্ট্রের কল্যাণ অবহেলিত হতে বাধ্য। [প্রঃ ৬২৯]

লা-রোশফুকোর ৬৪১টি প্রবচনের মাত্র ৮০টি নমুনা দিলাম। মোটামুটি ধারণা হয়তো করা যাবে এ থেকে। সবগুলি প্রবচনই দেবার মতো কিন্তু দিতে গেলে প্রবন্ধকে গ্রন্থের কলেবর দিতে হয়। সবগুলি প্রবচন আবার তীক্ষ্ণ এপিগ্রামের মতো তনুদেহী নয়, কিছু আছে বৃহৎ অনুচ্ছেদ জাতীয়, যার মধ্যে লেখক কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক সত্যের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। স্থানাভাবের কারণে এ জাতীয় বিস্তারিত মন্তব্যগুলি দেওয়া গেল না।

লা-রোশফুকোর জীবদ্দশায় এই প্রবচনরাজির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১৬৬৫-তে মাত্র ৩১৭টি প্রবচন নিয়ে প্রকাশিত হয়। পরের বছরেই আরেকটি সংস্করণ প্রয়োজন হয় কিন্তু এবার প্রবচন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০২টি, লেখক ১৫টি প্রবচন ছেঁটে দেন। লেখকের দুস্তোষণীয় রুচি ও শিল্পবোধই এই বর্জনের কারণ। তৃতীয় সংস্করণ বের হয় ১৬৭১-এ এবং তাতে থাকে ৩৪১টি প্রবচন। এবার বেশ কিছু নতুন প্রবচন সংযোজিত হয়—

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের মধ্যে পাঁচ বছরের কাল-ব্যবধান লেখককে এই অবসর দেয়। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৭৫-এ, এবং এবার থাকে ৪১৩টি প্রবচন। প্রবচনগুলির ক্রমবর্ধিত বিদগ্ধজন-প্রিয়তা লেখকের দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে চলে। পঞ্চম, ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণে (১৬৭৮), থাকে ৫০৪টি প্রবচন। কিন্তু এই শেষ নয়। পরবর্তী সম্পাদকেরা লা-রোশফুকোর কাগজপত্রের মধ্যে আরও ৫৮টি অপ্রকাশিত প্রবচন খুঁজে পান, এবং সংযোজন হিসাবে এগুলিও প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু এছাড়াও আরও ৩৮টি প্রবচনও ছিল, যা লা-রোশফুকো তাঁর প্রথম চারটি সংস্করণ থেকে ছাঁটাই করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেগুলিও পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। এইভাবে তাঁর ৬৪১টি প্রবচনই এখন জনসমাজে প্রচারিত।

এই প্রবচন রাজিতে নতুন তত্ত্ব বা সত্য কিছু আছে কি? সব মানুষই যে অত্যন্ত স্বার্থপর এবং অহঙ্কারই যে তাদের প্রধান রিপু, একথা আবহমান কাল থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে আসছেন। এতে নতুনত্ব কোথায়? নতুনত্ব হোল দুটি বিষয়ে: এক, মানুষের সব আচরণ ভাবনা চিন্তা মনোবৃত্তি এবং ভালো মন্দ সব কাজের মধ্যে, তার এই অহমিকা বা আত্মপ্রীতি স্বীয় স্বার্থসাধন ও তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে কতো বিচিত্র সূক্ষ্ম ছদ্মবেশে অনুস্যূত হয়ে থাকে; এই অহং-প্রীতি ও স্বার্থবুদ্ধি মানুষের বিবেককে কতভাবে ছলনা করে, কতো দুঃখের মধ্যেও তাকে সান্ত্বনা দেয়,—সভ্য সামাজিক মানুষের চিত্ত ও চারিত্রের এই বহু ব্যাপক চালচিত্রটি এভাবে আর কেউ ধরে দেখায় নি। এবং দ্বিতীয়ত, এমন উজ্জ্বল ভাবে, এমন সাহিত্যিক গুণোপেত ভাষায় এমন মার্জিত শৈলিতে, অধিকাংশত এপিগ্রামের সুতীক্ষ্ণ উচ্চারণে, এভাবে আর কেউ উন্মোচিত করেনি।

আরেকটি কথাও বিবেচ্য। এই যে একটি নিয়ামক প্রবৃত্তি—যাকে লা-রোশফুকো amour propre বা অহংপ্রীতি বলেছেন—মানবচিত্তের অবচেতন স্তরে যা আমাদের আচার ব্যবহার আচরণকে, এবং সজ্ঞান মনোভাবকেও অলক্ষিতে, অপ্রতিরোধ্যরূপে প্রভাবিত করে চলে—এ সত্যটি কিন্তু ফ্রয়েডের দুশো বছর আগে, সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে, একটু চাঞ্চল্যকররূপেই নূতন ছিল। ফ্রয়েড এবং তাঁর সহযোগী মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কার থেকে আমরা মানুষের অবচেতন মানস ও সজ্ঞান মনের উপর তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। এবং কীভাবে একটি নিগূঢ় প্রবৃত্তি সর্বত্র প্রবিষ্ট

হয়ে মানুষের সব আচার আচরণ ভাবভাবনাকে প্রভাবিত করে, সে সত্যও আমরা ফ্রয়েডীয় 'লিবিডো' তত্ত্বে এবং এ্যাডলার, য়ুং প্রভৃতির অন্যতর তত্ত্বে, এখন জেনেছি। কিন্তু সেই সপ্তদশ শতকে অবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের দ্বারাও অনুরূপ এক সত্যকে প্রত্যক্ষ করা এবং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে আলোকিত করে দেখানো, নিঃসন্দেহে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও ধীশক্তির পরিচায়ক।

এখন লা-রোশফুকোর জীবনবৃত্তটি একটু আলোচনা করা যাক।

লা-রোশফুকোর জন্ম এক অত্যুচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশে। তাঁর সোপাধিক নাম হোল : ফ্রাঁশোয়া ডুক্ দ্য লা-রোশফুকো (Francois duc da la Rochfoucauld), অর্থাৎ তাঁর আদ্য নাম ফ্রাঁশোয়া এবং তিনি লা-রোশফুকো বংশীয় ডিউক। প্যারিসে তাঁর জন্ম, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এবং তিনি মারাও যান প্যারিস শহরেই, ১৭ই মার্চ ১৬৮০ সালে। তাঁর সাড়ে ছেষট্টি বছরের আয়ুষ্কাল সেই সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে ভালো আয়ুই বলতে হবে। তাঁর জীবনের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ কাটে (সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর পিতা) সম্রাট ত্রয়োদশ লুই-এর, এবং তাঁর মৃত্যুর পর শিশুপুত্রের অভিভাবক রূপে তাঁর স্ত্রী রানী এ্যান-এর শাসন (regency) কালে। এই দুই রাজত্বেই দুই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রধান মন্ত্রীর—রিশ্‌লু এবং মাজারিয়ঁ—সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটে এবং সে অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে সুখকর হয় নি। তাঁর স্বভাবে আত্মসচেতনতার সঙ্গে হঠকারিতার, আদর্শবত্তার সঙ্গে প্রণয়-প্রবণতার, উচ্চা-কাঙ্ক্ষার সঙ্গে কূটকৌশলে অনীহার—ইত্যাদি বিপরীত প্রবণতার সমাবেশ ঘটেছিল। ফলে প্রায় সর্বত্রই তাঁর ভাগ্যে মধু অপেক্ষা হুলের ভাগটাই একটু বেশী পড়ে। তবে যুদ্ধ বিগ্রহের বিপজ্জনক মঞ্চে এবং রাজসভার ক্ষমতার দ্যূতক্রীড়ায় আবর্তিত হয়ে এবং বহু প্রণয়ে বারংবার উন্মথিত, সন্তাপিত ও প্রবঞ্চিত হয়ে, সপ্তদশ শতকের ফরাসী ইতিহাসের সেই অস্থির সন্ধিলগ্নে, তাঁর অতিশয় আত্মসচেতন মন দেখেছিল অনেক কিছু, এবং নানা অভিজ্ঞতার বিষাদ্রুত কণ্ঠে ধারণ করেছিল। নানা পরিস্থিতিতে বহু মানুষকে—নিজেকেও সেই সঙ্গে—দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। তীব্র ভোগরাগে মিলিত হবার কালেও, নিজেকে এবং অপরকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা, ও তৎকালে নিজের ও অন্যের মনোভাব বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। মহৎ সাহিত্যকারদের মধ্যে এটা অনেক সময় দেখা যায়। এ প্রাতিভ দৃষ্টির

অধিকারীরা প্রায়শই সুখী হন না, যদিও তাঁদের অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক ফসল ভোগ করি আমরা সাধারণেরা।

লা-রোশফুকো তাঁর জীবনের প্রথম দুই তৃতীয়াংশ এই ভাবে নানা বিরূপ অভিজ্ঞতা ও অনুরাগ বিরাগের তিক্ত ফসল সংগ্রহ ক'রে, তাঁর আয়ুর শেষ তৃতীয়াংশ—ঝইশ-তেইশ বছর কাল—সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে, সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান প্যারিসে শান্তিময় সামাজিক জীবনচর্যায় অতিবাহিত করেন। তখনকার দিনে প্যারিসের সাংস্কৃতিক জগতে সালঁ (Salon) বা আলোচনা বৈঠকের খুব বড় একটা স্থান ছিল। এই সব বৈঠকগুলি কোনো একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলার বৈঠকখানায়, তাঁকেই কেন্দ্রমণি করে সচরাচর বসতো। এবং এসব বৈঠকী আলোচনার উচ্চমানের খ্যাতি বহু বিদগ্ধজন ও প্রতিভাবানদের এইসব আসরে আকৃষ্টও করতো। ঐ সময়ে মাদাম দ্য সাব্‌লে, মাদাম দ্য রাঁবুইয়ে, মাদমোয়াজেল মঁপাঁজিয়ে প্রভৃতির সালঁ বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। লা-রোশফুকো প্রথমে মাদাম দ্য সাব্‌লে ও পরে মাদাম দ্য রাঁবুইয়ের আসরেই নিয়মিত সদস্য হন। পাস্কাল, লা-ফঁতেন, মাদাম দ্য সেঁভিঞে, বস্যুয়ে, কার্ডিনাল দ্য রেৎশ্‌ প্রভৃতিও এই আসরে তাঁর সহসদস্য ছিলেন।

ফরাসী ধ্রুপদী গদ্যের যে ঋজু সরল সংহত নিরলঙ্কৃত রূপটি সপ্তদশ শতকে পরিণতি লাভ করে, তার পিছনে এইসব সালঁগুলির পরিশীলিত সংলাপের আদর্শ অনেকখানি কাজ করে। মাদাম দ্য রাঁবুইয়ের আসরেই লা-রোশফুকো তাঁর এইসব ভূয়োদর্শনমূলক প্রবচনগুলি মাঝে মাঝে পড়ে শোনাতেন—সদস্যদের মতামত ও সমালোচনার জন্য। সন্দেহ নেই যে, ঐসব বিদগ্ধ সদস্যদের পরামর্শ ও সমালোচনী মতামত এই প্রবচনগুলির রূপনির্মিতিতে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল। এবং তাঁদের পরামর্শেই তিনি বারংবার এদের সংস্কৃত ও সুমার্জিত করতে এবং ভাষার স্বচ্ছতা সাধনে এরূপ তৎপর হয়েছিলেন।

অবশ্য লা-রোশফুকো নিজেও ছিলেন, যাকে বলে perfectionist—পরোৎকর্ষ-অন্বেষী। অশেষ আয়াসে প্রবচনগুলির মেদহীন সুঠাম তনুষ্ক-বিধানে তাঁর ক্লান্তি ছিল না,—যাতে তাদের বাণীরূপ যথাযথ, ঋজু ও তীক্ষ্ণধার হয়, ভদ্র কণ্ঠস্বরের অনাবেগ বৈদগ্ধ্যে মণ্ডিত হয়। এবং এজন্যই ৩১৭টি মাত্র প্রবচন নিয়ে এই প্রবচনমালার প্রথম আত্মপ্রকাশেই এদের দৃষ্টির সত্যতা ও উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সমস্ত প্যারিস শহরকে প্রশংসামুখর করে তোলে।

কিন্তু বাণীরূপের বৈদগ্ধ্যের মধ্যেই এদের উৎকর্ষ সীমিত নয়। অস্কার ওয়াইল্ড এবং বার্ণার্ড শ' প্রভৃতির লেখায় চমকপ্রদ এপিগ্রামের অসদ্ভাব নেই, কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে শানিয়ে বলার জন্যেই তাঁরা সাজিয়ে বলেছেন—কোনো বিশেষ সত্য উপলব্ধিকে অমোঘ উচ্চারণে মানুষের মনে পৌঁছে দেবার তাগিদে নয়। অর্থাৎ ওঁদের ক্ষেত্রে বুদ্ধির চাতুর্য প্রদর্শনের বাসনা যতটা কাজ করেছে, কোনো সর্বাতিশয়ী সত্য অনুভব ও সত্যদৃষ্টির প্রেরণা তেমন কার্যকরী নয়—যেমনটা লা-রোশফুকোর এই প্রবচনমালায় সর্বত্র বিচ্ছুরিত।

লা-রোশফুকোর জীবনদর্শন নিশ্চয়ই খুব আশাবাদী ছিল না। কিছুটা নিরাশাবাদীই বলা চলে। মানবজীবনকে তিনি যেমন দেখেছেন তেমনই তুলে ধরেছেন। জামার সেলাইটা থাকে উল্টো দিকে—সেটা সত্যবস্তু হলেও সুদৃশ্য নয়, তাই আমরা তাকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করি। লা-রোশফুকো সেই সেলাইয়ের দিকটা বারে বারে উল্টে দেখিয়েছেন আমাদের। যা সত্য তাকে ভুলে থাকতে আমরা ভালবাসি—কিন্তু সত্যকে চাক্ষুষ করা, সত্যের মুখোমুখি হওয়া মানুষের আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন। যথোচিত বিনয়ী হওয়ার জন্যও আবশ্যক। কেউ যদি লা-রোশফুকোকে নিছক দোষদর্শী বা cynic বলেন তাও অযথার্থ হবে। কেননা, সমাজজীবনে সুসামাজিক প্রকৃত ভদ্রমনা ব্যক্তির—যাকে তিনি বলেছেন honnete homme তাঁর—আচরণ-লক্ষণ ও মানসিকতার কথাও তিনি এই প্রবচনমালার মধ্যেই বলেছেন। প্রকৃত ভদ্রমনা ব্যক্তি বিনয়ী ও সংযত হবেন, কাউকে আঘাত করবেন না, আত্মপ্রদর্শনে অনীহ হবেন। মানুষের দুর্নিবার স্বার্থপরতা ও অহমিকা সমাজজীবনকে যেখানে অহর্নিশ ঘুলিয়ে উত্তপ্ত করে তুলছে, সেখানে কেবল ভদ্রমনের আদর্শই নির্মল শুশ্রূষা বয়ে আনতে পারে। লা-রোশফুকো মানুষের অন্তর্নিহিত ক্লেদের সত্যকেও যেমন প্রদর্শন করেছেন, তেমনি ভদ্রমনের ঐ আদর্শটিও তুলে ধরতে ভোলেন নি। তাই তাঁকে কিছুতেই 'সীনিক' বলা চলে না।

ভলতেয়র তাঁর 'চতুর্দশ লুই-এর যুগ' (Age of Louis XIV)-গ্রন্থে লা-রোশফুকোর Maxims সম্বন্ধে বলেছেন—যে সব গ্রন্থ ফরাসী জাতির রুচি-গঠনে, এবং সুসঙ্গতি ও যাথার্থ্যের প্রতি তার অনুরাগ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে, এই প্রবচনমালাও তার মধ্যে অন্যতম। সুসভ্য ফরাসী জাতির সাংস্কৃতিক সত্তার সুমার্জিতি সাধনে যে-বই-এর মহৎ ভূমিকা এরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে, লা-রোশফুকোর সেই প্রবচনমালা আমাদের চিত্তকেও সুসংস্কৃত করুক।

শ্রীরামকৃষ্ণের সুখদুঃখ

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার জন্ত যখন হাজার হাজার মানুষ দক্ষিণেশ্বর যাওয়া শুরু করেছেন, তখন তাঁকে মনে হয়েছে এক প্রাণবন্ত, সদানন্দ পুরুষ। হাসি আনন্দে তিনি সবাইকে মোহিত করে রেখেছেন সারাক্ষণ, কৌতুক আর খুশীতে শ্রোতাদের মন ভরে গেছে। এরই মাঝে তিনি দিয়েছেন অমৃত-সংবাদ। পরিহাসের অন্তরালেও লুকিয়ে রেখেছেন সুগভীর তত্ত্বকথা।[১] আসলে তিনি অমৃত-পুরুষ। তিনি সর্বব্যাপী, পরমতম আনন্দের বার্তা পৌছে দিয়েছেন মানুষের অন্তরে।[২] নিজে তিনি অমৃতের স্বাদ পেয়েছিলেন বলে সর্বক্ষণেই ছিল তাঁর আনন্দ।

তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর দুটো সাধ ছিল—তার অন্তত্তর হল, 'শুঁটকে সাধু হব না,' (কথামৃত, ৪।২৪১)। সত্যিই তিনি গুরু-গম্ভীর জ্ঞানদাতা হতে পারেন নি, হন নি নিরাসক্ত সন্ন্যাসীও। ভবতারিণীর কাছে তাঁর প্রার্থনা ছিল তাঁকে 'রসেবশে' রাখার জন্ত—সারা জীবন তিনি রসেবশেই ছিলেন। মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁকে বলেছিলেন—'আপনি মজার লোক। আপনার কাছে মজা খুব', (১।২৩১)।

'কথামৃত'-মহাগ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়, তিনি ছিলেন পরম রসিক। তাঁকে ঘিরে সব সময়ই বসত আনন্দের হাট। ঈশ্বর-তত্ত্বের মধ্যেও ছিল জীবনের উজ্জ্বল সুখানুভূতি।[৩] তাই কথামৃত পড়তে গিয়ে দেখি কখনো রাখাল একজনের চাদরের কোণা গোপনে কাটছেন (৫।৫০), কখনো 'Self Help' পড়ছেন (৪।৩০), কখনো গোলকধাম খেলছেন ভক্তেরা (২।১৫৪), কখনো রামকৃষ্ণদেব একটা তর্ক বাঁধিয়ে দিয়ে বলছেন, 'রফা ক'রো না', (২।২২৬), কখনো চল্‌ছে সঙ্কীর্তন, আবার কখনো চেষ্টা চলছে কেমন করে একজনকে রাগানো যায়—যেমন মণি মল্লিককে ঠাকুর একটা পুকুর তৈরী করার কথা বলেই—ফোড়ন কেটেছেন—'অবশ্য তোমরা তেলিরা নাকি খুব হিসেবী' —একটু পরে মণি মল্লিক বলেছেন—'মহাশয়, পুষ্করিণীর কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার তেলিফেলি বলা কেন?' এর প্রতিক্রিয়া— 'ঠাকুর হাসিতেছেন'—অর্থাৎ তাঁর প্রয়াস সার্থক (২।৩০)।

তিনি অন্তরঙ্গদের নিয়ে আনন্দের মধ্যে থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে নানারকম ফষ্টিনষ্টিও করতেন। শ্রীম তাঁর তৃতীয় দর্শনে ঠাকুরকে এই মজা নিয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন ইনিই কি সেই মহাসাধক যিনি উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা বলেন, প্রখ্যাত মনীষীদেরও মুগ্ধ করে রাখেন অনন্ত বাক্‌বৈদগ্ধে? (কথামৃত ১।৩৩)। তাঁর সামনেই 'হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।'

আসলে, ঠাকুর একঘেয়ে হতে চাননি, প্রিয় ভক্তদেরও তাই একঘেয়ে হতে দেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি মাঝে মাঝে আঁষধোয়া একটু একটু জল দিই', (৪।১৭৭)। মজার মজার গল্প, উপমা প্রভৃতি তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল সরস সংলাপ—আলাপচারীতে এত নিপুণ মানুষ কখনো জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। এর ওপরেও ছিল কৌতুক-নক্সা—বিভিন্ন মানুষের হাবভাব তিনি হুবহু নকল করে দেখাতেন। কীর্তনীয়ার ঢং দেখিয়ে তিনি সবাইকে একদিন হাসিয়েছেন। বালক-ভক্ত পল্টু হেসে গড়িয়েছে (৩।১২২)। ভণ্ড সাধুর ভঙ্গি, চান করার সময় মানুষের গল্পগুজব, জপের সময় ইঙ্গিতে কথা বলা প্রভৃতি দেখিয়ে এক একদিন তিনি আসর জমিয়ে দিতেন।

এই জন্যই গিরিশচন্দ্র একদিন তাঁকে বলেছিলেন—'ফচকিমিতেও আপনাকে পারলুম না।' (৫।১৪২)। কথামৃত-গ্রন্থে আছে—'ঠাকুর এইবার ছোকরাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে লাগলেন,' (৪।১৭৭)। আসলে অল্পবয়সী ভক্তরা তাঁকে বন্ধু মনে করতেন, মজা করতেন নিঃসঙ্কোচে—পরে কিন্তু তাঁরাই নিজেদের এই চপলতার জন্য বিব্রতবোধ করতেন। স্বামী নিখিলানন্দের ভাষায় ' While they were with him, they would regard him as a comrade, but afterw ords would tremble to think of their frivolities in the presence of such a great person.[৪] অবশ্য এই আনন্দও সেই অমৃত সাধনারই অঙ্গীভূত—এরই মধ্য দিয়ে ('through all this fun and frolic, this merriment and frivolity') তিনি ঈশ্বর লাভ ও মুক্তির পথে তাঁদের নিয়ে গেছেন।

বিশ্বম্ভরের ছয় বছরের মেয়েকে তিনি মজার গান শুনিয়েছেন—'আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দিই / তোর ভাতার এলে বলবে ঠিক' (৪।১১০)। কথামৃত-গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় আছে তাঁর কথা ও আচরণের প্রতিক্রিয়ার কথা—তা হল—'সকলের হাস্য'। শ্রোতারা মাঝে মাঝে মেঝেতে গড়াতেন, কেউ কেউ সামলাতে না পেরে বলতেন, 'মশায়, একটু থামুন।'[৫]

এতে অবশ্য আশ্চর্য্যের কিছু নেই। তিনি অমৃত সাধক। আর, সকলেই জানেন—উপনিষদেও অমৃত ও আনন্দ সমার্থক শব্দ[৬]। শ্রীরামকৃষ্ণ ঔপনিষদিক অর্থেই কবি-ঋষি। সেই জন্যেই তিনি বিশ্ব-জীবনের মধ্যেও এক অলৌকিক আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলেন যা আমরা পেতে পারি না। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ও পরম প্রাপ্তির ফলে তিনি ভাসতে পেরেছেন আনন্দ-সাগরে, জাগতিক দুঃখ বেদনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে—এই কথা আমার ভাবতেই পারি না।

●

অথচ তাঁর দুঃখ-শোকের কথাটাও মিথ্যে নয়। মহা-সাধক হয়েও তিনি স্বজন প্রিয়জনের মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের মতোই বেদনা-বিদ্ধ হয়েছেন কারণ তিনি ছিলেন সংসারের মানুষ। সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন বলে তিনি হৃদয়ের দ্বার কখনো রুদ্ধ করেন নি, ফলে পার্থিব অনুভূতিগুলো আদৌ বিদায় নেয় নি।

তাঁর সাত বছর বয়সের সময় মৃত্যু ঘটেছে তাঁর পিতার। এটাই তাঁর জীবনে প্রথম স্বজন-শোক। তাঁর বালক মনে এই মৃত্যু গভীর রেখাপাত করেছিল—তাঁর চপল-ভাব মিলিয়ে গেল, কেমন যেন আনমনা হয়ে রইলেন তিনি দীর্ঘদিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমবাগানে, নয়ত শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতেন।[৭]

কিন্তু এই মৃত্যু-শোক তাঁর বাল্যকালের—তাঁর সাধন-জীবন তখনো আরম্ভ হয় নি। ১৮৫৬ সালে বড়দা রামকুমারের যখন মৃত্যু হয়, তখন ঠাকুরের বয়স কুড়ি—দক্ষিণেশ্বরে তাঁর বিচিত্র পূজা-কর্ম তখন শুরু হয়ে গেছে। তবু এই মৃত্যুটা তাঁকে মুহ্যমান করে তুলেছে। স্বামী তেজসানন্দ লিখেছেন—'পিতৃতুল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।'[৮] তবে এই আঘাত তাঁর অধ্যাত্ম-সাধনাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে—সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধিটা তিনি স্পষ্টতর করে নিয়েছেন, এর ফলে তাঁর মধ্যে এসেছে বৈরাগ্যবোধ। বলা চলে—মৃত্যুশোক তাঁকে সহসা নিজের মুখোমুখি করে দিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল অন্তরের দিকে।[৯]

এরপর মৃত্যু ঘটেছে তাঁর আরেক দাদা রামেশ্বরেরও। সেটা ১৮৭৩ সালের কথা, তখন ঠাকুরের বয়স সাঁইতিরিশ।

ইতিমধ্যেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরীর আগমন (যথাক্রমে ১৮৬১ ও

১৮৬৪) ঘটেছে এবং তাঁদের কাছে ঠাকুর পেয়েছেন উচ্চতম অধ্যাত্ম দীক্ষা। তাছাড়া নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি নানাভাবে সাধনা করেছেন এবং পৌঁছেছেন মহত্তম উপলব্ধি স্তরে। অথচ মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যুও তাঁকে ব্যথিত করেছে। অবশ্য সেই সময় আরো বড় চিন্তা ছিল কেমন করে জননীকে তিনি এই দুঃসংবাদ দেবেন। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, তিনি 'সজল নয়নে' চন্দ্রমণি দেবীকে এই খবর দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করার আগেই তাঁর সুধন্যা জননীই তাঁকে সংসারের অনিত্যতার কথা বলে তাঁর দুঃখ অপনোদনের প্রয়াস পেয়েছেন।[১০]

সিদ্ধির ওই উচ্চতম স্তরেও যে স্বজন-বিয়োগের ব্যথা তাঁর মনকে ছুঁয়ে যেত, তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর মায়ের মৃত্যু সত্যিই তাঁর মনকে ভেঙে দিয়েছিল। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের ফলে পরলোকগত মায়ের জন্য অশৌচাদি করতে পারেন নি, তবে একদিন তর্পণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু "গলিতকর্ম" অবস্থার জন্য তাঁর হাতে জল থাকে নি, তাই তর্পণও করতে পারেননি—সেইজন্য তিনি আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন।[১১] শ্রীমা একদিন শ্রীম-গৃহিণীকে বলেছিলেন, ঠাকুর একদিন খেতে বসে বলছেন—দাঁড়াও, আমি মায়ের জন্য পঞ্চবটীতে একটু কেঁদে আসি।'[১২]

তাঁর এই মাতৃশোক তাঁকে যেন চিরন্তন কালের সংসারী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যুও। অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা তিনি আগেভাগে বুঝেছেন, তাঁর মৃত্যুর সময় ঠাকুর গঙ্গা, নারায়ণ ও রামের নাম শুনিয়েছেন। হৃদয় সেই সময় যত কেঁদেছেন, ঠাকুর তত হেসেছেন দার্শনিকসুলভ নিস্পৃহায়।

তিনি পরে বলেছেন—অক্ষয়ের মৃত্যুতে তিনি ভাল করে দেখেছেন কেমন করে প্রাণ বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। দেখে তাঁর খুব আনন্দ হল—নাচলেন, হাসলেন, গাইলেন। কিন্তু পরের দিন হঠাৎ অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা কেঁদে উঠেছে, গামছা যেমন নিঙড়ায়, তেমনি যেন নিঙড়োচ্ছিল হৃদয়টা। সত্যিই তিনি ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন এই মৃত্যুতে। যে ঘরে অক্ষয়ের মৃত্যু হয়, কুঠিবাড়ির সেই ঘরে তিনি আর যেতেনই না।

অক্ষয়ের মৃত্যুর সাত বছর পরেও তার জন্য ঠাকুরকে কাঁদতে দেখেছেন তাঁর ভাইঝি লক্ষ্মী। তিনি জানিয়েছেন, অক্ষয়ের কথা মনে পড়লেই তিনি হু-হু করে কাঁদতেন। অক্ষয়ের মা কাছে এলে তিনি মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেন, পাছে তাঁকে দেখে তাঁর কান্না পায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে,

অক্ষয়ের মৃত্যুতে তিনি এত ভেঙে পড়েছিলেন যে, মথুরনাথ তখন তাঁর মনোকষ্ট লাঘবের জন্য তীর্থভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১৩]

তাঁর জীবনে আরো কিছু আত্মীয়-বিয়োগ ও সমজাতীয় ঘটনা ঘটেছিল—তাতে তাঁর প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট বিবরণ পাই না, কিন্তু তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ে যে তার রেখাপাত ঘটেছিল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর প্রিয় ভাগ্নে ও প্রথম দিকের নিত্যসঙ্গী হৃদয়রামের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে ১৮৬৮ সালে,[১৪] ভাইঝি লক্ষ্মীর স্বামী বিয়ের অল্পদিন পরেই নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে—বারো বছর অপেক্ষার পর স্বামীর শ্রাদ্ধাদি সেরে লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় নিয়েছেন ঠাকুরের কাছে। এই সব ঘটনাও তাঁকে নিশ্চয়ই ব্যথিত করেছিল, কারণ চরম সাধনায় সিদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন অন্যদিকে সংসারের স্বাভাবিক মানুষ।

শুধু আত্মীয়দের নয়, প্রিয়জনের মৃত্যুও তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। রাণী রাসমণি দেহ রেখেছেন ১৮৬১ সালে। তিনিই কিশোর গদাধরের সাত্ত্বিক রূপ দেখে মন্দিরের কাজে লাগানোর কথা প্রথম ভেবেছিলেন। ঠাকুরের বিচিত্র পূজারীতি নিয়ে যখন অভিযোগ উঠেছে, তাঁর প্রশ্রয় স্নেহেই ঠাকুর পেয়েছেন সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। তিনি ঠাকুরের কণ্ঠে গান শুনতে ভালবাসতেন, একদিন অন্যমনস্ক হয়ে গান শোনার সময় ঠাকুর তাঁকে চপেটাঘাতও করেছেন, (পরে ঠাকুর বলেছেন—'গান গাচ্ছি, দেখি সে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত জোড় করে রইল'—কথামৃত, (২।৩)। ঠাকুরের এই ধৃষ্টতায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, রাণী কিন্তু এই শাস্তি ঈশ্বরদত্ত বলেই সব উত্তাপের অবসান ঘটিয়েছিলেন।[১৬]

১৮৬১ সালে সেই রাণী বিদায় নিলেন, রামকৃষ্ণদেবের মনটা ভারী হয়ে গেল স্বাভাবিকভাবেই। সম্ভবত আরো বেশী কষ্ট তিনি পেয়েছেন রাণীর পরেই মথুরবাবুর মৃত্যুতে। মথুরবাবু তাঁর প্রথম 'রসদদার', তাঁকে বলতেন 'বাবা'—ষোল বছর অকাতরে তাঁর সেবা করেছেন, যথাসর্বস্ব দিতে চেয়েছেন নিরাসক্ত মহাপুরুষটিকে। সেই মথুরবাবুর অসুখ ক্রমে বিকারে পরিণত হল—অথচ ঠাকুর একটা দিনও তাঁকে দেখতে যান নি, সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন না বলে। রোজ হৃদয়রামকে পাঠিয়ে মথুরবাবুর খোঁজ এনেছেন, মৃত্যুর দিন তাঁকেও পাঠাননি। বিকেলের দিকে ঘণ্টা-দুয়েক তিনি ভাবস্থ হয়েছিলেন, একসময় (তখন পাঁচটা বেজে গেছে) হৃদয়কে ডেকে বলেছেন—মা জগদম্বার সখীরা মথুরকে সাদরে দিব্যরথে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন।[১৭] বলা বাহুল্য,

কালীবাড়ির কর্মচারীরা মাঝরাতে ফিরে জানিয়েছেন মথুরবাবুর মৃত্যু ঘটেছে বিকেলে, অর্থাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থায়। এতেই বোঝা যায়—এই মৃত্যুটাও (১৮৭১) ছিল তাঁর কাছে এক কঠিন আঘাত।

দশ বছর পরে দেহ রেখেছেন মথুরবাবুর স্ত্রীও—তিনিও ঠাকুরকে পিতৃ-সম্বোধনে এতকাল কাছে টেনে রেখেছেন। ঠাকুরকে তিনি দেবজ্ঞানে সেবা করেছেন, বিশ্বাস করেছেন অন্ধভাবে, কখনো নারী সাজিয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন, কখনো শয্যাকক্ষে রেখেছেন প্রিয় শিশু হিসেবে। জগদম্বাদেবীর অসুখের সময় ঠাকুর তাঁর রোগভোগ নিজে নিয়েছিলেন—জগদম্বাদেবী ভাল হলেন—ভোগটা গেল ঠাকুরের ওপর দিয়ে।

সেই স্নেহধন্যা নারীও বিদায় নিলেন ঠাকুরকে ভারাক্রান্ত করে।

আরো আছে। অন্যতম রসদদার শম্ভু মল্লিকও অকালে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলেছেন—ভাবে দেখলাম—গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেক দিন পরে শম্ভুকে দেখলাম, তখন মনে পড়ল একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছিলাম, (কথামৃত ৪।২৯৫)। অকাতরে তিনিও সেবা করেছেন ঠাকুরের, শ্রীমা ও ঠাকুরের ভক্তদের জন্য রসদ জুগিয়েছেন দীর্ঘদিন। অথচ বহুমূত্র রোগে তাকেও বিদায় নিতে হয়েছে, মৃত্যুর আগে তাঁকে দেখে ঠাকুর জানিয়েছেন—'শম্ভুর প্রদীপে তেল নেই।' বলা বাহুল্য, এই মৃত্যুটাও ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত বেদনাময়।

তাঁর অতি প্রিয় কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুও তাঁর কাছে ছিল এক নিদারুণ আঘাত। কেশবচন্দ্রের অসুখের সময় তাঁর বাড়ি গিয়ে ঠাকুর বলেছেন—'তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কলকাতায় এলে ডাব-চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনেছিলুম যাতে অসুখ ভাল হয়', (২।৮৮)। কথাটি তিনি শ্রীম-কেও বলেছিলেন দ্বিতীয় দর্শনে। বলেছেন —'শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের অসুখ ভাল করে দাও। কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম', (১।১৮)।

কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কেশবকেও বিদায় নিতে হল। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে তিনদিন ঠাকুর বিছানা ছাড়তে পারেন নি—তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর একটা অঙ্গ পড়ে গেছে।[১৮]

বরানগর থেকে আসতেন গোপাল সেন। সংসার তাঁর ভাল লাগত না—ঠাকুরের কাছে একদিন বিদায়ও চেয়েছিলেন। হঠাৎ একসময় চিরবিদায় ঘটল। তাঁর বন্ধু গোবিন্দ এসে খবর দিলেন। শোকে কাতর হয়ে উঠলেন ঠাকুর, কয়েকদিন পরে খবর এল গোবিন্দও চলে গেছেন ওপারে। ঠাকুর চোখ মুছেছেন বারবার, মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি করেছেন—ওরা আমার কে? কেউ না।[১৯]

শ্রীম-র ছেলে মারা গেছে। বেদনাবিদ্ধ ঠাকুর সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে তাঁকে বলেছেন, তাঁর স্ত্রীকে যেন দক্ষিণেশ্বরে দুদিন রাখেন, সেই দুঃসহ শোকে একটু সান্ত্বনা মিলবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি কৃষ্ণকিশোরের কথা বলেছেন। ঠাকুরের এই অন্তরঙ্গ ভক্ত দুই উপযুক্ত ছেলের মৃত্যুতে উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। এর পরেই ঠাকুর বলেছেন সেই আশ্চর্য কথাটা—'আমায় ভাগ্যিস ঈশ্বর দেন নি', (৪।৩০১)।

নিজের প্রিয়জনদের মৃত্যু দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন যে, জ্ঞানচর্চায় সংসারকে মায়া মনে হতে পারে, কিন্তু বিয়োগব্যথা মানুষকে কতটা কাতর করে দিতে পারে। তিনি সর্বত্যাগী তাঁরই এই অবস্থা—সংসারীর যন্ত্রনা তো দুঃসহ হবেই।

লাটু তাঁকে এক ভক্তের কথা বলেছিলেন—তিনি পুত্রবিয়োগের পর একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী শোকে উন্মাদপ্রায়। 'ঠাকুর এই শোকের কথা শুনিয়া যেন চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, (২।২৪৫)। অধরের বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশোকে অস্থির হয়ে সান্ত্বনালাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর গান শুনিয়েছেন—'জীব সাজ সমরে'। পরে বলেছেন—'কি করবে? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও।···তা শোক হবে না গো? আত্মজ! রাবণ বধ হল; লক্ষণ দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নাই—যেখানে ছিদ্র নাই। তখন বললেন—রাম। তোমার বাণের কি মহিমা।···তখন রাম বললেন—ভাই, হাড়ের ভিতর যে সব ছিদ্র দেখছ, ও বাণের জন্য নয়। শোকে তার হাড় জরজর হয়েছে।···তবে এ সব অনিত্য। গৃহ, পরিবার, সন্তান দুদিনের জন্য' (২।৩৮-৩৯)।

সত্যিই তিনি সংসারী না হয়েও সংসারের এই বিয়োগ-ব্যথাটা ভাল করে বুঝেছিলেন নিজের দুঃখ-শোকের মধ্য দিয়েই। একবার তিনি বলেছেন—'যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে

পারে ? না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে ? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার করে বেড়াতে পারে, না সুখ-সম্ভোগ করতে পারে ?' (১।২১৬)

কিন্তু তাঁর দুঃখ তো স্বজন-বিয়োগ বা প্রিয়জন-মৃত্যুতে নয়, দুঃখের কারণ নিহিত আছে বিচ্ছেদেও। হৃদয়রাম এক সময় তাঁর সেবা করেছেন একান্ত-ভাবে, নিয়মেও রেখেছেন তেমনি। তিনি বলেছেন, তিনি হৃদয়ের 'অণ্ডারে' (under) ছিলেন, (৪ । ২৭৩)। এক এক সময় হৃদয় শাসনের নামে তাঁকে নির্যাতনও করেছেন অনেক। হাতে করে গু পরিষ্কার করেছেন যেমন, তেমনি শাস্তিও দিয়েছেন (১ । ৯৬)। ঠাকুর নিজেই বলেছেন—'একদিন এ রকম করে যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলুম', (১ । ১৬৯)।

শেষে মন্দির থেকে হৃদয়রাম বিতাড়িত হলে ঠাকুর সেটাকে ঈশ্বরের ইচ্ছে হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর হৃদয় মন্দিরের বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে দুজনেই কেঁদেছেন। শ্রীম লিখেছেন—কি আশ্চর্য ! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদিতেছেন। চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল', (১ । ১৬৮)।

হৃদয়কে আবার আসার কথা বলে তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে গেছেন।

●

কিন্তু তাঁর দুঃখ কি এক রকমের ?

প্রথম দিকে ঈশ্বরীকে দেখার জন্ত তাঁকে কম কাঁদতে হয়েছে ? তিনি বলেছেন 'সকলেরই যে বেশী তপস্যা করতে হয়, তা নয়। আমার কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল 'মা মা' বলে ডাকতাম, কাঁদতাম, (২ । ৮৮)। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সেই সময় তাঁর নিজের দেহভাব একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন, আহার নিদ্রাও ছিল না। তিনি উচ্চস্বরে শুধু মায়ের নাম ধরে কাঁদতেন।[২০]

ওই সময় ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা আর কান্নায় কখন যে দিন চলে যেত, তিনি টেরই পেতেন না। সন্ধ্যের সময় যখন মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি হত, তখন তাঁর মনে পড়ত—দিন অবসান হল, একটা দিন বৃথা কেটে গেল। তীব্র আক্ষেপে তিনি আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতেন, যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। লোকে বলত—পেটে নিশ্চয়ই শূলব্যথা ধরেছে।[২১]

ঈশ্বর-দর্শনের পর এবার দেখা দিল অন্ত ধরণের দুঃখ। তিনি যা

পেয়েছেন, তা অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তখন কাঁদতেন, ব্যাকুল হয়ে ডাকতেন অনাগত ভক্তদের। কুঠিবাড়ির ওপর থেকে তিনি কেঁদে কেঁদে ডাকতেন 'ওরে' তোরা কে কোথায় আছিস, আয়', (৪। ২৫১)।

ক্রমে সবাই এসেছেন। পূর্ণ আসার পর তাঁর পার্ষদদের তালিকা পূর্ণ হয়েছে। তবু ভয়—সঙ্গী হিসেবে সবাই কি থাকবে? তাঁর অবস্থা সেই ভূতের সঙ্গী খোঁজার মতো—কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই সে ছুটত অপঘাতে-মৃত নতুন ভূতের জন্য ; কিন্তু গিয়ে দেখত আসলে মৃত্যু ঘটে নি', (৩। ১২১)।

তিনি বিষয়ের কথা শুনেও কাঁদতেন। মথুরবাবু তাঁকে নিয়ে তীর্থে গিয়ে কাশীতে রাজাবাবুর বাড়িতে ছিলেন। বৈঠকখানায় বিষয়ের কথা হচ্ছে—শুনে ঠাকুর কাঁদতে শুরু করেছেন, (২। ৩)। অবশ্য ক্রমে ত্যাগী ভক্তরা এসেছেন, এসেছেন নিত্যসিদ্ধ কিশোর-শিষ্যরা। কিন্তু তাতেও কি তাঁর যন্ত্রণা কমেছে? প্রাণের প্রিয় নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে দেখেই তো তিনি কেঁদেছেন, তাঁর অদর্শনে যন্ত্রণায় কেটেছে তাঁর দিন। তিনি বলেছেন—'ক্রমে তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগল, প্রাণ আটু-পাটু করতে লাগল। ...মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখবো বলে বসে বসে কাঁদতুম', (২।৫৩-৫৪)।
সেই নরেন্দ্রও শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করলেন, অন্যান্য শিষ্যদের তিনি তাঁরই তত্ত্বধানে রাখার ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু ক্রমে দেখা দিল কাল রোগ, গলার দুরারোগ্য ব্যাধি যাকে ম্যাক্সমুলার বলেছেন 'the 'clergyman's throat'।[২২] সেই নিদারুণ রোগযন্ত্রণা তাঁকে ক্রমে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে, ভাতের মণ্ড খেতেও হত অবর্ণনীয় কষ্ট। ১৮৮৫-র মার্চ থেকে তাঁর মহাপ্রয়াণ (১৬.৮.৮৬) পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে শারীরিক কষ্ট বেড়েছে। এক-এক সময় সরল শিশুর মতো ডাক্তারের কাছে আরোগ্যের প্রার্থনা করেছেন—'এই অসুখটা ভাল করে দাও', (৯। ২২২)। ক্যান্সারের সেই অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে ভক্তেরা ব্যাকুল হয়েছেন—প্রথমে তাঁকে শ্যামপুকুর ও পরে কাশীপুরে এনে সেবা-শুশ্রূষা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কষ্ট কমে নি।

তারই মধ্যে তিনি বজায় রেখেছেন প্রফুল্লতা—গান শুনেছেন, মজা করেছেন, বিশেষ করে ডাক্তার সরকার এলে, তাঁর সঙ্গে বাকচাতুর্য্যে মেতে উঠেছেন। একবার ভক্তদের বেতালা গান শুনে বলেছেন—'তাল হয় না কেন? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল—এ তাই', (৩। ২০২)। আবার দারুণ এক বেদান্ত-গল্প বলে চমৎকৃত করেছেন ডাঃ সরকারকে—গল্পটার প্রশংসা শুনেই বলেছেন—একটা 'thank you' দাও', (৩। ২৩০) নাস্তিক ডাঃ সরকারকে

খোঁচা দিয়ে গল্প বলেছেন—একজন একটা বাড়ি পড়ে যেতে দেখে সেই ঘটনা বলায় অন্যজন বলেছে—এটা হ'তেই পারে না, কারণ খবরের কাগজে লেখে নি, (১ । ২২১) অন্য প্রান্তে আছে উচ্চাঙ্গের বেদান্ত-গল্প—একজন ভেল্‌কি দেখাচ্ছে রাজাকে। একটু পরে রাজা দেখল সওয়ার আসছে—খুব সাজগোজ করে। সবাই বিচার করল সত্যটা কোন্‌টা—ঘোড়া নয়, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্রও নয়—শেষে দেখল সওয়ার একা দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, আর কিছু নয় (৩ । ২৩০)।

সেই দুঃসহ কষ্টের মধ্যেও তিনি হাসি-ঠাট্টা করেছেন সহজভাবেই। তাঁর রসিকতা বোধ তখনো ছিল অটুট। মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ে তিনি গল্প বলেছেন—একজন দুর্গাপূজা বন্ধ করেছে—প্রশ্ন উঠতেই বলল—আর দাঁত নেই ভাই, পাঁঠা খাবার শক্তি গেছে, (২ । ২৪১)। ডাক্তার সরকার মজা করে বলেছেন—একটা মেয়ের হুপিংকাশি সারে না, শেষে দেখা গেল, যেই গাধার দুধ খেয়েছে, তার সর্দি হয়েছে—তাই এই ব্যাধি। ঠাকুর মুহূর্তে বললেন—সে কি? এ যে অম্বল হয়েছে কেন—গাড়ি তেঁতুলতলায় গিয়েছিল বলে, (১ । ২২০)। এ যেন জমাট আসরকে একেবারে মাতিয়ে দেওয়া।

তিনি কামিনীকাঞ্চনকে দূরে রাখতে বলতেন। ডাঃ সরকার বললেন, চিকিৎসার জন্যই কাঞ্চন চাই, এমন কি পথ্যের জন্য কামিনীও। ঠাকুর নরেন্দ্রকে বললেন—বল্ না (২ । ২৫২)। যুক্তি না পেয়ে নরেন্দ্রর শরণাপন্ন হওয়াটা বেশ মজার সৃষ্টি করে।

কিন্তু দেহের কষ্ট কি আদৌ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু দুশ্চর সাধনায় সিদ্ধ মহাতাপস দেহ আর মনকে আলাদা করে নিয়েছিলেন বলেই যন্ত্রণাটা তেমন তাঁকে বেঁধেনি। কতবারই তো তিনি গেয়েছেন—'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।' তাই সাহেব সেজে বিনোদিনী এলে পাহারাদার নিরঞ্জনকে ঠকানো গেছে—এই নিয়ে দুজনে হেসে লুটোপুটি করতে পেরেছেন।[২৩] কাশীপুরে একদিন শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁকে বলেছিলেন, ঠাকুর একটু শরীরের দিকে মন দিলেই (অর্থাৎ শরীর সারানোর জন্য ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করলেই তাঁর আরোগ্য লাভ হতে পারে। তাতে ঠাকুর বলেছেন—যে মন তিনি ঈশ্বরকে দিয়েছেন, তা তুচ্ছ রক্ত-মাংসের শরীরের দিকে দিতে পারবেন না।[২৪] সেইজন্যই ম্যাক্সমূলার তাঁর রোগশয্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন—**He was undaunted and remained as cheerful as ever.'**[২৫]

কিন্তু যতই দেহ আর মন পৃথক করুন, সেই কষ্টকর অসুখ কি একটুও যন্ত্রণা দেয় নি তাঁকে? তাঁর অবর্ণনীয় কষ্টের কথা ভেবে ভক্তরা ক্লিষ্ট হয়েছেন, অনেকে স্বচক্ষে সেই দৃশ্য দেখবেন না বলে সরে রয়েছেন। সেই কষ্টের একটুও কি তাঁকে ছোঁয় নি।'

তাছাড়া বিদায়-ব্যথা?

শ্রীমা আর ভক্ত সন্তানরা পেছনে পড়ে থাকবেন—এই চিন্তা কি তাঁকে একচুল ব্যথিত করে নি?

রাখালকে নিয়ে তিনি বাৎসল্য-রস উপলব্ধি করতেন—তিনি ঠাকুরের কাছে ছিলেন ব্রজের রাখাল, তাঁর পুত্র-স্বরূপ।[২৬] সেই রাখাল কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন, 'যেন ফেলে না যান', (৩।২৬২)। আর নরেন্দ্রনাথ তাঁর মানসপুত্র—খেতে বলে হঠাৎ উঠে তিনি নিজের পাত থেকে, দই ও তরমুজের পানা নরেনের পাতে দিয়ে স্নেহ স্বরে বলেছেন, 'নরেন্দ্র, তুই এটুকু খা', (২।২৩৪) নরেন্দ্রনাথও তাঁকে ঐশী শক্তির সাহায্যে ভাল হয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। কালীপ্রসাদ (পরে স্বামী অভেদানন্দ) ছিলেন অতি প্রিয়—তাঁর ভাষায় 'তাঁহার অপূর্ব ভালবাসার তুলনায় পিতামাতার স্নেহ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত।'[২৭] তাছাড়া বাবুরাম, লাটু, শরৎ, শশী, তারক প্রমুখ সন্তানরা ছিলেন স্নেহের বন্ধন হিসেবে,—তাঁদের সবাইর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার চিন্তায় একবারের জন্যও আচ্ছন্ন হয় নি তাঁর মন? তাঁর গিরিশকে পঙ্ককুণ্ড থেকে তুলে এনে তিনি 'ভক্ত ভৈরব' সাজিয়েছেন, 'বকলমা' নিয়েছেন তাঁর মুক্তির জন্য। অসুস্থ ঠাকুরকে তিনি দেখতে যেতেন না—সেই অপরাধও ঠাকুর ক্ষমা করে বলেছেন—'আহা! সে আমার যন্ত্রণা দেখতে পারে না।'[২৮] সেই গিরিশও তাঁর আরোগ্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাতরভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অনুরোধ করেছেন।

এর কোনো কিছুই কি তাঁর মনকে ছোঁয় নি?

বিশেষ করে স্ত্রী সারদা দেবী যাঁকে তিনি সরস্বতী হিসেবে দেখেছেন—সেবায়, মমতায়, ত্যাগে যিনি রচনা করেছেন এক আশ্চর্য ইতিহাস, তাঁর জন্যও কি ব্যথিত হন নি করুণাময় ঠাকুর? কাশীপুরে ঠাকুর অতি কষ্টে ভাতের মণ্ড খেতেন, রান্না করে খাইয়ে যেতেন শ্রীমা। একদিন পড়ে গিয়ে তাঁর পা ভাঙলে, চিন্তিত কণ্ঠে রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে বলেছেন—একটা ঝুড়িতে বসিয়ে সারদা দেবীকে ওপরে নিয়ে আসতে।[২৯] তাঁর সাধন জীবনের অপরিহার্য লীলাসঙ্গিনী—সাতাশ বছরের দাম্পত্য-জীবনের দেবী-সহচরী

সারদার জন্যও কি বিদায়-বেলায় ঠাকুরের কোনো দুঃখ দেখা দেয় নি মনে ?

একদিন হঠাৎ বিনা মেঘে বাজ পড়েছিল। ভয়ে সারদা দেবী আর লক্ষ্মী ছুটে এসেছিলেন ঠাকুরের কাছে। সহজ-স্নিগ্ধ হাসি নিয়েই ঠাকুর বলেছিলেন—'আর কি ? এবার খেলাঘর ভেঙে দাও।'

কিন্তু সেই খেলাঘরই তো ছিল সুখের ঘর। বললেই তা ভাঙা যায় ? তিল তিল করে গড়ে এক লহমায় তা ভেঙে দিতে সাধক-পুরুষের কোনো বেদনা হয় নি ? অন্তত সারদা দেবীর ক্ষেত্রে তা হয়েছিল। হত্যা দিয়ে তিনি পড়েছিলেন তারকেশ্বরে—কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে। আগের মতোই সহজ হাসি নিয়ে ঠাকুর বলেছেন—কি হল ? কিছু পেলে না তো ?

ক্রমে শেষের দিন ঘনিয়ে এল। নিজেকে আরো সরিয়ে নিলেন তিনি।[৩০]

চুপি-চুপি ঠাকুর শ্রীমাকে ডেকেছেন। খুলে দিয়েছেন ইষ্টকবচ। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিদায়ের ইঙ্গিত। আর শেষের সময়টায় ! ১৫ই অগাষ্ট সন্ধ্যের দিকে শ্রীমাকে ডেকে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছেন—শোন, এবার ডাক এসেছে, যেতে হবে।

কাঁদছিলেন শ্রীমা।

সান্ত্বনা দিয়েছেন ঠাকুর। বলেছেন—কাঁদছ কেন, যেমন চলছিল, সব তেমনি চলবে।

কিন্তু তাঁর কি চোখের পাতা ভেজে নি একটুও ? তিনি গাইতেন—'ভেবে দেখ মন, কেউ কারু নয়' গানটা। তাঁর কাছে সংসার একটা স্বপ্নের মতো, কোনো কিছুর দাগ এতে পড়ার কথা নয়। তাঁর উপমায় এখানে পাঁকাল মাছের মতো থাকতে হয়। কী সুন্দর করে তিনি বলেছেন সেই গল্পটা—এক চাষীর ছেলে মারা গেছে, কিন্তু সে একটুও কাঁদল না। পরে স্ত্রীকে বলল,—রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে, সে রাজা হয়েছে—সাতটা কৃতী ছেলে নিয়ে তার সংসার। কিন্তু এখন সে কাঁদবে কার জন্য ? নিজের ছেলের জন্য, না সেই সাত ছেলের জন্য ? (২। ৬২-৬৩)।

সুতরাং জন্ম-মৃত্যু তাঁর কাছে কিছু নয়, মায়া-পাশও এক স্বপ্নের ব্যাপার। কিন্তু এত অপার ছিল যার স্নেহ-প্রেম, বাহ্যিক বন্ধনগুলো একটু একটু করে খুলে নিতে তাঁর কি একটুও কষ্ট হয় নি ? কে জানে ॥

সূত্রনির্দেশ :

১. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়—কথার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ, নিবেদন (৬)।
২. পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী—অমৃতরসিক শ্রীরামকৃষ্ণ, নিবেদন।
৩. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা—শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৮১।
৪. Sri Ramakrishna, P. 79.
৫. স্বামী প্রভানন্দ—'আনন্দঘন শ্রীরামকৃষ্ণ,' বিবেকভারতী, আশ্বিন, ১৩৯০।
৬. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—উপনিষদের বাণী, পৃঃ ৩৬।
৭. ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ—ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী, পৃঃ ১৩।
৮. শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবনী, পৃঃ ৩৮।
৯. কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা, পৃঃ ১৯।
১০. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—লীলাপ্রসঙ্গ। ১ম, পৃঃ ৩১৫।
১১. ঐ, পৃঃ ৩২১।
১২. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ১৭৬।
১৩. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য—ঐ, পৃঃ ১৪৯।
১৪. নির্মলকুমার রায়—শ্রীরামকৃষ্ণ—সংস্পর্শে, পৃঃ ৮৩।
১৫. শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত (সঙ্কলক নীরেন্দ্র গুপ্ত), পৃঃ ১৩৭।
১৬. Swami Tejasanada—A Short Life of Sri Ramakrishna, P. 72.
১৭. স্বামী সারদানন্দ—ঐ, পৃঃ ২৯৩।
১৮. স্বামী সারদানন্দ—ঐ, পৃঃ ৩২৬।
১৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, ১ম, ১৩৬।
২০. মদীয় আচার্য্যদেব, পৃঃ ২৩।
২১. স্বামী সারদানন্দ—ঐ, পৃঃ ১৬৪।
২২. The Life And Sayings of Ramakrishna, P. 57.
২৩. নন্দলাল ভট্টাচার্য—শতাব্দীর কল্পতরু, পৃঃ ৩৩।
২৪. স্বামী অভেদানন্দ—আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৩।
২৫. ঐ, পৃঃ ৬৭।
২৬. মণি বাগচি—সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩২।
২৭. ঐ, পৃঃ ৮১।
২৮. গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৭।

২৯. অপর্ণা সেনগুপ্ত—শ্রীরামকৃষ্ণের সংসার, পৃঃ ৬৬।

৩০. রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়—'The nearer he drew to his end, the more detached he became.'—The Life of Ramakrishna, P. 270.

"ভাষাবিদ্ ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য" : ভ্রম সংশোধন

আলেখ্যে'র বিজ্ঞপাঠক শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন : 'আলেখ্য' শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯৬ পত্রিকায় "ভাষাবিদ্ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র "সকলে মিলে নিজেদের রচনা 'দলবেঁধে' নামে একটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এখানে বিষ্ণুপদবাবুর একটি কবিতা ছিল যার নাম 'জোনাকী'। "এই উক্তি সঠিক নয়। 'দলবেঁধে' (রথযাত্রা, ১৩৪৩ পৃঃ ৪৩৬) ৫০টি গল্পের সংকলন। এই গ্রন্থে নবীন বা উদীয়মান লেখকদের কাছ থেকে একটি করে মোট ৪০টি গল্প নেওয়া হয়েছিল। উক্তগ্রন্থে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি করে গল্প স্থান পেয়েছে। এই গল্পের পরিকল্পনা বা প্রকাশনার সঙ্গে উক্ত তিনজনের কোন যোগ ছিল না। উক্ত গ্রন্থের পরিকল্পনা ও সম্পাদনা যাঁরা করেন তাঁরা হলেন : অদ্বৈতমল্লবর্মন, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, রাখালদাদাস চক্রবর্তী এবং সতীকুমার নাগ।"

সংস্কৃতি ভাবনা

অশুভ প্রবণতা

আমাদের স্বাধীনতার পর থেকেই একটা ব্যাপার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইদানীং তার আতিশয্য তো খুবই দুশ্চিন্তাদায়ক মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির স্বার্থেই এ প্রবণতা সংযত করা বিশেষ দরকার।

জিনিসটা হোল, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-খেলাধূলা সংক্রান্ত সব অনুষ্ঠানেই রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রীদের প্রাধান্য। এঁরাই এজাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ইত্যাদির পদ অধিকার বা অলঙ্কৃত করবেনই। এক বা একাধিক মন্ত্রীর প্রধান ভূমিকা না থাকলে কোনো অনুষ্ঠানই যেন অনুষ্ঠানবাচ্য নয়—অবস্থা এমনই পর্যায়ে এসেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হবে—পুরস্কার দান ও ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী; উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও, তিনিই। সাহিত্যবিষয়ে কোনো পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, সেখানে তিনিই মুখ্য। বইমেলা অনুষ্ঠানেও তদ্রূপ। বিজ্ঞান মেলাতেও তাই। শিল্প প্রদর্শনীতেও তিনি, নৃত্য-নাট্য-যাত্রা-সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীতেও তিনি। খেলাধূলার বড়ো অনুষ্ঠানেও দেখি মঞ্চোপরি ভাষণদানরত মুখ্য-অমুখ্য মন্ত্রীবর্গ!

এটা কেন হবে? হওয়া বাঞ্ছনীয় কী? মোটেই নয়। সাহিত্য সংস্কৃতির এই সব নানা অনুষ্ঠানে মন্ত্রীরা আসেন কোন অধিকারে? তাঁরা কি এইসব ক্ষেত্রে কৃতী? হা হতোস্মি, বরং বিপরীত। তবে তাঁরা আসেন কিসের জোরে? সরকারী অনুদানের টাকার থলি তাঁদের হাতে,—তাঁদের ডাকলে এসব সভা ও অনুষ্ঠান খুব স্বাচ্ছল্যের সঙ্গে নির্বাহ হয়ে যায়, তাই সভা-অলঙ্করণে অনুষ্ঠানরা এঁদের না ডেকে পারেন না—টাকার প্রশ্নটা তো ফেলনা নয়। চাইকি, ওঁদের দৌলতে রাজকোষ থেকে বাঁধা মাসিক, দ্বিমাসিক, কি ষান্মাসিক অনুদানও পাওয়া যেতে পারে। মন্ত্রীরাও চান তাঁদের 'ইমেজ' বা ভাবমূর্তি এবং তাঁদের দলের ভাবমূর্তি জনতার চোখে ও মনে সর্বদা জাগরূক থাকুক। এবং তাঁরা যে কতো বিষয়ে কিরূপ দিগ্‌গজ তা-ও জনতা দেখে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হোক। এর দ্বারা তাঁর এবং তাঁর দলের ভোটপ্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হবে। টাকা তো গৌরী সেনের

আছেই—তা থেকে এইসব সৎকাজে ব্যয় করে দুনো লাভ ঘরে আসবে। দুই পক্ষেই এইভাবে হিসেব কষেন এবং এরই ফলে আমরা সাহিত্য সংস্কৃতি খেলাধূলা সব মঞ্চেই দেখি, মন্ত্রী মহোদয়দের মুখ্য আসন এবং শুনি ওঁদেরই মুখ্য ভাষণ।

এটা ঘটেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্ত্তী অধ্যায়ে। তার আগের যুগে এসবের বালাই ছিল না। সাহিত্য বাসরে ও সাংস্কৃতিক আসরে তাঁরাই মুখ্য আসন অলঙ্কৃত করতেন, যাঁদের তত্তৎ বিষয়ে বিশেষ কৃতী বলে' খ্যাতি ছিল। সরকারী কর্ত্তারা অধিকাংশই বিদেশী হওয়ায় তাঁদের ডাকার প্রশ্নও ছিল না। বিশেষ, বিদেশী শাসনকর্তাদের সংসর্গ সর্বক্ষেত্রে বর্জন করাই তখন নীতি বলে' গৃহীত হওয়ায়, তাঁদের অনুগ্রহ লাভ কেউ আদরনীয় মনেও করতো না। এর ফলে তখন যাকিছু সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানদি হোত, তা হোত সর্বদা সরকারী সংশ্রব বর্জিত হয়ে। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁরা খ্যাতিমান তাঁদেরকেই লোকে আহ্বান করতো। এবং তাঁদের কথাই শুনতে চাইতো এবং তাঁদের নির্দেশই অনুসরণীয় মনে করতো। সাহিত্য সংস্কৃতির পক্ষেও এটা যেমন কল্যাণকর হয়েছিল, জনগণের পক্ষেও হয়েছিল তুল্যরূপ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও জাতির আত্মনির্ভরতা এর দ্বারা বেড়ে ওঠে, এবং এ-যে সকলেরই যৌথ দায়িত্বের ব্যাপার এ-চেতনা অল্পবিস্তর সকলের মনেই জাগে। এবং তারই ফলে দেশে নানা সাংস্কৃতিক উদ্যোগ স্বতঃ উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে, নানা দিকে সাংস্কৃতিক কর্মধারা প্রসারিত হয়।

আর এখন? সরকারী উদ্যোগে বহু বিশ্ববিদ্যালয়, বহু লাইব্রেরী, বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সর্বত্র সরকারী লালফিতা কোথাও কাউকে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে দিচ্ছে না—ফলে সে যুগের তুলনায় এযুগে সাংস্কৃতিক দৈন্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ চাইছেন সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ব্যাপারগুলিকেও নিজেদের কুক্ষিগত করতে, নিজেদের দলীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ও অনুরঞ্জিত করতে। তাই তাঁরা সাহিত্য সংস্কৃতিকে উৎসাহ দানের নামে অনেকগুলি পুরস্কারের প্রবর্তন করেছেন—নানা স্মরণীয় মনীষীদের নামচিহ্নিত ক'রে। এসব পুরস্কারের অর্থমূল্য এ বাজারে খুব বেশী না হলেও এখনো এর সম্মান মূল্য অনেকখানি। সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিসনে এর সম্প্রচার এবং তার মাধ্যমে লেখকের বহুল পরিচিতিও কম লোভনীয় নয়। তা ছাড়া এই পরিচিতি ও প্রচারের ফলে পুরস্কার প্রাপকদের বই ও শিল্পকৃতির কাটতিও

বাড়ে—সে ও কম লাভ নয়। তাই এসব সরকারী পুরস্কার স্বভাবতঃই প্রাপকদের কাছে কাঙ্ক্ষণীয়। কিন্তু শাসকদল যদি এই পুরস্কার প্রদান ক'রে ও পুরস্কার-লোভায়িত ক'রে লেখকদের তাঁদের বিশেষ রঙের রাজনীতির পক্ষপাতী করার প্রয়াসী হন—লেখক ও শিল্পীদের তাঁদের রাজনৈতিক মনোভঙ্গির বিচারে বাছাই ক'রে,—তা হলে' ফলটা কিরূপ হতে পারে? কী যে হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। শাসকদলের রাজনৈতিক বিচারে বহু যোগ্য লেখক পুরস্কারের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারেন এবং তদ্রূপ বহু অযোগ্য লেখকও পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হতে পারেন। রাজনীতির তাগিদ কোনো যুক্তি মানে না, ক্ষমতার স্বার্থও নীতির ধার ধারে না। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

কাজেই যদি আমরা সৎ সাহিত্য ও সুস্থ সংস্কৃতি চাই তাহলে রাজনীতিক-দের অনুপ্রবেশ এক্ষেত্রে ঘটতে না দেওয়াই কর্তব্য। পুরস্কার প্রদানের জন্য 'ট্রাষ্ট' থাকবে, যা হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত। যাতে সরকার মনোনীত একটি সদস্যও থাকবে না, যার অছিবর্গ নির্বাচিত হবেন বিবিধ বিদ্বজ্জন-সভা সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের গোপন ভোটে। সরকারী অনুদানেই এই ট্রাষ্টকাণ্ডগুলি গঠিত হবে নিশ্চয়ই কিন্তু তাদের কাজকর্মের উপর কোনো সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এইটে যদি করা যায় তা হলেই পুরস্কার দানের মাধ্যমে সাহিত্য সংস্কৃতির যথার্থ প্রোৎসাহন এবং যোগ্য প্রতিভার সমাদর সম্ভব হতে পারে।

এখন যা চলেছে, তাতে সর্বক্ষেত্রে শাসকদলের রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাগ্রসর ও জয়যুক্ত করার সাধনাই চলেছে—সাহিত্য সংস্কৃতির যথার্থ ভালো মন্দ নিয়ে কেউ ভাবিত নয়—ভাবার যোগ্যতাও রাজনীতিক নেতাদের নেই। এখন সরকারী রাজকোষে প্রচুর টাকা এবং সরকারী কর্তাদের খুশী করতে পারলেই নানা স্রোতে সেই অর্থ নানা সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, পত্র পত্রিকা ইত্যাদিতে প্রবাহিত হতে পারে। যেমন, সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের হাতে পত্র পত্রিকার বিজ্ঞাপন দানের একটা ব্যবস্থা আছে, সকলেই জানেন। অব্যবসায়িক ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিই এই বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকে। এসব বিজ্ঞাপন অনুদানেরই নামান্তর। পত্রপত্রিকা মাত্রেই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা, এবং যেহেতু এদের পিছনে অধিকাংশতই কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যোগ নাই, তাই এদের এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করা সরকারের (অর্থাৎ দেশবাসীর) কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু এখানেও অনুদানের চাবিটি সরকারের

হাতে, তাই এখানেও অনুদানের তারতম্য ঘটিয়ে শাসকদলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা হয়ে থাকে। এখানেও রাজনৈতিক মানদণ্ড দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির যোগ্যতা বিচার করা হয়ে থাকে। যে সব পত্রিকা সরকারী দৃষ্টির অনুকূল মতামত প্রচার করে বা তদ্‌ভাবভাবিত রচনা প্রকাশ করে,—সরকারের সমালোচনা করে না, করলেও মোলায়েম ভাবে করে,—তাদেরকেই বিজ্ঞাপন দিয়ে ধন্য করা হয় অর্থাৎ তাদের বেঁচে থাকবার কিছু ক্যালোরির যোগান দেওয়া হয়। আর যেসব পত্রপত্রিকার মনোভঙ্গি অন্য কোটির, ধরুন বিপরীত কোটির—তারা বিজ্ঞাপনের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যেমন 'আলেখ্য' এই আমলে গেছে।

'আলেখ্য' যে পত্রিকা হিসাবে খুব বাজে তা অতি বড়ো নিন্দুকও বলবে না। কিন্তু তবে 'আলেখ্য' কেন বিজ্ঞাপন পাচ্ছে না? আলেখ্য'র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের মনঃপূত নয়। সারা বছরে 'আলেখ্য' এখন একটিও বিজ্ঞাপন পায় না, যেখানে সরকারের অনুগ্রহভাজন পত্রপত্রিকা প্রতিসংখ্যায় তিন-চারটি করে বিজ্ঞাপন পেয়ে বেশ বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে সরকারের এই প্রাতিকূল্যে আলেখ্য'র লোকসানের বোঝা ক্রমশ দুর্ভর হয়ে উঠছে তার পক্ষে। এখানেও কি এ-জাতীয় বিজ্ঞাপন দানের একটি অনুরূপ ট্রাইফাণ্ড থাকা উচিত নয়—যার মাধ্যমে সত্যকার যোগ্যতা অনুসারে পত্রপত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন বণ্টন করা হতে পারে?

ভলটেয়র রুশোকে বলেছিলেন: তোমার মতবাদ আমি সত্য মনে করিনা, গ্রহণযোগ্যও মনে করি না; কিন্তু তোমার মতবাদ যাতে অবাধে প্রচারিত হতে পারে তার জন্য আমি আপ্রাণ লড়াই করে যাব। ভলটেয়ারের সময় ফ্রান্সে গণতন্ত্র ছিল না, প্রায় সমস্ত ইয়োরোপ জুড়েই ছিল রাজতন্ত্র এবং বলা যায় একচ্ছত্র রাজতন্ত্র। তবু ভলটেয়ার একথা বলেছিলেন। আর আমাদের গণতন্ত্রী দেশের নায়করা? তাঁরা বিরোধী মত বিশ্বাস ও মনোভাবকে সম্পূর্ণ নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন না করতে পারলে নিশ্চিন্ত বোধ করেন না—সেই উদ্দেশ্যেই তাঁদের সব ক্ষমতা প্রভাব ও অর্থভাণ্ডার তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করে চলেন। একেই কি বলে গণতান্ত্রিক আদর্শ?

প্রকৃত গণতন্ত্র বলে, অপরের মতকে কখনো জোর জবরদস্তি ক'রে চাপা দেবার চেষ্টা করবে না, তাকে বোঝবার চেষ্টা করবে; ভ্রান্ত মনে হলে যুক্তি দ্বারা তার মোকাবিলা করবে; গায়ের জোরে নয়, চোখ রাঙিয়েও নয়, তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে তো নয়ই। কিন্তু এ রাজ্যে, ক্ষমতাসীনরা নানাভাবে চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে ও কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস করে ভিন্ন রাজনৈতিক ও

সমাজনৈতিক মতামতকে দাবিয়ে দিতে চাইছেন। শিল্পে সাহিত্যে পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে তাঁদের সেই স্বার্থবুদ্ধি যেমন কাজ করছে, তেমনি পত্রপত্রিকাকে সরকারী বিজ্ঞাপন বিতরণের ক্ষেত্রেও। সরকারী রাজকোষ, যা সর্বসাধারণের করের অর্থে গঠিত, তা কেবলমাত্র নিজেদের দলীয় স্বার্থে এভাবে ব্যবহার করা কি গণতান্ত্রিক রীতি নীতি সম্মত? অবশ্যই নয়। শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির পোষণ ও প্রোৎসাহনের উদ্দেশ্যে সরকারী সব অর্থব্যয়ই নিরপেক্ষ ট্রাষ্ট সংগঠন মারফত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিরপেক্ষ না হলে এসব সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ ক্ষতিকারক হওয়ারই সম্ভাবনা।

শুরুতে যা বলছিলাম, তাতে আবার ফিরে আসি। সব সাংস্কৃতিক ব্যাপারেই সরকারী মন্ত্রীদের ব্যতিক্রমহীন উপস্থিতি যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি অশুভ ফলধায়ী। সরকারী কর্তাদের ভজনা না করলে কোনো সাংস্কৃতিক কাজ কর্মই যেন সুসাধ্য নয়। মন্ত্রীদের উপস্থিতি ও বাণীসম্বর্ধিত না হলে যেন কোনো কিছুরই স্বীকৃতি নেই। এটা সাংস্কৃতিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই প্রচারসর্বস্ব যুগে সকলেই প্রচার চায় এবং মন্ত্রীদের উপস্থিতিই সবচেয়ে বড় প্রচারের উপকরণ। রেডিও, টি, ভি. খবরের কাগজ সব মাধ্যমেই, তার সাড়ম্বর প্রতিবেদন বের হবার প্রভূত সম্ভাবনা। অবস্থা এই রকমই দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু রেডিও, টি. ভি. খবরের কাগজরাই বা কেন এমন সরকারী কর্তাভজা হন? তাঁদেরও যে সরকারী প্রসাদ অপ্রসাদকে মান্য করে চলতে হয়। রেডিও আর টি. ভি-তো সরকারের তাঁবেদারই। খবরের কাগজকেও সরকারী কর্তাদের মন রেখে চলতে হয়, নইলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা। সব দিক দিয়ে সবকিছু এদেশে সরকারী ফাঁশে জড়িয়ে আছে। যাবো কোথায়? সরকারের এই সর্বত্র অনুস্যূতি এবং অতিপ্রভাবশালিতা আমাদের গণতন্ত্রকেও যেমন নিষ্ফল করছে, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকেও তেমনি অসুস্থ করে তুলছে।

টি. ভি. কাল্‌চার

টি, ভি, রেডিও, সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে আমরা এতদিন তেমন কিছু লিখিনি, যেহেতু দৈনিকে সাপ্তাহিকেই এসব প্রমোদ মাধ্যমের দৈনন্দিন পরিবেশনার সমালোচনা বেরিয়ে থাকে, আমাদের, ত্রৈমাসিক পত্রিকায়—তা নিয়ে তৎসাময়িক আলোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু কোনো প্রমোদ মাধ্যম

যদি ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে, তার সমালোচনা করতেই হয়—না করা অন্যায়। একথা বলিনা যে—টি. ভি.-র সব প্রোগ্রামই ক্ষতিকারক। অনেক প্রোগ্রাম আছে যা খুবই শিক্ষাপ্রদ তথা কৌতূহল উদ্দীপক ও রোচনীয়। টি, ভি-র মাধ্যমে আমরা সমাজের নানা স্তরের ও প্রান্তের মানুষের সঙ্গে, বিভিন্ন জীবিকা ও জীবনধারার সঙ্গে যেমন সহজে পরিচিত হতে পারি—সেটা অন্য কোনোরূপেই সম্ভব হোত না। এটা মস্ত লাভ। তাছাড়া ভালো গান বাজনা, ধ্রুপদী নৃত্যকলার প্রদর্শনী টি, ভি-তে যেরূপ উদারভাবে পরিবেশিত হয় তারও প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে। একমাত্র নাটক ও সিনেমার অঙ্গই টি, ভি-তে দুর্বল। বিলিতি ছবির সিরীয়ালের কথা বলছিনা—তা, যা দু একটি দেখানো হয়, খুবই বাছাইকরা উঁচুমানের জিনিষ। কিন্তু বাংলা আর হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে বাছাই করা'র হয়তো অবকাশ কম—ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়-এর সমস্যা হয়তো। তাই বাজে ছবিই অধিকাংশত দেখানো হয়ে থাকে। সিরীয়ালও যা দেখানো হয়, তাও প্রায়শঃ স্থূল রুচির, এবং অভিনয় ও টেকনিক্ সবদিকেই অপকৃষ্ট। নাটকও যা প্রদর্শিত হয়, তা-ও ২।১টি ছাড়া প্রায় সবই ক্লান্তিকর অক্ষমতার নিদর্শন।

কিন্তু তা নিয়ে খুব নালিশ করিনা। ভালো ছবি, ভালো নাটক, ভালো পরিচালক এতো আর সুলভ নয়। কাজেই মধু'র অভাবে গুড় পরিবেশিত হলে বেজার মুখে মেনে নিতেই হয়।

কিন্তু যেটাকে আমরা ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করি, তা হোল, নিতান্ত রুচিহীন ও রিরংসা-উদ্দীপক বিজ্ঞাপনের বাহুল্য। কলকাতার প্রথম 'চ্যানেল'-এ—দিল্লী থেকে প্রচারিত কার্যক্রমের ফাঁকে ফাঁকে—এত অজস্র বিজ্ঞাপনের মিছিল চলে যে, দর্শকের স্নায়ুর উপরে তার ক্রমপুঞ্জিত অভিঘাত বুদ্ধিবিনাশক হয়ে ওঠে। অল্পবয়সী টি, ভি, দর্শকের তো কথাই নাই। তাদের কেবল বিচার বুদ্ধির উপরেই নয়, তাদের মনে ক্রমাগত ঐসব বিজ্ঞাপন-প্রদর্শিত প্রায়-নগ্নিকা মডেলদের হাবভাব লাস্য-বিলাস ইশারাইঙ্গিত নাচগান চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবেই। তাদের যে কেবল ভোগবাদী 'কনজিউমারিষ্ট' করে তুলবে তাই নয়, তাদের মনে ক্রমাগত যৌনচাঞ্চল্য ঘটিয়ে তাদের সাধনার ব্যাঘাত ঘটাবে, শাসনে সংযমে জীবনের ভিত্তি রচনার সময়ে তাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করবে। এজাতীয় বিজ্ঞাপন থেকে টি. ভি-র অনেক আয় হয় জানি, কিন্তু উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ের মনে কুপ্রভাব সঞ্চার করে' জাতির মানব-সম্পদের যে-ক্ষতি করা হচ্ছে, তার মূল্য কোনো অঙ্কেই কুলোবে না। বিজ্ঞাপন

ছাড়া কি টি-ভি. চলবে না? টি. ভি.-উপভোক্তাদের উপর মাশুল বাড়িয়ে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া উচিত।

টি. ভি.-র আরেক জঞ্জাল হোল, 'চিত্রহার'-জাতীয় সিনেমা ছবির দৃশ্যসম্বলিত গানের মালিকা। হিন্দী সিনেমার গানই দশ-বারো আনা, তবে বাংলা বা অন্য ভাষার ছবির গানও কিছু হয়। আমাদের ভারতীয় ছবিতে—বিশেষ করে হিন্দী ছবিতে—গানের আধিক্য একটা শিল্পগত ত্রুটি বলেই গণনীয়। সেই ত্রুটির দিকটাকেই টি. ভি-তে প্রাধান্য দেওয়া হয় কেন: ত্রুটিটা যাতে চিরস্থায়ী হয়, তারই ব্যবস্থা করা?

কিন্তু আমাদের আপত্তি শুধু শিল্পগত দিক দিয়েই নয়। আরও বড় আপত্তি এই জন্যে যে, আমাদের সিনেমায় গানের দৃশ্যেই নায়ক-নায়িকার প্রণয়লীলা উচ্ছল হয়ে ওঠে, হিন্দী সিনেমায় তো একেবারে বেয়াড়াপনার চূড়ান্ত ঘটে। সেইসব দৃশ্যসম্বলিত গান, বা গানসম্বলিত দৃশ্য একটার পর একটা দেখিয়ে চলা কোন্ জাতীয় আনন্দ-বিধান? শুনি যে, এই চিত্রহার এবং ঐ গোত্রীয়—অনুষ্ঠানগুলি খুব জনপ্রিয়; বিশেষ, অল্পবয়সীদের কাছে। যা সবদিক দিয়েই দোষযুক্ত তারই আনুষ্ঠানিক পরিবেশন দ্বারা উঠতি প্রজন্মের শুধু রুচির বিকৃতিই ঘটানো হচ্ছে না, তাদের লালসা বহ্নিকেও উদ্দীপ্ত করে তাদের সর্বনাশ করা হচ্ছে।

তর্ক হতে পারে যে, প্রতি সপ্তাহেই যখন নিয়মিত একাধিক হিন্দী ছবি টি. ভি-তে দেখানো হয়ে থাকে, তখন এইসব 'চিত্রহার' 'চিত্রমালা' কী আর দোষ করলো। হিন্দী ছবির প্রচার বন্ধ করতে নিশ্চয় কেউই বলবে না? আমরাও ততদূর যেতে সাহস করিনা। তবে আমাদের বক্তব্য হোল: গোটা ছবির মধ্যে, আরও পাঁচরকম দৃশ্যাদির মধ্যে ঐসব প্রণয়গীতাভিনয় মিশিয়ে থাকে বলে' ওর কুপ্রভাবের তীব্রতা একটু হ্রাস পায়। কিন্তু কেবল ঐসব দৃশ্যেরই মাল্য রচনা করলে তার সমবায়ী প্রভাব একটু বেশী ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনা।

আমরা দূরদর্শন অধিকর্তাদের মনোযোগ এদিকে আহ্বান করছি। কিছু অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপনের আশু সংশোধন আবশ্যিক।

CENTRAL LIBRARY

যুদ্ধের ঘনঘটা

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কোনোদিনই মধুর ছিল না—মাঝে মাঝেই দুই পক্ষের সম্পর্কের তিক্ততা ঘোরতর যুদ্ধে পর্য্যবসিত হয়েছে—যেমন ১৯৪৭-৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১-৭২-এ। যুদ্ধ-মধ্যবর্তী সময়গুলো ও পারস্পরিক সন্দেহ ঘৃণা অবিশ্বাসে' থমথমে—বলা চলে, 'কোল্ড ওঅর"-এর বিভিন্ন পর্যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক এটাই চেয়েছিল এবং অত্যন্ত ধূর্ত্ত রাজনৈতিক চাল চেলে, জিন্নাকে দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের তুরুপের তাসটি সুকৌশলে খেলিয়ে, গোটা দেশটাকে সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জর ক'রে—সাম্প্রদায়ভিত্তিক দু'টি রাষ্ট্রে বিভাজিত ক'রে তারা শেষ পর্যন্ত বিদায় নেয়। ঠিক বিদায় নেয় না, পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ধূর্ত্ত রাজনীতির বিষাক্ত পরিণামটা দেখে আনন্দে নিজের পিঠ চাপড়ায়—বিভাজন-উত্তর দুই রাষ্ট্রই যেভাবে খাওয়া-খাওরি করে চলেছে, তাতে তারা কোনো দিনই পশ্চিমী শক্তিধর দেশগুলির সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না, চিরদিনই কামড়াকামড়ি করে উভয়ে উভয়কে দুর্বল ও নিষ্ফল করবে। আর দুর্বল হয়ে থাকবে বলেই সাম্রাজ্যবাদীরা আবার তাদের কোনো না কোনোভাবে কব্জাও করতে পারবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই দুরভিসন্ধি অনেকখানিই যে সফল হয়েছে, তাতে কোনো ভুল নেই। তিন-তিন বার লড়াই ক'রেও আশ মেটেনি, আবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে প্রতিস্পর্ধী হুঙ্কার ছেড়ে চলেছি আমরা : 'ও পক্ষ বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছে, তবে যুদ্ধ যদি ওরা বাধায়, তা হলে এবার ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব'—ভাষাটা এই জাতীয়।

আমাদের এই দুই রাষ্ট্রই পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম। যুদ্ধ অর্থই সহস্র কোটি টাকার অপব্যয়—অনেক অমূল্য জীবন ও সম্পত্তি হানিও বটে। অর্থাৎ এই দুই হতদরিদ্র দেশ আরও দরিদ্রতর হয়ে পড়বে। পশ্চিমী বড়লোক উন্নত দেশগুলো থেকে আরও প্রচুর ঋণ করতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে দেউলে হবার দশায় পৌঁছবে। তবু যে তাদের কাণ্ডজ্ঞান জন্মাবে—লড়াই-এর পথে না গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ক'রে বাস করার সুবুদ্ধি হবে, তাও বিশ্বাস হয় না। দেউলে হয়েও তাদের

তালঠোকাঠুকি চলতেই থাকবে, এবং পরের অধ্যায়ে আবার যুদ্ধও হয়তো বাধবে।

উপস্থিত, যুদ্ধের মানসিকতা উৎপন্ন হয়েছে কাশ্মীরকে নিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তান (অর্থাৎ এখনকার পাকিস্তান) পূর্ব-পাকিস্তান (অর্থাৎ এখনকার "বাংলা দেশ")-কে হারানোর শোক এখনো ভুলতে পারেনি। তাই উঠে পড়ে লেগেছে কাশ্মীরকে ভারতরাষ্ট্র থেকে ছিনিয়ে নিতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াতে জিন্না-প্রচারিত হয়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব, এবং মুসলমানমাত্রই একজাতি—এ তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত গেল। এখন মুসলমান-প্রধান কাশ্মীরের মুসলমানদের দিয়ে, তারা মুসলমান বলেই মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানই তাদের আপন রাষ্ট্র, ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গ থাকা তাদের পক্ষে দুঃসহ মর্মপীড়াদায়ক—এইটে কবুল করিয়ে নিয়ে, কাশ্মীরকে ছলে কিম্বা বলে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করাটা তাই পাকিস্তানের পক্ষে ভয়ঙ্কর আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। নইলে সেক্যুলারিজম-বিরোধী দ্বিজাতিতত্ত্বই যে আর টেঁকে না, এবং তা না টিঁকলে পাকিস্তানের অস্তিত্বেরই, raison d'etre-এর যুক্তিযুক্ততা থাকে না—জিন্না-পরবর্তী দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে সে-যৌক্তিকতা আরও বিতর্কিত ও অসার প্রতিপন্ন হয়ে যেতে পারে। পাকিস্তানের মৌলবাদীদের কাছে তাই কাশ্মীরকে যেকোনো উপায়ে—তাদের 'মুসলিম রাষ্ট্রের' সামিল করাটা ভারী জরুরী হয়ে পড়েছে। কাশ্মীরের অভ্যন্তরে তাদের মৌলবাদী শাখাপ্রশাখা, প্রচারক ও সন্ত্রাসবাদী চর হাজারে হাজারে এই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। ফল যে ফলেনি তা নয়। লোকের মনে মুসলিম মৌলবাদ অনেকটা সাফল্যের সঙ্গে প্রবিষ্ট করা হচ্ছে, হিন্দুবিদ্বেষ ও ভারতবিদ্বেষও নানা উপায়ে ছড়ানো হচ্ছে ;—সর্বোপরি সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে শুভ-বুদ্ধি সম্পন্নদের—নিষ্ক্রিয় করে দেওয়াও হচ্ছে। যেভাবে পাকিস্তান এই অপকর্ম সাধন ক'রে চলেছে তাতে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে শঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। নিজের দেশে পরের এই হস্তক্ষেপ ও অশান্তি সৃষ্টি কোনো রাষ্ট্রই সহ্য করে না। ভারত তাই পাকিস্তানকে শাসিয়ে বলেছে : এইসব অপকর্ম বন্ধ করো ; সন্ত্রাশবাদীদের প্রশিক্ষণদান ও অস্ত্রশস্ত্র সহ এদেশে হত্যা ও অন্তর্ঘাতের জন্য পাচার করা তা-ও অবিলম্বে বন্ধ করো—নইলে এই প্রচ্ছন্ন শত্রুতার জন্যে প্রকাশ্য যুদ্ধেই নেমে পড়তে হবে আমাদের।

কেবল কাশ্মীরেই পাক-অপকর্ম ও দুরভিসন্ধি নিবদ্ধ নয়। পাঞ্জাবেও

বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসকদের তারা ক্রমাগত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এক ঘোরতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কাজেই ভারতের উষ্মা অকারণ নয়। কিন্তু যুদ্ধের হুঙ্কার আরেকটু নীচু গ্রামে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

কিন্তু এও বলব যে, পাকিস্তানের মৌলবাদী যুদ্ধবাজদের একবিন্দু দূরদর্শিতা নেই। আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রে ভয়ঙ্কর বলীয়ান হয়ে উঠে তাদের দুঃসাহসী অপচেষ্টা অনেক বেড়ে গেছে। যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তানের আরও অঙ্গচ্ছেদ ঘটতে পারে, সিন্ধুপ্রদেশ ও বালুচিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে—কিছুই বলা যায় না। বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে, কিন্তু এ সম্ভাবনাটা তাদের অন্ধ মানসিকতায় আদপেই চোখে পড়ছে না। তাদের দুষ্কৃতি-প্রবণতায় একটুও ভাঁটা পড়েছে মনে হয় না।

তাই বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত আবার একটা যুদ্ধ বা খণ্ড যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। হলে সেটা খুবই শোচনীয় ব্যাপার হবে—দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষেই।

কাশ্মীর ও পাঞ্জাব

কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবে কয়েক বছর ধরেই যে-নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য বিধ্বংসী কাজকর্ম চলেছে, তা যে কোনো শুভচিন্তক মানুষের কাছে মর্মান্তিক উদ্বেগজনক। আমরাও বহুবার এ বিষয়ে—আমাদের ব্যাকুল উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস ও মাদক-পাচার এ দু'টিই সবচেয়ে বড়ো 'চ্যালেঞ্জ' হয়ে উঠেছে। এবং বহুক্ষেত্রে এ দুটি একযোগেও কাজ করছে। দক্ষিণ-আমেরিকায়, বিশেষতঃ কলম্বিয়াতে মাদক পাচার ও তৎসংক্রান্ত সন্ত্রাস এরূপ মহাশক্তিধর হয়ে উঠেছে যে, তাদের গায়ে হাত দিতে গেলে রাষ্ট্রতরণীই টালমাটাল হয়ে পড়ছে।

ভারতে মাদকপাচার সমস্যা এখনো সেরূপ তীব্র আকার ধারণ করেনি। কিন্তু রাজনৈতিক সন্ত্রাস এখানে ক্রমেই প্রচণ্ড আকার ধারণ করছে। বিভীষিকা-পন্থার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক ইচ্ছা জনগণের উপরে চাপিয়ে দেওয়া—মারাত্মক শতঘ্নী অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি এখন অতীব সহজসাধ্য হয়ে ওঠায়—অত্যন্ত লোভনীয় মনে হচ্ছে কারও কারও আছে। বিশেষ ক'রে তাদের কাছে, যারা বয়োধর্মে ও স্বভাবে উগ্রধর্মী। বুদ্ধি, বিবেচনা, দূরদর্শী বিচার-ক্ষমতা এখনো যাদের পরিণত হয়নি, কিন্তু নিজেকে অভ্রান্ত ও সর্বক্ষম মনে করার অহঙ্কার অত্যন্ত স্ফীত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের এরাই কাঁচা মাল।

অপেক্ষাকৃত কিছু প্রবীণও এদের পেছন থেকে উত্তেজনা জোগান দিচ্ছে, এদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজেদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অভীষ্ট সিদ্ধ করতে। এছাড়া আছে ভারতের ছোট বড় নানা শত্রুপক্ষ। সর্বোপরি আছে চীনের মহানায়ক মাওসেতুং-এর অত্যন্ত উত্তেজক বাণীর প্রেরণা : বন্দুকের নলই হোল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

কিন্তু উৎস বা নিদান যা-ই হোক, সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের যে দুটি রাজ্যে প্রাধান্য অর্জন করেছে,—পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে,—সেখানে তারা সরকারী প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এবং তাদের সৃষ্ট সন্ত্রাস তাদের অভিমত ফলও প্রসব করছে—সাধারণ মানুষ প্রশাসন অপেক্ষা সন্ত্রাসকদেরকেই বেশী মান্য করে চলেছে এবং বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কে অস্থির হয়ে—দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারী শাসন-যন্ত্র সন্ত্রাসকদের কার্যকরভাবে দমন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কিছু কিছু ধরা পড়লেও এবং পুলিশের হাতে মারা পড়লেও, তাদের সন্ত্রাসক কাজকর্মের গড়পরতা খতিয়ান ঠিকই থাকছে। এটা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনার কথা। নির্বাচনের ফলাফলও যে এই সন্ত্রাসকদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ও হবে এটাও সংশয়াতীত।

তা হলে কি রাষ্ট্রের এই দুটি অঙ্গের এই মারাত্মক দুষ্ট ক্ষত কোনো মতেই নিরাময় হবার নয় ? তা কখনোই বলব না। এই দুই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের সংযত করতে পারেন, ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে-থাকা তাঁদেরই সহধর্মীয়রা। ভারতের নানা রাজ্যে যে দশ-বারো কোটি মুসলমান রয়েছেন, তাঁরা যদি সমস্বরে কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ওঠেন এবং বলেন যে, তথাকথিত কাশ্মীরী মুক্তি-মোর্চাগুলির পাকিস্তানী জিগীর ও ভারত ও হিন্দুবিদ্বেষী কাজকর্ম, ভারতে অবস্থিত অগণিত মুসলমানদের শঙ্কার কারণ হচ্ছে—পাছে হিন্দুরা তাঁদেরও ভারতীয়ত্ব ও দেশপ্রীতিতে সন্দিহান হয়ে পড়ে। কাশ্মীরী মুসলমানদের এক ক্ষুদ্র অংশ যে ভারতের বিরাট মুসলিম সমাজকেই বিপন্ন করে তুলছে এটা তাঁরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। মনে হয় এরূপ প্রতিবাদের ফলে ঐ দুষ্টবুদ্ধি উগ্রবাদীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হতে পারে। সব যে একসূত্রে গাঁথা—এক অঞ্চলের দুষ্কৃতি অন্য অঞ্চলে বিপরীত ফল প্রসব করতে পারে এবং সে ফল ভয়ানক হতে পারেই। ভারতের নানা রাজ্যে শান্তিতে অবস্থিত ও বিভিন্ন লাভজনক রুজি রোজগারে নিরত অসংখ্য শিখভাইয়াও যদি অনুরূপ শঙ্কিত প্রতিবাদ তোলেন এবং পাঞ্জাবের উগ্রবাদী

কার্যকলাপ যে তাঁদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে এই সত্য সম্বন্ধে তাদের অবহিত করতে পারেন, তা হলে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীরাও নিশ্চয়ই সংযত হবে। কোনো কিছুরই কুফল এক জায়গায় আবদ্ধ থাকতে পারে না, তা পরিণামে সমস্ত দেশেই সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে ভয়ঙ্কর সর্বনাশে গিয়ে শেষ হতে পারে। দুষ্কৃতিকারীদের এ সম্বন্ধে চেতিত করতে হবে। ভারতের মুসলমান এবং শিখভাইরাই তা পারেন। তাঁরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হোন। এটা করা তাঁদের আবশ্যিক কর্তব্যও।

পূর্ব ইয়োরোপের রঙ্গমঞ্চ

পূর্ব ইয়োরোপের ঘটনাবলী—কম্যুনিজ্‌ম্ বর্জন ক'রে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আগ্রহণে দ্রুত পদে এগিয়ে চলেছে। কম্যুনিষ্ট একদলীয় চিরস্থায়ী শাসনব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি আর কারোই পছন্দ নয়। জাগ্রত জনমতের চাপে সর্বত্র এই উভয় অচলায়তনই অপসৃয়মান—এমন কি খোদ সোভিয়েট রাশিয়াতেও পেরেস্ট্রয়কা-গ্লাসনস্ত-এর আবহাওয়ায় এই দুই ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক সংস্কারের দাবি খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্য সেখানে এখনো কম্যুনিষ্টদের একদলীয় শাসনই চালু আছে কিন্তু পেরেষ্ট্রয়কার নিজস্ব যুক্তিতে মুক্ততর আর্থব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততর গণতন্ত্রও অবশ্যম্ভাবী এবং অপ্রতিরোধ্য।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের উত্তর সীমান্তবর্তী তিনটি প্রদেশ (বা সোভিয়েট) লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্টোনিয়া—ইতিমধ্যে এক রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ঐ তিনটি রাজ্যই সোভিয়েটতন্ত্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। তারা বলছে যে, ১৯৩৯-এ, সোভিয়েট-স্বার্থে, ষ্ট্যালিন তাদের স্বাধীনতা হরণ করে', গায়ের জোরে তাদেরকে সোভিয়েটতন্ত্রের অঙ্গীভূত ক'রে নেয়। সোভিয়েটের গরজ আর গায়ের জোরকে বাধা দেবার সাধ্য তাদের ছিল না: সেই দুই বিঘা জমি'র কাহিনী আর কি—"বাপু করেছি বাগানখানা —পেলে দুই বিঘে, প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা", কাজেই তোমার ঐ দুই বিঘে জমি আমাকে দিতেই হবে। না দিলে জোর ক'রে কেড়ে নেবো। একই যুক্তিতে ষ্ট্যালিন কেড়ে নেয় ওদেরও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা হারানোর দুঃখ এই একান্ন বছরেও ঐ তিন রাজ্য ভুলতে পারেনি। পৃথিবীর সর্বত্র মুক্ত আবহ দেখে, তারাও নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেছে। এখন প্রেসিডেন্ট গরবাচভের হয়েছে ভারী মুস্কিল। ঐরূপ যুক্তিতে জর্জিয়া ইউক্রেইনও বেরিয়ে যেতে পারে। আজ.ারবাইজ.ান, উজবেকিস্তানরা

তো মুখিয়েই আছে। বিপুলদেহ সোভিয়েট সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তদেশীয় প্রায় সব রাজ্যই গায়ের জোরে স্বাঙ্গীকৃত—যদিও বেশীর ভাগই হয়েছিল জ.ারের আমলে। কিন্তু জ.ারের স্থলে গদীয়ান সোভিয়েট কম্যুনিষ্টতন্ত্রেরও সাম্রাজ্যে কোনো অরুচি নেই। তারা জ.ার-অর্জিত সাম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা প্রত্যর্পণে আগ্রহী না হয়ে, তাদের সবগুলিকে সোভিয়েটতন্ত্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করে নেয়। এখন সেই সব প্রত্যন্তভূভাগশায়ী অঙ্গরাজ্যগুলি আবার তাদের অপহৃত স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কেবল ঐ তিন বালটিক রাজ্যই নয়, জর্জিয়া, ইউক্রেইন, অ্যাজ.ারাইজান—এই সব রাজ্য ও।

ভয়ঙ্কর সমস্যা! এ রকম সঙ্কটে আর কখনো পড়েনি সোভিয়েটতন্ত্র। একবার স্বাধীন হবার অধিকার স্বীকার ক'রে নিলে, খোদ রুশ ভূখণ্ড ছাড়া আর কিছুই থাকবে না হয়তো। তাই প্রেসিডেন্ট গরবাচভ লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি বালটিক রাজ্যত্রয়ীর স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করেন নি। নানাবিধ ভয় দেখাচ্ছেন ও অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ জারী করেছেন তাদের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত জল কোথায় গিয়ে ঠেকে কিছুই বলা যায় না। রাশিয়ার অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চাপ, বাইরে বিচ্ছিন্নতার এই প্রবণতা—এই দুই অভিকর্ষে রাশিয়ার সোভিয়েটতন্ত্র কোন্ রূপ নেবে, বলা কঠিন।

"কাটিন" (Katyn) জঙ্গলের হত্যা-রহস্য

ষ্ট্যালিনের আরেক সাংঘাতিক অপকর্ম সম্প্রতি প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্বে, ষ্ট্যালিনের আদেশে পোল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীর বাছা-বাছা বারো হাজার সমরনিপুণ সেনানী অর্থাৎ উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে রুশ পোল্যাণ্ড সীমান্তের 'কাটিন' নামক জঙ্গলের মধ্যে গোপনে কবরস্থ করা হয়। পোল্যাণ্ড যখন এদের অদৃশ্য হওয়া নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে, ষ্ট্যালিন তখন নাৎসী জার্মানীর উপর এদের নিশ্চিহ্ন করার দায় চাপিয়ে দেয়। কিন্তু যুদ্ধের পরে অনেক সন্ধানেও পোলিশ সরকার জার্মানদের নথিপত্রে এরূপ হত্যাকাণ্ডের কোনো সমর্থন পায়নি। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকে তারা ষ্ট্যালিনের প্রতিই তাদের সন্দেহ ব্যক্ত করে, কিন্তু এতকাল রাশিয়া এ নিয়ে কোনো অনুসন্ধান চালানোর চেষ্টা করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিক 'গ্লাসনস্ত' বা মুক্ত জনমতের পরিমণ্ডলে রাশিয়াতেই ষ্ট্যালিনের আরও বহু জঘন্য অপরাধের প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে এই 'কাটিন'

জঙ্গলের হত্যাকাণ্ডের সত্যও বেরিয়ে পড়েছে। ষ্ট্যালিনেরই আদেশে বেরিয়া ইত্যাদি সহযোগীরা গোপনে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে। উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া অধিকৃত পোল্যাণ্ডে কোনো প্রকার বিদ্রোহ না ঘটে, তাই সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কৃতী অফিসারদের গোপনে নিশ্চিহ্ন করে' দেওয়া, এবং নাৎসী-বর্বরতাকে দায়ী ক'রে নিজেদের গা-বাঁচানো। এই হোল ষ্ট্যালিনী বর্বরতার ও দুষ্কৃতির আর একটি লোমহর্ষক নমুনা! আশ্চর্য, যে ভারতের কম্যুনিষ্টদের মধ্যে এখনো নাকি অনেক ষ্ট্যালিন-পূজক আছেন! তারা এই অপকর্ম সম্বন্ধে মুখ খুলবেন কি?

রুমানিয়ায় কী ঘটেছিল?

রুমানিয়ায় কি সত্যই গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল? কিংবা চেসেস্কুর সহযোগীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি palace coup বা প্রেসিডেণ্টকে সরিয়ে অনুগামীদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের ঘটনা? প্যারিসের সংবাদপত্রে ও টি. ভি. -মাধ্যমে এ নিয়ে নানা মন্তব্য বের হচ্ছে। খুব সম্ভবতঃ যা ঘটেছিল তাকে 'প্যালেস কু্য'-ই বলা সঙ্গত হবে—কারণ এখন যারা ক্ষমতার মসনদে দখলকার, তারা প্রায় সকলেই ছিল চেসেস্কুর অনুগত সহযোগী। তারা কৃত্রিম উপায়ে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে এবং প্রতিবাদী জনগণের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কয়েকশো মানুষ হত্যা করে এবং জনসাধারণকে চেসেস্কুর বিরুদ্ধে এইভাবে ক্ষেপিয়ে দেয়। পরে পলায়নরত চেসেস্কুকে গ্রেপ্তার ক'রে এরাই তাঁর দ্রুত 'গণবিচার' সমাধা ক'রে পত্নীসহ চেসেস্কুকে গুলি করে হত্যা করে। জনগণ উল্লসিত হয়ে ভাবে মস্ত বিপ্লব হোল।

চেসেস্কুর এইসব প্রাক্তন সহকর্মী ও অনুগামীরাই পরে 'ন্যাশনাল সলভেশন ফ্রণ্ট' নামক রাজনৈতিক মোর্চা গঠন ক'রে শাসন ক্ষমতায় গিয়ে বসে এবং ইয়ন ইলিয়েস্কু নামে চেসেস্কুর এক ঘনিষ্ট সহযোগীই এই অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্রপতি হন। রোমানিয়ার বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর সব ঘটনাই খুব গোলমেলে। নানা উল্টোপাল্টা খবর আসছিল সেখান থেকে। যা হোক সেখানে সম্প্রতি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এই প্রথম স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোল (২০. ৫. ৯০)। কিন্তু এই 'মুক্ত নির্বাচনে' দেখা যাচ্ছে ন্যাশনাল ফ্রণ্টের প্রার্থীরাই গরিষ্ঠতা লাভ করেছে' এবং ইয়ন ইলিয়েস্কু শতকরা ৮০ ভাগের উপর ভোট পেয়ে ঐ দেশের নতুন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। রোমানিয়া এখনো একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই রইলো।

নেপালে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন

মনে হয় বছর পঁচিশ-ত্রিশ আগে নেপালাধীশ বীরেন্দ্র তাঁর রাজ্যে দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দলহীন আধা-গণতন্ত্র চালু করেন, যার মূল কথা হোল নেপালী পার্লামেণ্ট (বা রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত) ৮০% দলহীন নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি এবং ২০% নেপালাধীশ মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হবে; কিন্তু সব ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে নেপালাধীশের। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের রাজাই মনোনীত করতেন। এবং তাঁদের চূড়ান্ত জবাবদিহি ছিল রাজার কাছেই, রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতের কাছে নয়। এইভাবে চলছিল মন্দ নয়। গণতান্ত্রিক আত্মশাসনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করছিল জনগণ। বহুশত বৎসরের রাজকীয় সম্মান ও মর্যাদাও রাষ্ট্রের স্থিতি ও শান্তি সুনিশ্চিত করছিল।

কিন্তু সমস্ত পৃথিবীময় গণতন্ত্রের জোয়ার সুরু হওয়ায় নেপালের জনগণও ঐ বহুদলীয় গণতন্ত্ররূপ দিল্লীকা লাড্ডুর জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরাও তাদের তাতিয়ে তুললেন—তাঁদের occupation বা ক্ষমতার মঞ্চ দখলের খেলা যে বহুদিন বন্ধ ছিল। ভারতের নয়া শাসক দলেও তাঁদের মদতদার জুটে গেল। জনতা-দলের চন্দ্রশেখর তার মধ্যে সক্রিয়তম। ফলে নেপালে সুরু হোল গণবিক্ষোভ। মাসাধিক কাল ধরে সেই বিক্ষোভের ঢেউ নানা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, জনতা-পুলিশে সংঘর্ষ শতাধিক প্রাণহানি—এইভাবে তুঙ্গ থেকে তুঙ্গতর হচ্ছিল। অবশেষে নেপাল-নরেশ বীরেন্দ্র নতিস্বীকার করে জনগণের দাবি, বহুদলীয় গণতন্ত্র, সর্বক্ষম পার্লিয়ামেণ্ট এবং পার্লিয়ামেণ্টের কাছে দায়িত্বশীল সরকার ইত্যাদি সবকিছু স্বীকার করে নিলেন। এমন কি রাজকীয় সব বিশেষাধিকার বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মতো একটা অনুষ্ঠানসর্বস্ব অস্তিত্বে পর্যবসিত হতেও রাজী হলেন। নেপালে তাই পুরোদস্তুর গণতন্ত্রই চালু হতে চলেছে। গণতান্ত্রিক 'কন্‌ষ্টিট্যুশন'-ও বিধিবদ্ধ হতে চলেছে। কোনো ভুল নেই যে, নেপালের 'আধুনিক' যুগ সুরু হোল।

উপায় নাই—সবাই দিল্লীকা লাড্ডু খেতে চায়,—না খেয়ে নিবৃত্তি নেই। তবে এর ফলে সুখ যে বেশী হবে নেপালবাসীদের—এটা বলার মতো সাহস কিন্তু আমাদের নেই।

আম্বেদকরের 'ভারতরত্ন'ত্ব

ড. ভীমরাও আম্বেদকর প্রায় ৩৪ বৎসর হোল গত হয়েছেন। হঠাৎ তাঁকে এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' উপাধিদান বর্তমান 'জনতা' সরকারের এক উদ্ভট কীর্তি। এইভাবে তাঁরা তানসেন কিংবা কৌটিল্যকেও 'ভারতরত্ন'ত্বে বিভূষিত করতে পারেন। অবশ্য যদি তেমন গরজ বোঝেন। এক্ষেত্রে গরজ ছিল—'তপশিলী' জাতি-উপজাতিদের হৃদয় এবং আস্থা ষোল আনা অর্জন ক'রে, তাদের ভোট-ব্যাঙ্কটি নিজেদের পক্ষে সুনিশ্চিত করা। কংগ্রেস শুধু বকেয়া চাকরিগুলিই পাইকারী হারে দেওয়া সুরু করেছিল। এঁরা তাদের উপরেও এককাঠি উঠলেন—আম্বেদকরকে 'ভারতরত্ন' বলে ঘোষণা করলেন এবং এক বছর আগে থেকেই তাঁর শতবর্ষ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানাদি সুরু করে দিলেন। এবং তৎসহ 'মণ্ডল-কমিশন'-এর সুপারিশগুলিও তাঁরা কার্যকর করবেন বলেও ঘোষণা করলেন। সরকারী চাকরির শতকরা ৫২টিই এখন থেকে তপশিলী ও পশ্চাদ্‌বর্তী শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে মনে হয়।

ভোটের বাক্সের দিকে তাকিয়ে যাঁরা তাঁদের 'পলিসি' নির্ধারণ করেন, সে সরকার কখনোই দূরদর্শী হতে পারে না। এবং অদূরদর্শিতার ফল ভালো হয় না।

বানতলার বীভৎস ঘটনা

কলকাতার উপকণ্ঠে তিলজলা থানার অন্তর্গত বানতলা গ্রামে গত ৩০. ৫. ৯০ সন্ধ্যাবেলায় যে পৈশাচিক ব্যাপার ঘটে গেল তার অনুরূপ কিছু এর আগে আর পশ্চিমবঙ্গে ঘটেনি—নক্‌শাল আন্দোলনের সময়েও নয়। একটি সরকারী মোটরভ্যানে তিনজন উচ্চবর্গীয় মহিলা কর্মচারী, সরকারী পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের কাজে গোসাবা থেকে ফিরছিলেন। বানতলায় একদল গুণ্ডা তাঁদের গাড়ীর পেছনে দলবদ্ধভাবে ধাওয়া করে এবং পরে তাঁদের ঐ গাড়ী থেকে টেনে বের করে। তারপর তাঁদের প্রত্যেককে, এবং ঐ গাড়ীর চালককেও, এমন সাংঘাতিকভাবে পেটায় যে তাঁরা সকলেই অজ্ঞান হয়ে যান। মহিলাদের গায়ের সব গয়না এবং পরিধেয় শাড়ীও কেড়ে নিয়ে সেই গুণ্ডাদল ঐ সরকারী গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। পরে পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে আসে এবং ঐ আহত চার জনকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁদের একজন (শ্রীমতী অনিতা দেওয়ান—পরিবার পরিকল্পনার ডেপুটি ডিরেক্টর) অনতিকাল পরেই

মারা যান। বাকী তিনজনের অবস্থাও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়। দুইদিন পরে গাড়ীর চালক অবনী নাইয়াও হাসপাতালে মারা যান। অপর দুইজন মহিলা সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করছেন বলে জানা গেছে।

কিন্তু পুলিশ এঘটনার কোনো কুলকিনারা এখনো করতে পারেনি। তবে দেশের সমস্ত মানুষ এঘটনার নৃশংস বর্বরতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে গুণ্ডাশাহি যে এখন কোন্ নিরঙ্কুশ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, তা দেখে কেবল মহিলারাই নয়, সকলেই আতঙ্কিত। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে অপরাধীদের খুঁজে বের করতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঘটনার একটা বিচারবিভাগীয় তদন্তেরও আয়োজন করা হয়েছে।

তদন্তের ফলাফল যাই হোক, আমরা শুধু ভাবছি পশ্চিমবাংলার মানুষের এতখানি নৈতিক অবনতি ঘটলো কী করে? আগেকার দিনে ঠ্যাঙ্গারেরা যেভাবে নির্জন মাঠের মধ্যে, পথিকদের খুন করে'—সব টাকাকড়ি জিনিষপত্র কেড়ে নিত, আজকের দিনে কলকাতার উপকণ্ঠেও ঠিক তা-ই ঘটতে পারে, কেউ কি দুঃস্বপ্নেও তা কখনো ভেবেছিল? আমরা বাঙ্গালীরা স্ত্রীজাতির প্রতি সহজেই সম্ভ্রমশীল, নারীর সম্মানকে সর্বাগ্রে স্থান দিই—এরূপ অহঙ্কার আমাদের ছিল। এ-ঘটনায় তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আরেক কথা। দলীয় রাজনীতির কল্যাণে গুণ্ডাদের প্রতাপ এরাজ্যে এতই বেড়ে গেছে—এবং সেই অনুপাতে পুলিশের ক্ষমতা এতই কমে গেছে—যে, কেবল সাধারণ মানুষ নয়, সরকারী কর্মচারীদেরও আজ আর কোনো নিরাপত্তা নেই। এটাও এঘটনায় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু এরাজ্যের পুলিশ-মন্ত্রীও বটেন। এরূপ ঘটনার নৈতিক দায়িত্ব যে তাঁর উপরই গিয়ে অর্শায়, তা অস্বীকার করা যায় না। তিনি এর নৈতিক দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে পদত্যাগ করলে, তাঁর নিজের ও তাঁর দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হতো। (১৩. ৬. ৯০)

গ্রন্থসমীক্ষা

বঙ্কিম সন্ধিৎসা ।। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ।।

পুঁথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড

৯ এ্যান্টনি বাগান লেন কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জুল, ১৯৮৯ ॥ পৃঃ ১৬৬+১৬ ॥ মূল্য : ৩৫·০০

টলস্টয়—জীবন সাহিত্য শিল্পজিজ্ঞাসা ।। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ।।

আবাহনী : ১১, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯ ।।

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮৯ ॥ পৃঃ ১৬৮ ॥ মূল্য : ৩৫·০০ ॥

বাংলা উপন্যাসের একযুগ ।। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ।।

প্রভা প্রকাশনী : ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা ॥

প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থমেলা : ১৯৮৯-৯০ ॥ পৃঃ ১২৪ ॥ মূল্য : ৩০·০০ ॥

আমরা সমালোচনার-জন্য প্রাবন্ধিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ মহাশয়-এর সম্প্রতি প্রকাশিতই তিনখানি বই পেয়েছি। দ্বিজেনবাবুর লেখার সঙ্গে আলেখ্য'র পাঠকবর্গ দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত। মননশীল 'সীরিয়াস' প্রাবন্ধিক রূপে তিনি বাংলার সারস্বত সমাজেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। আমরা স্বল্প পরিসরে বই তিনখানির কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

গ্রন্থ তিনটি সাহিত্যবিষয়ক হলেও তাদের মধ্যে প্রসঙ্গ-সাম্য নেই। প্রথম বইটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টির উপজীব্য মহান রুশসাহিত্যিক টলস্টয়, এবং তৃতীয়টি, রবীন্দ্র-শরৎ-উত্তর যুগের চারজন বড়ো ঔপন্যাসিককে নিয়ে আলোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র যদিও বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম পুরুষ সে অনুপাতে তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি—এটা দুঃখজনক হলেও স্বীকার না করে উপায় নাই। মহত্তর প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে অনেক বেশী মনোযোগ ও আলোচনা আকর্ষণ করেছেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের অতিবিস্ময়. বঙ্কিমের প্রতি আমাদের ঈষৎ অন্যমনস্ক করেছে, রবীন্দ্রউদ্ভাস বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুটা আবৃত করে থাকবে। তাছাড়া বঙ্কিম যাকে বলে আপাতলোভন বা প্রথম দর্শনেই মনোহারী ন'ন। ধীরে ধীরে তাঁর

গভীরে প্রবেশ করতে হয়, পরে দেখা যায় তাঁর গভীরতা অতলস্পর্শ। তাঁর দার্ঢ্য, তাঁর পৌরুষ ধীরে ধীরে আমোদের আশ্বস্ত করে, অন্তরে বল সঞ্চার করে ; আমরা তাঁর বিশাল হৃদয় মস্তিষ্ক ও দূরবিসর্পী আর্ষ দৃষ্টির প্রসাদ লাভ ক'রে উন্নততর, বলিষ্ঠতর মনুষ্যপদবীতে যেন সমারূঢ় হই,—অন্ততঃ বলিষ্ঠতর জীবনের জন্ত পিপাসিত হই। কিন্তু সাগরের মতো বিশাল ও গভীর হলেও এবং উত্তুঙ্গতা ও দার্ঢ্যে হিমালয় সদৃশ হলেও বঙ্কিম সহজ-রমণীয় ন'ন। তিনি পরিশ্রমের দ্বারাই অর্জনীয়, সশ্রদ্ধ অনুশীলনের দ্বারাই আয়ত্তগম্য ; কেবল নিবিষ্ট মননের দ্বারাই তাঁর মহত্ত্ব অনুধাবনীয়।

কিন্তু এ যুগে বঙ্কিম অনুশীলনের পক্ষে বাধা অনেক। সবচেয়ে বড় বাধা এসেছে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে। স্বদেশী আন্দোলনের কংগ্রেসী আমলে, নীতিহীন আপোশরফাই আমাদের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। সেই সুবিধাবাদী মনোভাব থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গেও কংগ্রেস আপোষ করে, —খিলাফৎ নিয়ে এবং অন্তত্রও। ইংরেজের উস্কানীতে সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের দাবি ও আবদার পর্দায় পর্দায় উঠতে থাকে। কংগ্রেসও মৃদু প্রতিবাদ ক'রে কেবলই সেসব আবদার মেনে নেয়। আপোষ রফাই নীতি হয়ে দাঁড়ালে তা হতে বাধ্যও। সেই সময় সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের তরফে আপত্তি ওঠে 'বন্দে মাতরম' নিয়ে—যেহেতু তার মধ্যে স্বদেশকে দেবী দুর্গারূপে কল্পনা করা হয়েছে,—কাজেই ও-সঙ্গীত পৌত্তলিকতাগন্ধী এবং মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনাকে আঘাত করে : সেইহেতু এ সঙ্গীতকে তারা জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণ করতে পারে না। কংগ্রেসী নেতারা তখন অভ্যাস মতো মৃদুস্বরে কিছু প্রতিবাদ ক'রে শেষে মেনে নিলেন যে, ঐ সঙ্গীতের যে-অংশে স্বদেশকে দেবী দুর্গারূপে কল্পনা করা হয়েছে, অর্থাৎ 'ত্বংহি দুর্গা' থেকে পরবর্তী সব অংশটুকু, ছেঁটে দিয়ে গাইলেই চলবে। তাতে শ্যামও রাখা হোল, কুলও রাখা হোল। স্বদেশী আন্দোলনে যে-সঙ্গীতের মহনীয় ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা চিরস্মরণীয়, সেই অসাধারণ দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের চৌদ্দ আনা বাদ দিয়ে দু' আনা মতো রেখেই নেতারা সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তাতে কি শ্যাম থাকলো ? না। শেষ-মেশ ইংরেজদের কূট কৌশলই জয়ী হোল : তাদেরই প্রশ্রয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা এমন উৎকটরূপ ধারণ করলো যে প্রায় সমস্ত মুসলমানই কংগ্রেসের নেতৃত্ব অস্বীকার ক'রে মুসলিম লীগকেই তাদের একমাত্র নেতা ও মুখপাত্র বলে স্বীকার করে নিল। ক্রমাগত আপোষ রফা ক'রেও কংগ্রেস শেষ রক্ষা করতে পারলো না। ভারতকে ত্রিখণ্ডিত ক'রে, দুই মুসলিম গরিষ্ঠ

অঞ্চল মুসলিমলীগকে দিয়ে, বাকী অংশ (অর্থাৎ হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চল) কংগ্রেসকে দিয়ে ইংরেজ হাসতে হাসতে বিদায় নিল।

কিন্তু ঐ আপোষ রফার মজ্জাগত মনোবৃত্তি কংগ্রেসের পক্ষেও যেমন, এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি ভয়ানক ক্ষতিকর হয়েছে। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত-স্রষ্টা বঙ্কিম হিন্দু সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানরা—তারাই তখন সর্বত্র প্রবল—কেবল 'বন্দেমাতরম্' নয়, বঙ্কিমকে তাঁর আনন্দমঠের জন্যও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালো। বঙ্কিম নাকি মুসলমান বিদ্বেষী বলেই ঐ উপন্যাস লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, বঙ্কিমের তামাম সাহিত্য, সব উপন্যাস প্রবন্ধ নিবন্ধ রসরচনা ইত্যাদি সবকিছুই নাকি মুসলিম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, কাজেই বঙ্কিম মুসলমানদের কাছে অপাঠ্য।

ইংরেজ যা করতে চেয়েছিল তা সিদ্ধ করে তারা চলে গেছে। কিন্তু সেই আপোষরক্ষার ভূত আমাদের ঘাড় থেকে আর নামছে না। আমাদের মধ্যে অনেকের এখনো বঙ্কিম সম্পর্কে কিন্তু-কিন্তু ভাব যায় নি। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা-বাদী বঙ্কিমকে নিয়ে এই 'সেকুলার' ভারতরাষ্ট্রে বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক? অর্থাৎ মুসলমানরা যখন বলেছে, বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক, তখন তাদের কথাই শিরোধার্য, বঙ্কিমকে হিন্দু-সাম্প্রদায়িক বলে স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং বঙ্কিমের অবিসম্বাদী মহত্ত্ব বিসম্বাদী হয়ে ওঠে, তাঁর স্মরণ মনন অনুশীলন একটু সঙ্কুচিত হলেই ভালো হয়।

পলিটিক্স্ যে জাতির মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে এবং ন্যায়-অন্যায়ের বোধকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, তার কাছে অন্য কী আর প্রত্যাশা করা যায়?

বঙ্কিমের খ্যাতির উপর আরেক অপচ্ছায়া পড়েছে, যার উৎস আমাদের অতিপ্রগতিমনস্কতা। এই মনোভাব স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে—বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে—খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রগতিই তাদের কাছে উপাস্য এবং যে-কোনো কিছুর মান যাচাই-এর কষ্টিপাথর স্বরূপ। এই প্রগতি বস্তুটির আমদানি ঘটেছে মার্ক্সবাদ থেকে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবাদ। এই 'বাদে' ধর্ম ব্যাপারটাই ভূয়া, সেকেলে, এবং যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল তার প্রতীক। তাই যেহেতু বঙ্কিম শেষের দিকে বড় বেশী ধর্ম-ধর্ম করেছেন এবং শুধু 'ধর্মতত্ত্ব' 'দেবতত্ত্ব' 'কৃষ্ণ চরিত্রই' লেখেননি, তাঁর ধর্মমতকে উপন্যাসের মধ্যে দিয়েও প্রচার করেছেন—যেমন 'আনন্দমঠ, 'দেবীচৌধুরানী' এবং 'সীতারাম' এ—তাই তিনি 'প্রগতি'র বিপরীতমুখী, ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি

সম্পন্ন এবং প্রগতিবাদীদের দ্বারা নিয়ত ধিক্কারণীয়। তারপর দেখ, বঙ্কিম কেন তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন? এও কি তাঁর প্রতিক্রিয়াশীলতাই প্রমাণিত করে না? সাম্য আর প্রগতি তো সমার্থক!

কোনো কিছুকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখবার এমন অপারগতা, এমন তোতাপাখিবৃত্তি, ইদানীংকার বাঙ্গালী ছাড়া আর কোথাও মিলবে না। মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মতো ধর্মের আস্পৃহাও তার মানবস্বভাবগত সত্য। মানুষ যখন থেকে মানুষ, পশুত্ব থেকে মানবতায় অগ্রসর, সেই আদিমতম পর্যায় থেকেই সে ধর্মীয় আবেগে আন্দোলিত, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নিরত হয়েছে। এবং কোনো প্রকার ধর্মভাবনা ও ধর্মানুষ্ঠানের সংস্পর্শহীন জীবন তার কাছে মূল্যহীন ও অর্থহীন। আজকের সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তাকালেই সে সত্য ধরা পড়ে। সত্তর বছরের কম্যুনিষ্ট শাসনে ও শিক্ষায় ধর্মব্যাপারটা জঘন্য পাপরূপে গণ্য করার কড়া নির্দেশ শুনে ও পাঠ গ্রহণ করেও এবং মন্দির গীর্জা উপাসনাগৃহের প্রায় সার্বিক অবলোপ এবং সর্ববিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিষিদ্ধকরণ সত্ত্বেও, বর্তমান গ্লাস্নস্তের মুক্ত আবহাওয়া সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত জনগণের মধ্যে গীর্জা ও উপাসনা গৃহে যাবার উৎসাহ প্রচণ্ড উদ্দীপনায় ফিরে এসেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার মতো ধর্মীয় স্বাধীনতাও যে লোকের একান্ত প্রাণের জিনিষ তা সারা সোভিয়েত দেশে শতলক্ষকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে ধর্মের আকাঙ্ক্ষাকে মানবস্বভাব থেকে উৎপাটিত করা যায় না। মানবপ্রকৃতির মধ্যেই তার মূল। ধর্মকে যারা অন্ধ কুসংস্কার বলে মনে করে তারা নিতান্ত অপরিণত মতিবুদ্ধির পরিচয় দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশে ধর্মবিরোধিতাই তথাকথিত প্রগতিবাদের তকমা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এইসব অন্তঃসারহীন বাচালতাই উন্নত চিন্তাভাবনার অভিজ্ঞান রূপে বিবেচিত হচ্ছে।

ঈদৃশ অপরিণতমনস্ক, ধান্ধকরাবুলিসর্বস্ব বাচালরাই বঙ্কিমকে সেকেলে ও প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে জনমানসে বঙ্কিম অনীহা সৃষ্টির কাজে সচেষ্ট। এইসব বিভিন্ন গোত্রের বঙ্কিম বিদূষকদের অধ্যবসায়ী অপপ্রয়াসকে প্রতিহত করার কাজে যে কয় জন লেখক এখনো নিরত আছেন, আলোচ্য গ্রন্থত্রয়ের লেখক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ তাঁদের অন্যতম। তাঁর "বঙ্কিম-সঙ্কিৎসা" গ্রন্থটি এদিক দিয়ে একটি উল্লেখ্য সংযোজন। বঙ্কিমচন্দ্রকে নানা দিক থেকে সম্যক বিলোকনের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'উপক্রমণিকা' অধ্যায়ে বঙ্কিমের জীবন-

আলেখ্য নিয়ে বিচার করা হয়েছে। বঙ্কিম প্রতিভার স্বরূপ ও বিকাশের কী কী সূত্র ও স্বাক্ষর সেখানে মেলে লেখক তার সন্ধান করেছেন। পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা, ইতিহাস-জিজ্ঞাসা, সমাজ-জিজ্ঞাসা, সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, ধর্ম-জিজ্ঞাসা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেখক। শেষ অধ্যায়টি উপসংহার : এখানে সব জিজ্ঞাসার মীমাংসাগুলি সমন্বিত করার চেষ্টা হয়েছে।

বঙ্কিম বিরাট প্রতিভা, তাঁকে সম্যক ভাবে দর্শন ও প্রদর্শন করা খুবই কঠিন কাজ। বঙ্কিম যে কতো দিকে কতো অসাধ্য সাধন ও কি অসাধারণ সিদ্ধি অর্জন করে গেছেন তা পাঠকসাধারণের কাছে তুলে ধরা দরকার। বঙ্কিম কেবল মহৎ ঔপন্যাসিক ন'ন, কিম্বা কেবল ধর্ম-শিক্ষক ন'ন। সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি নিয়েও তিনি কতো গভীর চিন্তা করে গেছেন তার পরিচয় না পেলে, তাঁর প্রতিভার অলোকসামান্যতার ধারণা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, তথা মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তদৃষ্টি যেরূপ আয়ত্ত করেছিলেন সেরূপ এদেশে এযাবৎ আর কেউ পারেন নি। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মেরও অভিনিবিষ্ট ছাত্ররূপে যে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেছিলেন তার কৃতিত্বও তুলনারহিত। এই দুই জাতীয় জ্ঞান ও ধ্যানকে তিনি আপনার মধ্যে সংহত ও সমাহিত করতে পেরেছিলেন এবং তার দ্বারাই এক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর মতো উদার সার্বভৌম বিচারবুদ্ধি সে-যুগে বা এ-যুগে আর কেউ অর্জন করতে পারেন নি।

তবে সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল এমন এক গভীর দেশানুরাগ, যা স্বদেশ ও স্বজাতির সার্বিক কল্যাণ চিন্তায় সর্বদা ব্যাপৃত থাকত। অবশ্য দেশ ও জাতির সে কল্যাণকে বিশ্বমানবের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষণীতেই তিনি বিচার করতেন—খণ্ডিত স্বার্থানুবন্ধী দৃষ্টিতে নয়। দেশহিত, সমাজহিত, সর্বমানবহিত—এই ত্রিবিধ হিতচিন্তাই তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মে প্রেরণাস্বরূপ কাজ করেছে। কেবল উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও রসসৃষ্টির প্রেরণাও কম প্রধান ছিল না, যদিও মাঝে মাঝে তাঁর দেশহিত ও লোকহিতের প্রেরণা উপন্যাসের রস ও সৌন্দর্যকে গৌণ প্রতিপন্ন করত।

লেখক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ তাঁর 'বঙ্কিম-সন্ধিৎসায়' বঙ্কিম-মানস ও বঙ্কিম-প্রতিভাকে এই সার্বিক প্রেক্ষিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি বঙ্কিম-সন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেরই সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

দ্বিজেনবাবুর দ্বিতীয় বইয়ের উপজীব্য, রুশ সাহিত্য-সম্রাট টলষ্টয়। তবে টলষ্টয়ের জীবন ও সাহিত্যকর্ম অপেক্ষা তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসাকেই তিনি এগ্রন্থে মুখ্য স্থান দিয়েছেন। টলষ্টয়ের জীবন ও সাহিত্যকর্মের বিষয়ে একটি মাত্র অধ্যায় নিয়োজিত করে' পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে লেখক টলষ্টয়ের শিল্পভাবনা নিয়ে বিচার করেছেন। পঞ্চম বা শেষ অধ্যায়টিতে সমগ্রভাবে টলষ্টয়ের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে অবলোকনের প্রয়াস আছে। এছাড়া গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে লেখক টলষ্টয়ের 'On Art' নিবন্ধটির স্বকৃত অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করেছেন। বলা বাহুল্য, টলষ্টয়ের শিল্পজিজ্ঞাসার বিবর্তনে 'On Art' নিবন্ধটির ভূমিকা স্মরণ করেই লেখক এটা সংযোজিত করেছেন।

খুব সম্ভবতঃ টলষ্টয়ের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজ যে মোটের উপর ওয়াকিবহাল তা স্মরণ করেই, লেখক এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য জ্ঞান করেছেন। তিনি কেবল বড় বড় দিক্‌চিহ্নগুলির নির্দেশ করে, তাদের তাৎপর্যের কিছু কিছু ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। তাঁর আসল জিজ্ঞাসা টলষ্টয়ের শিল্পজিজ্ঞাসার স্বরূপ নিয়ে। অন্যান্য আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক ভাবনার প্রতিতুলনায় টলষ্টয়ের শিল্প-ভাবনা কতখানি আধুনিক অথবা অনাধুনিক, এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চিন্তার সঙ্গে টলষ্টয়ের শিল্পচিন্তার সাযুজ্য কিরূপ এবং কতখানি—এই সব প্রশ্ন নিয়ে লেখক অনেক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। নিঃসন্দেহে টলষ্টয়ের শিল্পতত্ত্ব নিয়ে এই ব্যাপৃতি ও সমীক্ষা বাংলা মননসাহিত্যে নূতন প্রয়াস এবং এজন্যে লেখক অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তাঁর শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনা আরেকটু সহজবোধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। টলষ্টয়ের নিজের শিল্প আলোচনা, ইংরাজী অনুবাদেও অত্যন্ত হৃদ্য ও সুখবোধ্য। বাংলায় তা নিয়ে আলোচনাও একই রূপ স্বচ্ছপ্রভ হওয়া উচিত। তা হলেই টলষ্টয়ের শিল্পচিন্তার সর্বকালীন প্রাসঙ্গিকতা লোকের কাছে স্পষ্ট হতে পারবে। দুঃখের বিষয়, আমরা বাংলা লেখকরা সহজকেও কঠিন করে ফেলি। এবং বর্তমান যুগের বাংলা গদ্য তো দুরূহতারই সাধনা বিশেষ।

অবশ্য শ্রীযুক্ত নাথের গদ্য তেমন যত্নসিদ্ধ অস্বচ্ছ নয়। তবে আরেকটু স্বচ্ছতার দিকে মনোযোগী হলে পাঠকদের কাছে এই আলোচনা আরও রোচনীয় হতো। তিনি খুব যত্নের সঙ্গে টলষ্টয়ের শিল্পভাবনার মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। উনিশশতকী ইয়োরোপের শিল্পে-সাহিত্যে কৃত্রিমতা, দুর্বোধ্যতা, যৌনরিরংসা এবং অনৈতিকতার আতিশয্য দেখে টলষ্টয় যে কিরূপ প্রতিহত হয়েছিলেন এবং এই সর্বব্যাপী রুচিবিকৃতি ও মূল্যবোধ-

বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পের স্বভাব, তার সর্বজন-হৃদয়সংবাদিতা, দেশকাল-অতিক্রমী তার সঞ্চার ও সংক্রমণ ক্ষমতা, চিরন্তন ধর্মবোধের উপরে তার প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি উপলব্ধিতে কী ভাবে উপনীত হ'ন, সে সব কথা লেখক আমাদের বলেছেন। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নন্দনতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ক্রোচের মতের সঙ্গে টলষ্টয়ের মতের কোথায় ব্যবধান ও পার্থক্য তাও লেখক তুলে ধরতে প্রয়াস করেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্প-জিজ্ঞাসার সঙ্গে টলষ্টয়ের শিল্পসাহিত্য-চিন্তা যে অনেকাংশে সমধর্মী এবং মাত্র দু-একটি বিষয়েই দূরব্যবহিত তাও শ্রীযুক্ত নাথ যথাসাধ্য পরিস্ফুট করতে পেরেছেন।

পরিশেষে, 'উপসংহারে', টলষ্টয়ের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার উপরে সাহিত্যিক অসাহিত্যিক নানা প্রতিভাবান মানুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টির আলোকরশ্মি নিক্ষেপ ক'রে টলষ্টয়-রূপ রহস্যের হৃদয়টি আলোকিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। এর মধ্যে লেনিনের মূল্যায়নও স্থান পেয়েছে।

বাংলা ভাষায় টলষ্টয় আলোচনার ক্ষেত্রে আলোচ্য বইটি অবশ্যই কিছু নূতনত্ব দাবি করতে পারে। টলষ্টয়ের শিল্পভাবনা বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী, তাঁরা বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

'বাংলা উপন্যাসের একযুগ' বইটি নামে যুগবিস্তারী হলেও আসলে কোনো বিশেষ একটি যুগকে সম্পূর্ণত দেখার ও দেখানোর প্রয়াস এখানে নেই। তবে রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী অব্যবহিত কালে যে সব প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারজনের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা এখানে আছে। সেই চারজন হলেন; তারাশঙ্কর, বনফুল, মনোজ বসু এবং জরাসন্ধ। বলা বাহুল্য, এঁরা চারজন সমমাপের ন'ন। বিশেষ ক'রে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এঁদের সঙ্গে মুখ্য স্থান না দিলে এ-যুগ (অর্থাৎ যে-যুগ লেখকের উদ্দিষ্ট) নিয়ে আলোচনা নিরর্থক হয়ে পড়ে। লেখকও সে বিষয়ে কিছুটা সচেতন: তাই বই-এর 'উপক্রমণিকা' অধ্যায়ে তিনি এ-যুগের প্রায় সমস্ত যুগন্ধর ও প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিকদের অবদান ও তাৎপর্যের উল্লেখ ক'রে যুগটি কী অর্থে বাংলা উপন্যাসের স্বর্ণ যুগ এবং এযুগের মনোধর্ম কী, তা বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন। এবং 'গ্রন্থকারের নিবেদন' নামক গ্রন্থ-ভূমিকায় তিনি কেন মাত্র এই চারজন ঔপন্যাসিককেই বিস্তৃত আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছেন তাও উল্লেখ করেছেন। বিভূতিভূষণ ও মাণিক সম্বন্ধে বহু বিশদ আলোচনা অনেকেই

করেছেন বলেই তিনি আর তাঁদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করেন নি। এই চারজন প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি বলেই তিনি এঁদেরই আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছেন।

এ-যুক্তি কতটা বিচারসহ তা বলা কঠিন। চারজনের স্থলে ছয় জনের আলোচনা হলে কেউ আপত্তি করতো না, এবং তা যুগের পরিধি ও বৈশিষ্ট্যকে আর বেশী সুব্যক্ত করতে পারতো। কিন্তু মুখ্য ছয়জন ঔপন্যাসিক-সীমিত আলোচনাকেও উপন্যাসের একযুগ বলা সঙ্গত হোত না। মাত্র ঐ চারজনকে কেন্দ্র করে আলোচনাকে যুগ আখ্যাত করা আরও অসঙ্গত হয়েছে। বরং 'একটি যুগের কয়েকটি লেখক' নাম দিলেই বেশী যুক্তিযুক্ত হোত।

তারপর তারাশঙ্কর, বনফুল আর মনোজবসুকে নিয়ে এখানে আলোচনা যদিও কিছুটা সুপ্রসর, জরাসন্ধকে নিয়ে সে তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানেও সঙ্গতি রক্ষা করা হয় নি।

সে যাই হোক, ঔপন্যাসিক চতুষ্টয়ের সৃষ্টি-বৈচিত্র এবং রস-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য লেখক স্বল্প পরিসরের মধ্যেও সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন, এটা কম-কৃতিত্বের কথা নয়। আশা করি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বইটির আদর হবে।

জড়ভরতের চিঠি

মাননীয় 'আলেখ্য' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

চিঠি লিখিবার অভ্যাস নাই, তথাপি এই চিঠিটি না লিখিলে শান্তি পাইতেছিলাম না।

আলেখ্য পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ়) প্রকাশিত "সমাজচিন্তা' শিরোনামে সংবাদ পরিবেশনায় "পূর্ব-ইউরোপে পেরেষ্ট্রয়কার জয়যাত্রা" বিষয়ক সংবাদটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সোভিয়েত রাশিয়া সহ পূর্ব-ইউরোপে যে চমকপ্রদ ঘটনাগুলি ঘটিল তাহা শুধু অভাবনীয়ই নহে, ইহা একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। মানবেতিহাসে ইহা এক যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণ।

প্রকৃতপক্ষে এইসকল দেশে যাহা ঘটিতেছে তাহা যে পেরেষ্ট্রয়কার আশ্চর্য্য ফসল তাহাতে সন্দেহ নাই—তবে সে ফসল সুস্বাদু অথবা তিক্ত তাহা সঠিক করিয়া বলিবার সময় এখনও আসে নাই। একথাও ঠিক যে একদলীয় কম্যুনিষ্ট শাসন সর্বত্র শুধু পশ্চাৎমুখী নয়, পরাজিত বলা চলে।

বিগত বছরের জুন মাস হইতে এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত সংবাদপত্রের খবরে দেখা যায় এই তরঙ্গ সারা বিশ্বেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই আন্দোলনকে অনেকে আখ্যা দিয়াছে গণতন্ত্র-পন্থী (Pro-Democracy) আন্দোলন বা সংগ্রাম। ইহাকে পুঁজিবাদী প্রতি-বিপ্লব আখ্যা দিতে অবিশ্যি অনেকের আপত্তি আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কেবলমাত্র কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র-গুলিতেই গণতন্ত্রপন্থীরা আঘাত হানিয়াছে যেহেতু তাহাদের মতে কমিনিউজম্ গণতন্ত্র-বিরোধী এবং কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গণতন্ত্রহীন।

পেরেষ্ট্রয়কার বীজ যে উর্বর ভূমিতেই বপন করা হোক না কেন আজ তাহা নিঃসন্দেহে ডালে-পাতায় সজীব হইয়া আশ্চর্য্য ফসল দিতেছে। এই আশ্চর্য্য বীজের আবিষ্কর্তা মিঃ গর্বাচেভ, যিনি কমিউনিজমের পিতৃভূমি সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টী ও রাষ্ট্রের মহান নায়ক। কেন তিনি এরূপ বীজ বপন করিলেন যাহার ফসল অপরে (অ-কম্যুনিষ্টরা) কাটিয়া লইয়া নিজের গোলা ভরিতেছে? কম্যুনিষ্টদের অস্ত্র ব্যুমেরাং হইয়া নিজের গায়েই লাগিল না তো?

দেখিতে হইবে কোন্ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে পেরেষ্ট্রোয়কার জন্ম। বর্তমান কালে সারা দুনিয়া এক গভীর সাধারণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের (general economic crisis) আবর্তে জড়াইয়া পড়িয়াছে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিও ইহার হাত হইতে মুক্তি পায় নাই, বরঞ্চ ঐদেশগুলিতে আরও তীব্রতর হইয়াছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়াছে। অপরদিকে সরকারী আমলা ও কম্যুনিষ্ট পার্টী দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। উৎকোচ গ্রহণ, অপরাধ প্রবণতা, নেশাপরায়নতা ইত্যাদি উপসর্গগুলি সমাজ দেহে পচন ধরাইয়াছে। দু বছর আগে মিঃ গর্বাচেভ পার্টী সম্মেলনে বলিলেন—দেশের সামনে আশু ও প্রধান সমস্যা হইল Corruption, drunkenness, increased crimes and shadow econmy. স্বভাবতঃই এই দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ দানা বাঁধিতে থাকে। সাম্যবাদী (কম্যুনিষ্ট) রাষ্ট্রে কেন পুঁজিবাদী সমাজের পঙ্কে সৃষ্ট এই সকল ব্যাধি দেখা দিল তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা এই চিঠির আলোচ্য বিষয় নহে। আর্থিক সঙ্কট, দুর্নীতি ও পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের হাত হইতে দেশ ও পার্টীকে রক্ষা করিতে মিঃ গর্বাচেভ দুইটি আশ্চর্য্য স্লোগান তুলিলেন—পেরেষ্ট্রোয়কা এবং গ্লাসনস্ত। পেরেষ্ট্রোয়কা—(Re-Structuring) (re-construction নয়) অর্থাৎ রাষ্ট্র কাঠামোর রূপান্তর। সাম্যবাদী কাঠামো আর নয়—চাই ইহার নবরূপায়ন। এই নবরূপায়নের হাতিয়ার 'গ্লাসনস্ত।' গ্লাসনস্ত—খোলা দরজা, খোলামন—যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। পেরেষ্ট্রোয়কা ও গ্লাসনস্ত একে অপরের পরিপূরক। গ্লাসনস্ত ছাড়া পেরেষ্ট্রোয়কা নিরর্থক। গ্লাসনস্তের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন মিঃ ক্রুশ্চেভ, ষ্ট্যালিনের কবর স্থানান্তরিত করিয়া—মিঃ ব্রেজনেভ উহাতে বারিসিঞ্চন করিয়াছেন—উহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে মিঃ গর্বাচেভের নিপুণ হস্তে। সকল দরজা খোলা—বাধা-বন্ধনহীন গণতন্ত্র। এখন শুধু পেরেষ্ট্রোয়কা—সাম্যবাদী রাষ্ট্র কাঠামো ভাঙ্গো—নবরূপে সজ্জিত কর। পেরেষ্ট্রোয়কা! হুঁকোর খোল-নলচে বদল কর। আকার (From) থাকিবে কিন্তু বিষয় বস্তু (content) থাকিবে না। সবুজ সঙ্কেত দিলেন মিঃ গর্বাচেভ।

শুরু হইল গণতন্ত্রপন্থীদের আন্দোলন। প্রথমেই আঘাত হানিল চীনে—তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে গণতন্ত্র-পন্থী ছাত্ররা দখল করিয়া বসিল স্কোয়ারটি। আওয়াজ উঠিল—গণতন্ত্র চাই! গণতন্ত্র! কিন্তু কিসের গণতন্ত্র? সাম্যবাদী রাষ্ট্রের অবসান চাই, কম্যুনিউজিমের ধ্বংস চাই, মাও-সে-তুঙের প্রতিকৃতিতে কাদা ছুড়িবার গণতন্ত্র চাই। বেরসিক চীন ইহা পছন্দ করিলনা। বলিল—

বৎসগণ ! তোমরা ভুল স্থানে আঘাত হানিয়াছ। তোমাদের গণতন্ত্র এখানে নয়—অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। চীনের এই গণতন্ত্রহীন আচরণে পৃথিবীর অনেকেই রুষ্ট হইয়াছিলেন—ছাত্রদের সহানুভূতিতে প্রচুর অশ্রুপাত করিয়াছিলেন—তথাপি গণতন্ত্র-পন্থী (Pro-Democray) ছাত্রদের তিয়েন আন্-মেন্ স্কোয়ার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। চীন বলিল—প্রতিবিপ্লব।

চীনের উপকূলে প্রতিহত হইয়া গণতন্ত্র-পন্থীরা দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাপাইয়া পড়িল পূর্ব-ইয়োরোপে। জমি সেখানে তৈরীই ছিল। গণতন্ত্র ! গণতন্ত্র ! ধ্বনিতে পূর্ব-ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশগুলি উত্তাল হইয়া উঠিল। ইউরো-কমিউনিজমের (EURO—COMMUNSIM) তত্ত্বে বলীয়ান্ ঐ দেশগুলি (রুমানিয়া ব্যতীত) গণতন্ত্রপন্থীদের মনে ব্যথা দিল না। পলায়ন কৌশল (পেরেষ্ট্রয়কার) অবলম্বন-পরায়ন ঐ দেশগুলি, কমিউনিষ্ট পার্টীর নবা-কমিউনিষ্টরা (Radicals), আওয়াজ তুলিল—Perestroika ! পেরেষ্ট্রয়কা ! পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরীয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও পূর্ব-জার্মানীর কমিউনিষ্ট পার্টীগুলি স্বেচ্ছায় কট্টরপন্থী (Hardliner) দের পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিল পলিট-ব্যুরো এবং মন্ত্রীত্ব হইতেও। অকমিউনিষ্টদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সরকারী ক্ষমতা ভাগ করিয়া লইল ; কম্যুনিষ্ট পার্টীর বিলোপ সাধন করিয়া নব-নামকরণ করিল ; বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথা গ্রহণ করিল। সংবিধান হইতে কমিউনিষ্ট পার্টীর সরকারী একচেটিয়া অধিকার বিলোপ করিল। সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মানিয়া লইল ; বহুজাতিক একচেটিয়া-পুঁজিকে স্বাগত জানাইল। Free-enterprise বা Market-Oriented economy নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত পুঁজির লগ্নী ও মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করিল। সবই হইল শান্তিপূর্ণ ভাবে।—দু দলই খুশী। গণতন্ত্র-পন্থীরা খুশী—খুশী পেরেষ্ট্রয়কা-পন্থীরাও। শুধুমাত্র কট্টরপন্থীরা (Hardliners) অপমানের বোঝা কাঁধে লইয়া পদচ্যুত হইল অথবা কারাগারের অন্তরালে স্থান পাইল। রুমানিয়ার চেসেস্কু সরকার পেরেষ্ট্রয়কার অর্থ অনুধাবন করিতে পারে নাই—স্বেচ্ছায় গদী হইতে নামিয়া আসে নাই। গণতন্ত্র সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্কন্ধে আরোহন করিয়া গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া বসিল। দুর্ভাগ্য চেসেস্কুর—সস্ত্রীক সে গুলির আঘাতে প্রাণ দিল। অকমিউনিষ্ট ইলিয়েস্কুর সরকার গঠিত হইল ; কমিউনিষ্ট পার্টী প্রকৃতপক্ষে বেআইনী হইল ; কমিউনিষ্ট একাধিপত্যের অবসানে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপিত হইল—খোলা-বাজার ও ব্যক্তিগত পুঁজির দরজা খুলিয়া গণতন্ত্রের হাওয়া বহিতে লাগিল।

প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে লেনিনের মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ইউরো-কমিউনিজিম-এর মাতৃভূমি বার্লিনের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল। গণতন্ত্রের হাওয়া চতুর্দিকে দাপাদাপি করিতে লাগিল। বহুকাল পরে এই দেশগুলি ধর্মীয় দাঙ্গা করিবার গণতন্ত্রও ফিরিয়া পাইল। যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও আজারবাইজানে ধর্মীয়-দাঙ্গার খোলা-হাওয়া (গ্রাস্নস্ত !) বহিতে লাগিল। বিচ্ছিন্নতাকামী (Pro-independence) নেতারাও পিছাইয়া নাই। লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, জর্জিয়া—সকলেই বলিয়া বসিল 'স্বাধীন রাষ্ট্র' চাই। জয় গণতন্ত্রের জয় ! জয় পেরেষ্ট্রয়কার জয় ! জয় ইউরো-কমিউ-নিজম্-এর জয় !

আশ্বিনমাসে পোল্যাণ্ড হইতে যে Perestroika-র ফসল কাটা সুরু হইয়াছিল, তাহার সমাপ্তি ঘটিল বিশ্বকমিউনিজম্-এর পীঠভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায়, ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যায়। মিঃ গর্বাচভ নবসাজে রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ও পার্টী' প্রধান হইয়া বসিলেন।

পেরেষ্ট্রয়কার অপর নাম গর্বাচভ। কিন্তু তাঁহার সহিত বিদ্রোহী-হিরো Mr. Yeltsin-এর নাম না করিলে উহা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। Mr. Yeltsin চরম পেরেষ্ট্রয়কাপন্থী। ইতিমধ্যে লণ্ডন হইতে তাহার আত্মজীবনীও প্রকাশিত হইতে সুরু করিয়াছে। তাঁর অভিযোগ—মিঃ গর্বাচভ পেরেষ্ট্রয়কার গতি শ্লথ করিয়া দিতেছেন। তাহার মতে পূর্ব-ইউরোপে যে ঘটনাগুলি এখন ঘটিল, তাহা চার বছর আগেই ঘটা উচিত ছিল। Mr. Yeltsin মনের কথা খুলিয়াই বলিলেন—Soviet needs Capitalism। সোভিয়েত রাশিয়া যেন একমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহায়েই এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইতে পারে। তাঁহার মতে, Socialism is an obsolete ninteenth century ideology—সাম্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীর এক অচল তত্ত্ব। Socialism বলিতে তিনি নিশ্চয়ই মার্ক্স্বাদ বুঝাইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে সোভিয়েতবাসীরা অচিরেই অনুধাবন করিতে পারিবেন যে পৃথিবীতে রাশিয়াই একটিমাত্র দেশ অবশিষ্ট রহিয়া গেল, যাহা উনবিংশ শতাব্দীর এক জড়াজীর্ণ অচলতত্ত্ব হাতে লইয়া একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে এবং সাম্যবাদের হাতে পরাজিত সোভিয়েত নাগরিকরা সেই হতভাগ্য দেশের শেষ নাগরিক। এ হেন মহান বিপ্লবী নেতা Mr. Yeltsin এই সেদিন পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টী'র সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কমিটির (Polit-

Bureau) সদস্য ছিলেন এবং রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্র মস্কো শহরের পার্টি-প্রধান ছিলেন। পলিটবুরো হইতে বহিস্কৃত হইবার পরই তিনি গণতন্ত্র-পন্থী জাতীয় হিরো হইয়াছেন। আশ্চর্য হইবার বিষয়, যিনি অন্তরে অন্তরে পুঁজিবাদের ভক্ত তিনি কি করিয়া এতকাল বাঘা কমিউনিষ্ট সাজিয়া পলিটব্যুরোর সভ্যপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইউরো-কমিউনিজম্ বহুপূর্বেই মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের দুইটি প্রধান স্তম্ভকে অচল (obsolete) আখ্যা দিয়াছিল—সে দুইটি হইতেছে—১। বিশ্ব-কমিউনিষ্ট সংস্থা (Comintern) এবং ২। সর্বহারার একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat)। এখন প্রাক্তন পি. বি. সদস্য Yeltsin গোটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই অচল আখ্যা দিয়া বসিলেন। সোভিয়েত রাশিয়া সহ পূর্ব-ইউরোপীয় নব্য-কম্যুনিষ্টরা মার্কস-বাদের তৃতীয় স্তম্ভটিও অচল আখ্যা দিয়া ধূলায় মিশাইয়া দিল। Communist Marifesto (P. 123, Marx's Selected works Vol. I (Moscow Publication) 1946) লেখা আছে—"In this sense, the theory of Communism may be summed up in the single sentence: Abolition of Private Property". এই দেশগুলির নবগঠিত সরকার কম্যুনিষ্টদের সম্মতি লইয়াই সংবিধান সংশোধন করিয়া "abolition of private property"-র তত্ত্বটি সমূলে উৎখাত করিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিবার অধিকার সংবিধানগত অধিকার বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

মিঃ গর্বাচেভের নেতৃত্বে পেরেষ্ট্রয়কা অনেক র‍্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কট্টরপন্থী (Hordliner) পলিটব্যুরো সভ্যদের (একমাত্র লিগাচেভ্ ব্যতীত) অপসারণ সম্পূর্ণ হইয়াছে; সরকারে কম্যুনিষ্ট পার্টির আইনগত অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে; বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এবং অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন Presidential form of Government স্বীকৃত হইয়াছে; বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রীয় পুঁজির অংশীদারীতে সম্মত হইয়াছে; Free enterprise এবং market oriented economy নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে; ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হইতে আর আইনগত বাধা থাকিবে না; কৃষক বংশপরম্পরায় ব্যক্তিগত আবাদী জমির মালিক থাকিতে পারিবে; সংবিধান হইতে কম্যুনিষ্ট পার্টির সরকারে একচ্ছত্র অধিকার বিলোপিত। এক কথায় পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে যাহা ঘটিয়াছে—এখানেও তাহাই

ঘটিল। সবই কিন্তু ঘটিল কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে অহিংস উপায়ে। রাশিয়াতে শুধুমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির নামটি বদল হয় নাই। হুঁকাটি ঠিকই আছে শুধুমাত্র খোল ও নলিচা বদল হইয়াছে।

নবলব্ধ গণতন্ত্রের হাওয়ায় পক্ষ বিস্তার করিয়া আমার কল্পনা যেন নবদৃষ্টি লাভ করিল। দেখিতে পাইলাম রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশের সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রহীনতা রূপ ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইল। বেকার জীবনযাপন করিবার অধিকার লাভ করিল। নিরক্ষর থাকিবার অধিকার ফিরিয়া পাইল। ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি পেশা হিসাবে গ্রহণ করিতে কোন বাধা আর রহিল না। আশ্রয়হীন অবস্থায় বৃক্ষতলে অনাহারে মরিবার গণতন্ত্র তাহারা অর্জন করিল। আর দেখিলাম জার্মান জাতির পুনরুত্থান! তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি যেন আমার কানে ভাসিয়া আসিল—বাতাসে যেন বারুদের গন্ধ!

আমি তো জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মাংসপিণ্ডবৎ। যাহা ঘটিল, ভাল অথবা মন্দ বা অন্য কিছু তাহা বুঝি না। যাহা ঘটিল তাহাই শুধু বলিতে চেষ্টা করিলাম।

বিংশ শতাব্দীর শেষ বসন্তে মিঃ গর্বাচেভ অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের পদটি লাভ করিলেন। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিরও প্রধান রহিলেন। এই নবরূপায়িত প্রেসিডেন্টের পদটির অভাবে রুশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা নাকি লাঘব করা যাইতেছিল না। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হইয়া, প্রথম বক্তৃতায় বলিলেন—পেরেস্ট্রোয়কার এখানেই শেষ নয়। The necessity for more radical Prestroika Policy is obvious—পেরেস্ট্রয়কার আরও প্রাগ্রসর পন্থা গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। এবং এই কাজে তিনি তাঁহার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন। পাঁচ বছর আগে তিনি যে সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল কাঁচা, পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত গণতন্ত্র নয় (young and as yet not fully developed democracy)। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কয়েক যুগ ধরিয়া সোভিয়েত যে নীতি অনুসরণ করিয়াছে তাহা তিনি করিবেন না—তিনি ডিক্টেটর হইবেন না (He would not follow decades of Soviet practice and not become a Dictator)। মিঃ গর্বাচেভ অতি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ—পূর্ব-ইউরোপে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তিনি বোঝেন না এমন নহে। ষ্ট্যালিনের ভূত কাঁধ হইতে নামিল বটে, কিন্তু জার্মানীর পুনরুত্থান? বাতাসে যে বারুদের গন্ধ! জার্মানভূমি হইতে তৃতীয়বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া ক্রমেই

দীর্ঘতর হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবে না তো? তাই মিঃ গর্বাচভের প্রথম ভাষণের অন্তিম কথাগুলি আর্তনাদের মত শুনাইল—"Everything must be done to ensure that war never again emanates from German soil." জার্মানভূমি হইতে যাহাতে আবার যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া না পড়ে তাহার জন্ত সবকিছু করিতে হইবে।

গণতন্ত্রের ধম্‌কা হাওয়া সুদূর নিকারাগুয়ার কমিউনিষ্ট সরকারের পতন ঘটাইয়াছে। কেবলমাত্র তিনটি দেশ—চীন, আলবানিয়া ও কিউবা কমিউনিজম (Hardline) আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের পরিণতি কী হইবে তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

সমগ্র ঘটনাবলী হইতে কি একথা বলা চলে—পুঁজিবাদ হইতে পুঁজিবাদে পৌছিবার জন্ত কমিনিজ্‌ম্‌ এক দীর্ঘতম রাস্তা (Communism eventually has proved to be the longest route from Capitalism to Capitalism)?

আমি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও একটি প্রশ্নের উত্তর জানিতে আমার বড় আগ্রহ হয়। প্রশ্নটি হইল—মার্কস্‌বাদ কি তত্ত্ব হিসাবে ভুল? ইহা কি অচল তত্ত্ব? কার্লমার্কসের মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে এই প্রশ্নটি আমার স্কন্ধে ভূতের মত চাপিয়া বসিয়াছে। আপনার পত্রিকা এ প্রশ্নের জবাবে কিছু আলোকপাত করিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি—

শ্রদ্ধাবনত

জড়ভরত

২২।৩।৯০

WITH COMPLIMENTS FROM :

MACKINNON MACKENZIE & CO. LTD.

BOMBAY CALCUTTA DELHI

16, STRAND ROAD,
CALCUTTA-700 001

Phone : 20-1661 (15 Lines)

Registered with the Registrar of Newspapers
Registration No. R.N. 1843/70
ALEKHYA ★ VOL XX No. 2 ★ Nov. '89—Jan. '90

CENTRAL LIBRARY
- 3 AUG 1990

"নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্ত্তমানে। একটি হইতেছে সর্ব-সাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর-একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমত নিজেকে হাতে হাতে তৈরী করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি।"

—রবীন্দ্রনাথ

আলেখ্য ২০শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা মূল্য ৬·০০ টাকা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক ৩৩-বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬ স্থিত ইম্প্রেশন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৭৫ হইতে প্রকাশিত।